www.banglastreet.online

বাংলাST. উৎসব

কলকাতা, লন্ডন এবং বাংলাদেশ
থেকে একযোগে প্রকাশিত

১৪২৯

SRAM & MRAM
GROUP

With Best Compliments From

☎ (+60) 11 3999 2628
(+60) 19 254 4099
Tel : +603 9775 0526

SRAM &MRAM RESOURCES BERHAD
LEVEL27,MENARA EXCHANGE
106 LINGKARAN TRX, TUN RAZAK EXCHANGE
55188 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
www.srammram.com

প্রকাশন সংস্থা
লুক ইস্ট মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
সম্পাদক
আশিস পণ্ডিত

প্রকাশন সংস্থা
লুক ইস্ট মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

সম্পাদক
আশিস পণ্ডিত

অনুপ্রেরণা
সাগরিকা ভট্টাচার্য
বিপ্লব ঘোষ

সহযোগী সম্পাদক
পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক
প্রণব দত্ত

ব্যবস্থাপনা
মহম্মদ শাজাহান
দীপিকা শাসমল

সিস্টেম অ্যাডমিন
অভয় দে

অলংকরণ

শুভ্রনীল, অভিষেক ভট্টাচার্য, সৃজন সরকার

বর্ণ সংস্থাপন

বাপ্পাদিত্য নায়েক

প্রচ্ছদ

পুণ্যব্রত পত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা
মহম্মদ ইরফান
২\১, ওয়ারী , ঢাকা-৫
ফোন- +৮৮০ ১৬৭৮-৭০৫০৪৩

লন্ডন প্রতিনিধি
এ কে এস মাসুদ
১১২ শেরউড গার্ডেন , লন্ডন,ই১৪৯, ডব্লিউ ডব্লিউ
ফোন ৪৪৭৭২৩৩১৭৮১৩

আশিস পণ্ডিত কর্তৃক সি ই ১৭ সল্ট লেক কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও কলকাতা গ্রাফিক প্রা লি , ৩বি মানিকতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট থেকে মুদ্রিত
RNI No. WBBEN/২০০৯/৩৫২৯৯

সম্পাদকীয় দপ্তর
সি ই ১৭, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০০৬৪
টেলিফ্যাক্স ২৩২১ ০৭৩৮

ই-মেল banglastreet@gmail.com
Banglastreet2@gmail.com
Website : www. Banglastreet.org

৫০ টাকা

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আবার এসে গেল বাঙালির উৎসবের দিন। লক্ষ ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও সারা বছর এই দিনগুলোর অপেক্ষায় দিন গুনি আমরা। বৎসরান্তে মা আসছেন ঘরে। তাঁকে আবাহন করে নেব আমরা। যত সঙ্কটই থাক না কেন, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে এই দিনগুলো এসে পড়লেই তাই আঙুলে কড় গোনা শুরু হয়ে যায় আমাদের। সব অনিশ্চয়তা মুছে, সমস্ত বেদনার ভার মুছে আজ আমাদের মনের আকাশ রাঙিয়ে তোলার মুহূর্ত। শরতের আলো আর হাসি মাখা দিনগুলির এই শুভ ক্ষণে 'বাংলা স্ট্রিট'-ও প্রত্যেক বছরের মতো সামিল হয়েছে তার পশরা নিয়ে। এই আনন্দ মুহূর্তে সবার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে আমাদেরও প্রার্থনা—কেটে যাক সমস্ত আঁধার। আলোয় আলোময় হয়ে উঠুক দিক দিগন্ত।

উৎসবের দিনগুলি সকলের ভালো কাটুক। আনন্দে ভরে উঠুক পৃথিবী। ভালো হোক সকলের।

Overseas
Consultants

Canadian
Pre- University (CPU)

- Ontario Secondary School Diploma
- Canadian Government Qualification

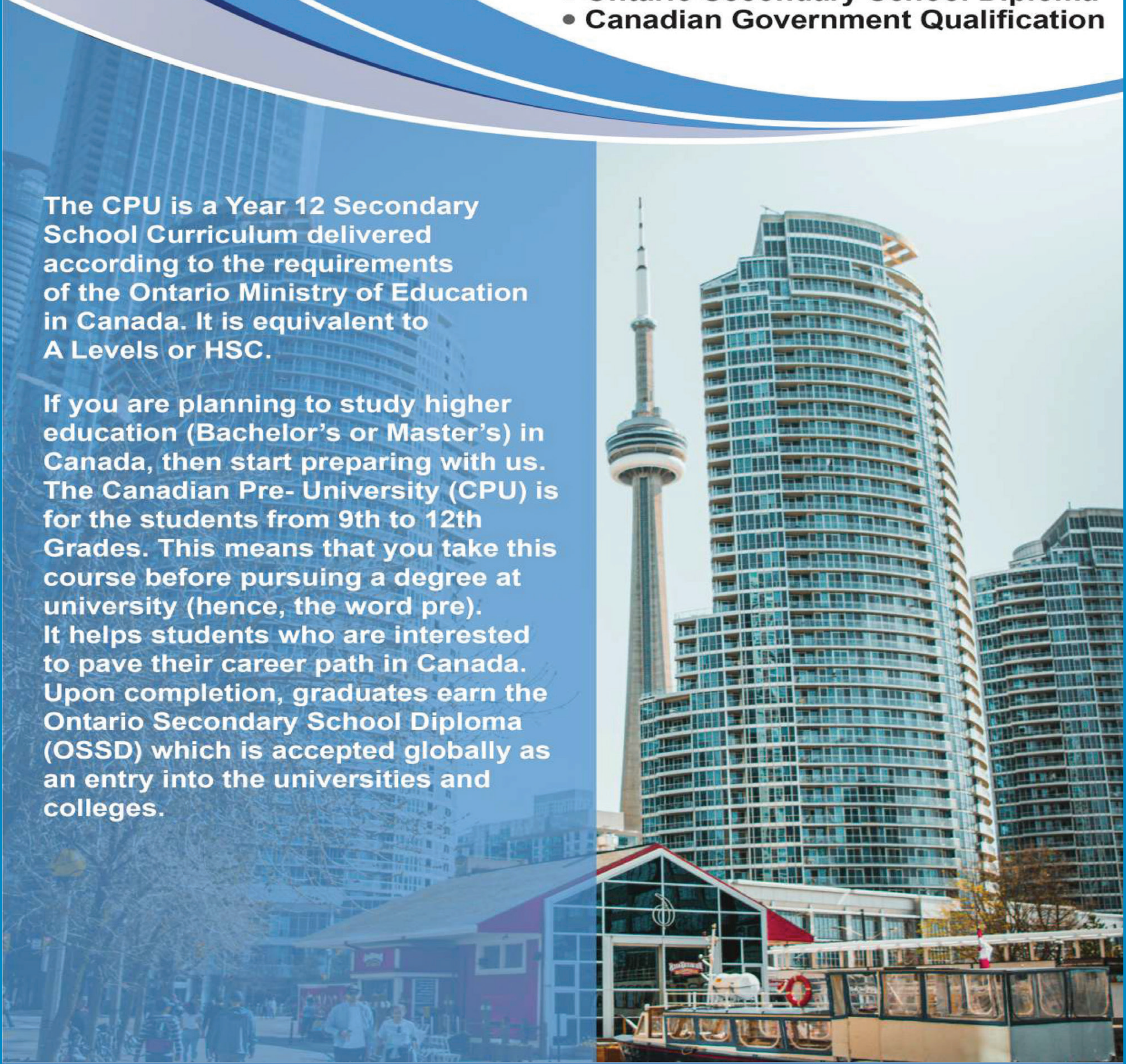

The CPU is a Year 12 Secondary School Curriculum delivered according to the requirements of the Ontario Ministry of Education in Canada. It is equivalent to A Levels or HSC.

If you are planning to study higher education (Bachelor's or Master's) in Canada, then start preparing with us. The Canadian Pre- University (CPU) is for the students from 9th to 12th Grades. This means that you take this course before pursuing a degree at university (hence, the word pre). It helps students who are interested to pave their career path in Canada. Upon completion, graduates earn the Ontario Secondary School Diploma (OSSD) which is accepted globally as an entry into the universities and colleges.

OC Consultants Pvt. Ltd.

Overseas
Consultants

CE -17, Sector 1, Saltlake,
Bidhannagar, Kolkata -700064,
India

+91 8335897194

সূচীপত্র

আলোচনা

ভারতীয় ধারণায় নারীর ক্ষমতায়ন ১১
পুরীপ্রিয়া কুণ্ডু

প্রবন্ধ

আঁধারের প্রতীকী তাৎপর্যে উজ্জ্বল এক চিত্রকর ১৭
দীপঙ্কর সেন

ফিরে দেখা

‘স্ত্রীর পত্র’-র দিনগুলি ১২৪
পুণ্যব্রত পত্রী

উপন্যাস

চক্রব্যূহ ৭৮
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

নভেলা

অসগোত্র ৫৭
অপর্ণা মুখোপাধ্যায়
অলকার ডায়েরি ১২৯
প্রণব দত্ত

বড়ো গল্প

লাল লিফলেট ২৮
অর্ণব সাহা
টেলিস্কোপ ৪৬
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

গল্প

শুধু স্মৃতিটুকু ২২
আদিত্য সেন
ভূতগলি ২৫
নিবেদিতা ঘোষরায়
ক্ষণিকের ভুল ৩৭
অর্পিতা ঘোষ পালিত
প্ল্যাটফর্ম ৪১
শৈলেন সরকার

HAPPY
DURGA PUJA

Durga Puja Greeting from

Tiger Associates

55 A , SP Mukherjee Road,
kolkata

National Institute of Innovation &
Entrepreneurship Management

Ignite Success with **NIIEM**

NATIONAL INSTITUTE OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT (NIIEM)

WHO ARE WE

Launched in 2021, National Institute of Innovation and Entrepreneurship Management (NIIEM) has been working to develop the Innovation and Entrepreneurial capabilities of students. The focus of the Institute is to make the Gen Z future-ready with skills that makes human unique – Creative, Empathetic, Critical, Persuasive.

Call now! 033 - 4062 12385

Kolkata - CE 17, Sec - 1. Saltlake, Kolkata- 700064(W.B)
Pune - New Modi Colony, Rasta Peth, Pune, Maharashtra 411011

www.niiem.com

Email id - Info@niiem.com

অন্তহীন ৭০
সর্বাণী বড়াল

হাসির গল্প

বনভ্রমণের ভ্রমকাহিনি ৩৪
পরীক্ষিৎ মান্না
একটি সাংঘাতিক ভ্রমণ কাহিনি ৭৩
কেকা বসুদেব

রম্য রচনা

বুক সাহিত্য ৫২
তরুণ চক্রবর্তী

কবিতা

ভোগ ৬৯
ধৃতিরূপা দাস

গুচ্ছ কবিতা

শুভদীপ সেনশর্মা ৭৬

অনুবাদ কবিতা

অ্যাডেওলা ইকুওমোলা ৫৫
অনুবাদ মৌমিতা পাল

বিনোদন

হৃষীকেশ মুখার্জির ছবিতে সিনেমা প্রসঙ্গ ১৪৭
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্যালারি

মানস-বিদেশরা ফুটবলের কিস্যু বোঝে না ১৪১
সুব্রত ভট্টাচার্য
ফ্যাশন ১৫১

BEST WISHES
FROM

Lokenath Stores

Tollygunge Circular
Road

ncbs

M/s. N C Banerjee & Son

Engineer & Govt. Contractor,Class A in MES

◆

Room No M/30, Mezzanine Floor, 4, Fairlie Place,
HMP House, Kolkata- 700 01, (WB) India

Call Us
033 4063 3369

Web: www.ubinfra.com

Email: banerjee65@gmail.com

diahome
DIABETES CARE COMES HOME

Are You a Diabetic ?

Now get Treatment For Your Diabetes at HOME

Download diahome app
DIABETES CARE COMES HOME

or call : +91 754 0066 440

www.diahome.com

Powered By
ARH
DR. A. RAMACHANDRAN'S
DIABETES HOSPITALS

CORPORATE OFFICE:
Diahome, 4th Floor Dr. A. Ramachandran's Diabetes Hospitals,
NO 110, Anna Salai, Guindy, Chennai – 600032
Landmark : Opposite to ITC Grand Chola

REGIONAL OFFICE:
Diahome, CE-17, Sector 1, Salt Lake,
KOLKATA -700064

Apollo Clinic
Expertise. Closer to you.

NOW IN
AGARTALA

WITH ULTRA MODERN FACILITIES

Experience doctors available from all over the India

OUR SERVICES

Consultation | Health Check | X-Ray (Digital) | Ultrasonography | Echocardiography | Dental | TMT (Cardiac Stress Test) | Pulmonary Function Test | Holter Monitoring | ECG | Pathology (Biochemistry, Haematology,Serology, Clinical Pathology, Microbiology, Biopsy, Hormones,Immunology) | Eye Clinic

# Dhaleswar Road No: 13, Near Blue Lotus Club Chowmohani,
Agartala - 799007 I Phone : 0381-232 8088/8089
E mail : agartala@theapollo.com

ভারতীয় ধারণায় নারীর ক্ষমতায়ন

পুরীপ্রিয়া কুণ্ডু

শরতের আনন্দের দিনে চারিদিক উদ্ভাসিত হয় জগজ্জননী মা দুর্গার শুভ আগমনে। তখন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয় মায়ের আগমন বার্তা আর আমরাও সেই আনন্দের অংশীদার হওয়ার জন্য সেই শুভ মুহূর্তে সকলে সমবেত হই।

দুর্গোৎসব এখন আর শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়। এই উৎসব সমস্যাসঙ্কুল বাঙালির জীবনের স্পন্দন। প্রাত্যহিক জীবনের

ব্যস্ততার মাঝে এক আলোকবর্তিকা। দুর্গাপূজা মানে বাঙালির পুনরুজ্জীবন।

দুর্গাপূজা বাঙালির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেলেও এর উৎস কিন্তু বঙ্গদেশে নয়। দুর্গার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরটি আজও রয়েছে কর্ণাটক রাজ্যের ধারওয়ার জেলার আইহোল গ্রামে। আনুমানিক ষষ্ঠ শতকে চালুক্য রাজাদের কেউ এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। পরবর্তীকালে সেন রাজাদের আমলে বিজয় সেনের নির্দেশে বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়।

পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের সূচনাই নারীর ক্ষমতায়নের অনুরণন।

এই জগজ্জননী আদ্যাশক্তির সর্বপ্রথম কাব্যিকপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি ঋগ্বৈদিক দেবীসূক্তে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্ত হল এই দেবীসূক্ত। এই সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হিসাবে আমরা এক নারীকে পাই; তিনি হলেন বাগাম্ভৃণী । ত্রিষ্টুপ ও জগতী ছন্দের সমাহারে আটটি মন্ত্রের সমন্বয়ে রচিত এই দার্শনিক সূক্তে মন্ত্রদ্রষ্টা নারীঋষির কণ্ঠে উদ্ঘোষিত হয়েছে নারীর ক্ষমতায়নের বাণী। সেখানে তিনি বলছেন ‘আমি-ই সেই নারী; যে রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণের সঙ্গে বিচরণ করে। আমি-ই মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং উভয় অশ্বিনীকে ধারণ করি। আমিই উত্তেজক সোম, ত্বষ্টা, পুষ্টিদাতা পূষা এবং ঐশ্বর্যদেবতা ভগকে ভরণ করি। আমি হবির্যুক্ত, উত্তম হবি-র প্রাপয়িতা, সোমাভিষবকারী যজমানের উদ্দেশ্যে অভীষ্টযাগফলরূপ ধন সম্পাদন করি। আমিই অধীশ্বরী, ধনের সংগ্রহিত্রী, চৈতন্যবতী ও যজ্ঞার্হগণের মধ্যে মুখ্যা। আমিই বহুভাবে বিশ্বাত্মারূপে অবস্থঞ্জ ানকারী, তাই বহুপ্রাণীর মধ্যে অনুপ্রবেশকারী আমাকে দেবগণ বহুস্থানে স্থাপন করেন। আমার দ্বারাই প্রাণীবর্গ অন্ন ভক্ষণ করে, দর্শন করে, প্রাণ ধারণ করে এবং উক্ত বিষয় শ্রবণ করে। আমার মহিমা যারা জানে না, তারা বিনষ্ট হয়। আমি দেবগণ ও মনুষ্যগণকে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান দান করি এবং আমি যাকে ভালোবাসি, তাকে অত্যধিক বলযুক্ত, যাগানুষ্ঠাতা পুরোহিত, ঋষি এবং উত্তম মেধাযুক্ত করে দিই। আমিই রুদ্রের জন্য ব্রহ্মবিদ্বেষকারী ঘাতক শত্রুকে হত্যার নিমিত্ত তার ধনু বিস্তার করি। আমিই জনগণের জন্য সংগ্রাম করি। আমিই দ্যুলোক ও ভূলোককে আবিষ্ট করি। আমিই সকল ভুবনের সৃষ্টিকর্ত্রী।’

এই দেবীসূক্তের প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যে, যার অন্যতম নিদর্শন কৃত্তিবাসী-রামায়ণ।

বঙ্গের কবি কৃত্তিবাস তাঁর নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার স্পর্শে বাল্মীকি-রামায়ণের আদিত্যহৃদয়স্তবকে রূপায়িত করেন দেবী-দুর্গার অকালবোধনে। সেখানেও মূর্ত হয়ে ওঠে নারীর ক্ষমতায়নের

ভাবনা।

দুর্গে দুর্গতিনাশিনী মা বরাভয় নিয়ে অশুভশক্তিকে বিনাশ করে শুভশক্তির জয় সূচিত করেন। মা কোথাও মাতৃরূপা, কোথাও কন্যাসমা, কোথাও ভয়ঙ্করী অসুরদলনী, কোথাও বা আবার শান্ত বরাভয়দাত্রী।

জগজ্জননী দেবীদুর্গা মহিষাসুরকে সম্বোধন করে বলেছেন—

'যদা যদা হি সাধুনাং দুঃখং ভবতি দানব।
তদা তেষাঞ্চ রক্ষার্থং দেহং সংধারয়াম্যহম্।।'

অর্থাৎ যখনই অশুভশক্তি ক্ষমতায় মত্ত হয়ে দুর্বলকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়, তখনই সাধুদের রক্ষার জন্য আমি আবির্ভূত হই। জীবের সমস্ত দুঃখ নাশ করার জন্যই দেবতারা নিজনিজ অস্ত্রের দ্বারা দেবীদুর্গাকে সম্মানিতা করেছিলেন। যমের কালদণ্ড, সূর্যের ধনুর্বাণ, প্রজাপতির অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র এবং শিবের ত্রিশূলের দ্বারা দেবী সুসজ্জিতা। জগজ্জননী মা নিজেকে দুটি অংশে বিভক্ত করেছেন। এক অংশে তিনি যোগমায়া, অন্য অংশে তিনি মহামায়া। সচ্চিদানন্দস্বরূপা যোগমায়ারূপে তিনি জড়াতীত বা মায়াতীত জগতের অসীম ক্ষমতার অধিকারিণী, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। আর মহামায়ারূপে তিনি জড় বা মায়াময় জগতের সর্বময়ী কর্ত্রী। একরূপে তিনি পরমেশ্বরের ওপর মায়াবিস্তার করে লীলারস পুষ্টিসাধনে সহায়তা করেন। তখন মা অসীম শক্তিশালিনী যোগমায়া। অপর রূপে তিনি জীবজগতের ওপর মায়াবিস্তার করেন। তখন তিনি মহামায়া। জগৎসংসার তাঁরই মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে। তাই বলা হয় 'মহামায়াপ্রভাবেন জগতস্থিতকারিণী'।

শাক্তভাবনার পাশাপাশি বৈষ্ণবদর্শনেও নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'-এ। সেখানে হ্লাদিনীশক্তি শ্রীমতী রাধিকার মানভঞ্জনের জন্য স্বয়ং রসরাজচূড়ামণি শ্রীগোবিন্দের যে ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে জয়দেবের কলমতুলিকার আঁচড়ে, তা হল 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' অর্থাৎ শ্রীমতীর চরণকমলকেই গোবিন্দ কাঙ্ক্ষা করেন। সেকারণেই বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীরা পূর্বে রাধিকাবন্দনা এবং পরে কৃষ্ণবন্দনা করে থাকেন।

শুধু তা-ই নয়, ঋগ্বেদের যুগে বিশ্ববরা, ঘোষা, অপালা, গোধা প্রমুখ বিদুষী মহিলার নাম পাওয়া যায়, যাঁরা শিক্ষার্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণে আচার্যা, উপাধ্যায়া শব্দের ব্যুৎপত্তিতে স্ত্রীজাতি অধ্যাপনা করতেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশিকায় কাশকৃৎস্না ও অপিশলার নাম পাওয়া যায় মীমাংসা ও ব্যাকরণের পণ্ডিতরূপে। এছাড়া গার্গী, মৈত্রেয়ী, শাশ্বতী প্রমুখ পারঙ্গমার নাম পাওয়া যায়। মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক যুগেও আমরা নারীর ক্ষমতায়নের একাধিক নিদর্শন লক্ষ্য করি। রামায়ণের সীতা ও মহাভারতের দ্রৌপদীকে বারংবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং ক্ষাত্রনারীর ক্ষাত্রতেজে বলীয়সী হয়ে ক্ষাত্রধর্ম রক্ষণে তৎপর হতে দেখা যায়। মহাভারতে অর্জুনের দুই পত্নী সুভদ্রা ও চিত্রাঙ্গদাকে রথচালনা, অশ্বচালনা, অসি ও ধনুর্বান-চালনার পাশাপাশি যোদ্ধ্রীরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে দেখি। মহাভারতের দ্রৌপদীর বাক্‌পটুতা ও রন্ধনকুশলতা সর্বজনবিদিত। রামায়ণের ময়দানবকন্যা, রাবণপত্নী মন্দোদরী দাবাখেলায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। মহাভারতের বিরাটকন্যা উত্তরাকে বৃহন্নলার নিকট ললিতকলাবিদ্যা শিক্ষা করতে দেখা যায়।

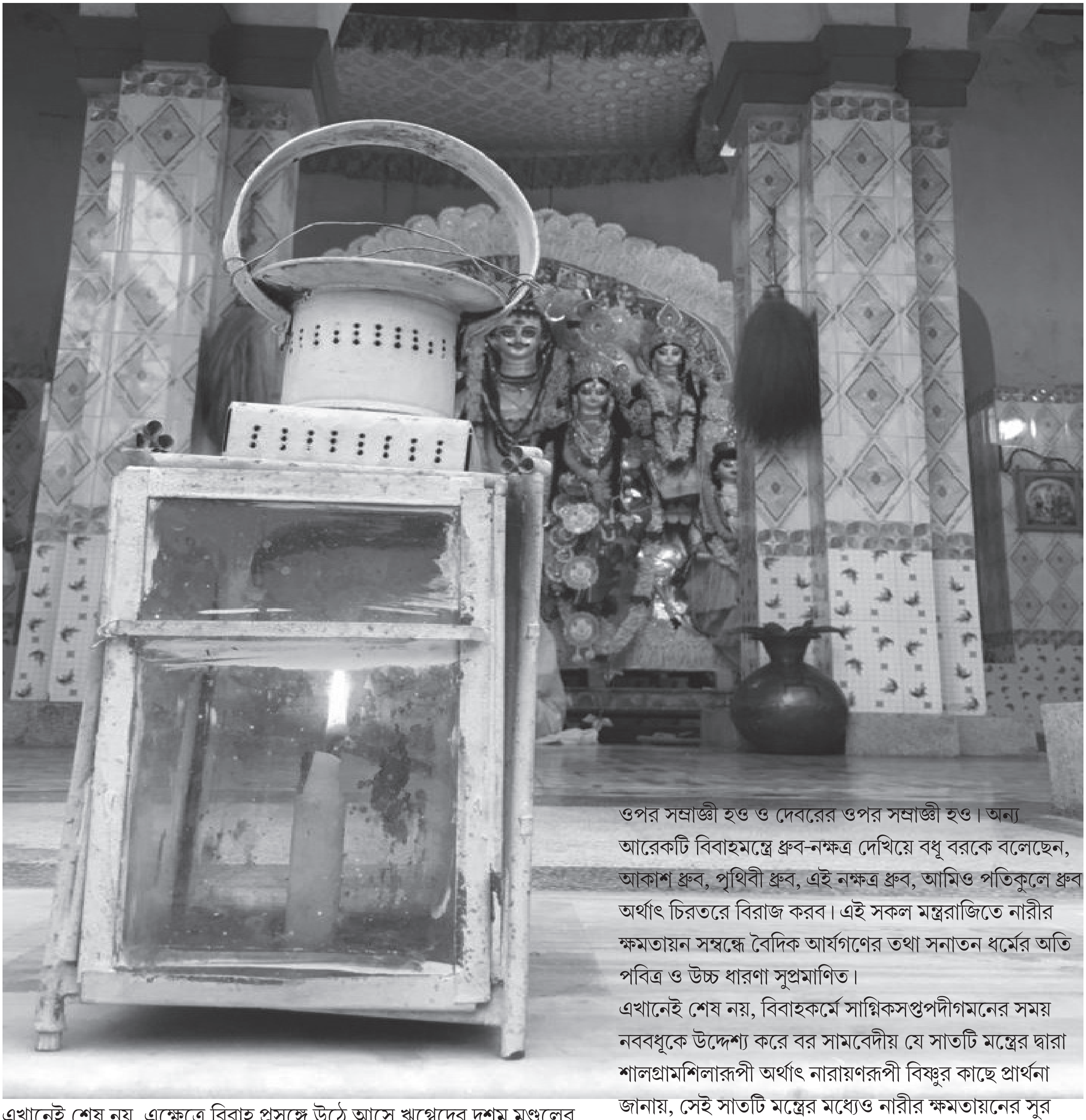

এখানেই শেষ নয়, এক্ষেত্রে বিবাহ প্রসঙ্গে উঠে আসে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সংখ্যক সূক্ত। সাতচল্লিশটি মন্ত্রসমন্বিত এই বিবাহসংক্রান্ত সূক্তটির প্রতিপাদ্য বিষয় সূর্যের কন্যা সূর্যার সঙ্গে সোমের বিবাহ। এক হৃদয়ের সঙ্গে অপর হৃদয়ের শ্রুতিসম্মত অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্পাদিত পবিত্র বন্ধন হল এই বিবাহকর্ম। ঋক্-সংহিতায় বিবাহমন্ত্রগুলি পাঠ ও অনুধাবন করলে বিবাহবন্ধনের গভীরতা ও পবিত্রতা এবং গৃহে ও সমাজে নারীর সম্মানিত উন্নতস্থান অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। নববধূকে লক্ষ্য করে উক্ত সূক্তে বলা হয়েছে, 'সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বস্রাং ভব। / ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।।'

অর্থাৎ, তুমি শ্বশুরের ওপর সম্রাজ্ঞী হও, শাশুড়ীর ওপর সম্রাজ্ঞী হও, ননদের ওপর সম্রাজ্ঞী হও ও দেবরের ওপর সম্রাজ্ঞী হও। অন্য আরেকটি বিবাহমন্ত্রে ধ্রুব-নক্ষত্র দেখিয়ে বধূ বরকে বলেছেন, আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই নক্ষত্র ধ্রুব, আমিও পতিকুলে ধ্রুব অর্থাৎ চিরতরে বিরাজ করব। এই সকল মন্ত্ররাজিতে নারীর ক্ষমতায়ন সম্বন্ধে বৈদিক আর্যগণের তথা সনাতন ধর্মের অতি পবিত্র ও উচ্চ ধারণা সুপ্রমাণিত।

এখানেই শেষ নয়, বিবাহকর্মে সাগ্নিকসপ্তপদীগমনের সময় নববধূকে উদ্দেশ্য করে বর সামবেদীয় যে সাতটি মন্ত্রের দ্বারা শালগ্রামশিলারূপী অর্থাৎ নারায়ণরূপী বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানায়, সেই সাতটি মন্ত্রের মধ্যেও নারীর ক্ষমতায়নের সুর ধ্বনিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে অন্নবৃদ্ধির জন্য, বললাভের জন্য, গৃহস্থের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য, সুখলাভের জন্য, পশুসমৃদ্ধির জন্য, ধনলাভের জন্য এবং যজ্ঞকর্মের জন্য বধূকে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু পতিগৃহে নিয়ে আসুন এবং বিষ্ণুর প্রতি এই সাতটি প্রার্থনাবাণী নববধূর জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ বর্ষিত হোক্ আর সেইসঙ্গেই নববধূর দ্বারা পতিকুলের তথা সমাজের অভ্যুন্নতি যেন সাধিত হয়। এই সাতটি মন্ত্রের প্রত্যেকটির দেবতা বিষ্ণু, ঋষি প্রজাপতি এবং ছন্দঃ বিরাট্।

শুধুই বৈদিক বা মহাকাব্যিক বা পৌরাণিক যুগে নয়, পরাধীন ভারতীয়-উপমহাদেশের ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা ঘাঁটলেও নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র আমরা দেখতে পাই। পরাধীন ও স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের এরকমই কয়েকজন পারঙ্গমা হলেন ঝাঁসীর রানি লক্ষীবাঈ, সরোজিনী নাইডু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, অবলা বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, সরলা দেবী চৌধুরাণি, স্বর্ণকুমারী দেবী, বাসন্তী দেবী, যোগমায়া দেবী, মাতঙ্গিনী হাজরা, ভগবতী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, রোকেয়া বেগম, কল্পনা চাওলা প্রমুখ। এভাবেই নারী যুগযুগান্তর ধরে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, ললিতকলা, বিজ্ঞানপ্রযুক্তি, চিকিৎসাবিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা, আইন, গবেষণা এবং বিবিধ পেশায় প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখাচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘কালান্তর’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘নারী’ নামক প্রবন্ধ, যেটি নিখিলবঙ্গ মহিলা কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে রচিত, সেই প্রবন্ধে বলেছেন ‘নরসমাজে নারী শক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।’ ভারতীয় ধর্মে অর্ধনারীশ্বর কল্পনাটি তাৎপর্যমণ্ডিত, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব এবং তা প্রধানত নারী ও পুরুষ দুইরূপে; অতএব মানব সমাজের অর্ধাঙ্গ নারী। তাই বিদ্রোহীকবি নজরুল বলেছেন, ‘কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী/পুরুষের তরবারি,/প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে/বিজয়লদী নারী।’

ভারতবর্ষ যেহেতু একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সেজন্য এই দেশে নারীরও পুরুষের ন্যায় শিক্ষার্জনের অধিকার, সুস্বাস্থ্য লাভের অধিকার, আইনী সহযোগিতা অর্জনের অধিকার, ভোটাধিকার, বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার, আত্মমর্যাদা-রক্ষণের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, প্রতিবাদ জানানোর অধিকার, আত্মরক্ষার অধিকার, বাঁচার অধিকার ইত্যাদি সকল প্রকার অধিকার অর্জনে

সমানাধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের নিয়ম মেনে নারীর অধিকার বা ক্ষমতায়ন সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মেয়েদের শিক্ষার বিস্তার। মেয়েরা যতদিন শিক্ষার আলোকে নিষ্ণাত না হবেন, ততদিন পর্যন্ত নারীর ক্ষমতায়ন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হবে না। যেদিন স্ত্রীজাতি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন, সেদিন তাঁদের আমিত্বসত্তা অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটবে এবং তাঁরা সমাজে নিজেদের মেরুদণ্ডের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবেন। সেজন্যই স্মার্তপ্রবর মনু বলেছেন ‘কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষাণীয়াতি যত্নতঃ’ অর্থাৎ কন্যাসন্তানকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পালন ও শিক্ষাদান কর্তব্য। অন্যদিকে নজরুল বলেছেন, জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে, নারী হলেন সমাজের চালিকাশক্তি। তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষ বারংবার বৈদেশিক শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় নারীহরণ, নারীধর্ষণ ও বর্ণসংকরের ভয়ে নারীকে সমাজ গৃহের চার দেওয়ালের চৌহদ্দিতে বন্দী করা হয়েছে। ফলে নারী হয়ে উঠেছেন অন্তঃপুরচারিণী, অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং অসূর্যম্পশ্যা। সমাজে যখন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিনিয়ত তার দাম দিতে হয়েছে নারীকে। সাম্প্রতিককালেও নারীর স্তুতি বা জয়গান যতই হোক্ না কেন, গ্রামীণ বাংলা তথা ভারতের প্রেক্ষিতে অতি সাধারণ আর্থসামাজিক অবস্থানে অশিক্ষিত কিংবা স্বল্পশিক্ষিত নারীরা অনেক সময়েই অপমানিতা ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। তার প্রধান কারণ হল প্রথমত, নারীদের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষার অভাব এবং দ্বিতীয়ত, অর্থোপার্জনের দ্বারা নিজেকে স্বয়ম্ভর করে গড়ে তুলতে না পারা। এই সমস্যার কথা প্রাচীনকালে মনু তাহর সংহিতায় বলেছিলেন—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।

অর্থাৎ যে নারীকে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে সেই নারীর স্বাতন্ত্র্য সমাজ স্বীকার করে না। সুতরাং এই কন্টকাকীর্ণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মুখাপেক্ষী নারীর জীবনকে কুসুমাস্তীর্ণ করে তুলতে হলে নারীকে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অর্থোপার্জনের উপযোগী হতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, নারীমুক্তির নামে আমরা পাশ্চাত্যের মতো উগ্র আধুনিকা চাই না—চাই না উচ্ছৃঙ্খল নারীসমাজ। ভারতীয় দৃষ্টিতে নারী মূলত কল্যাণী, তারাই প্রকৃত সৌন্দর্যের উপাসিকা। তাই রুদ্রাণী নয়; আমরা চাই স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময়ী জায়া, সেবাময়ী কন্যা, এবং জয়টিকা ললাটে এঁকে দেবার ভগিনী। এভাবেই আমাদের নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠুক ভারতীয় আদর্শে এবং স্বয়ম্ভরা নারীদের সম্মিলিত প্রয়াসেই গড়ে উঠুক স্বনির্ভর নারীগোষ্ঠী আর সেই সঙ্গে তাদের ক্ষমতায়ন সাধিত হোক্। ক্ষমতায়ন কথাটির অর্থ হল জ্ঞান ও কর্মে অগ্রগতি। যে সমাজ নারী জাতিকে জ্ঞান ও কর্মের আলোক হতে দূরে সরিয়ে পঙ্গু, অক্ষম করে রাখে সেই সমাজে কোনো উন্নতি নেই, কেবল বিকৃতিই আছে এবং সেই সমাজের কখনোই অগ্রগতি সম্ভব নয়।

সমাজগঠনের কাজে পুরুষের সঙ্গে নারীর ভূমিকাকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর কথায়, ‘স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে জগতের কল্যাণের কোনো সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।’ নারীর ক্ষমতায়নের প্রকৃত অর্থ হল নারীর মধ্যে আত্মশক্তির জাগরণ, আত্মচেতনার উদ্বোধন। সেজন্য নারীকে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, যাতে সে তার নিজের অধিকার অর্জনে সমর্থ হয় এবং আপন ভাগ্য জয় করে নিতে পারে। যেদিন নারী নিজের অধিকারের ওপর ভর করে নিজেই নিজের সৌভাগ্য রচনা করবে, সেদিন পুরুষ কর্তৃক নারীনিগ্রহ তথা একচেটিয়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবসান ঘটবে এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুখ, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন নারীর মাধুর্যে ও কল্যাণস্পর্শে ঘরে ঘরে গড়ে উঠবে স্বর্গের নন্দনকানন এবং সার্থক হয়ে উঠবে মহর্ষি মনুর বচন ‘যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা’ অর্থাৎ যেখানে নারী পূজিত হন সেখানেই দেবতার অধিষ্ঠান সম্ভব। তাই কবিগুরুর গানেও আমরা ঋগ্বৈদিক দেবীসূক্তের ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাই এবং আমাদের হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হয় সমাজের চালিকাশক্তি নারীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যের সুর সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।

তথ্যসূত্র

মাতৃত্ব ডঃ পুরীপ্রিয়া কুণ্ডু (সম্পা.), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০১৬ (প্রথম সংস্করণ), ISBN - ৯৭৮-৯৩-৮৩৩৬৮-২৯-৭.

বৈদিক পাঠসংকলন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে) অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, সদেশ, কলকাতা, ১৪১৪ (দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত প্রকাশ), ISBN - ৮১-৮২৮২-০৬৪-২.

‘শয়নরহস্যম্’ একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা ডঃ পুরীপ্রিয়া কুণ্ডু, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০১৪ (প্রথম সংস্করণ), ISBN - ৯৭৮-৯৩-৮৩৩৬৮-৯৩-৮.

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (বৈদিক, লৌকিক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান সহ) ডঃ দেবকুমার দাস, সদেশ, কলকাতা, ১৪১২ (পঞ্চম পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)।

আঁধারের প্রতীকী তাৎপর্যে উজ্জ্বল এক চিত্রকর

দীপঙ্কর সেন

১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে লেখা গণেশ পাইনের একটি চিঠি। তিনি লিখেছেন তাঁর এক প্রিয় বন্ধু সৌরেন মিত্রকে ‘লেখার বিষয় কিছু নেই। এটা বিশ্বসৃষ্টির অহেতুক সমারোহের মতো significant meaningless হলেও কথা ছিলো। আসলে জানানোর অনেক কিছু থাকলেও জানবার দরকার আছে কিনা, ঝরিয়ায় কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো আদিখ্যেতা কতটা ন্যায্য এসব বিবেচনার বিষয়। চিঠি লিখতে লিখতে লেখার সূচনার কথা বলেছিলে। ওরকমটা হলে ভালোই হতো। ....কাজে অকাজে আমার সাবধানী ভাবটা আমার নিজেরই বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে। ভেবেচিন্তে মনে হয়েছে প্রথম বয়সের সেই গুহাবাস, নিজের মনগড়া জগতে অনবরত পদচারণা আমাকে অধিকার করে রাখতে চেয়েছে বরাবর। নির্জন করে রেখেছে আমায়। আজ এখন জনারণ্যে লোপাট হয়ে যেতে যেতে বুঝতে পারছি, নির্জনতা এক নীলবর্ণ পতঙ্গ। সোনালী পাখনা তার। সে সুনয়ন কিন্তু দৃষ্টিহীন। চিৎকারের আগুনে তার পাখা পোড়ে। যত পোড়ে ততই সে দেখতে পায়, চক্ষুষ্মান হয় আর নিরীক্ষণের যন্ত্রণা ভোগ করে আমৃত্যু.... ।’(১)

মধ্য কলকাতায় ‘কবিরাজ রো’ একটি অতি সাধারণ রাস্তা কলুটোলা অঞ্চলে। গণেশ পাইনের পিতামহ এক প্রাচীন বাড়ি কিনলেন এই রাস্তায়।

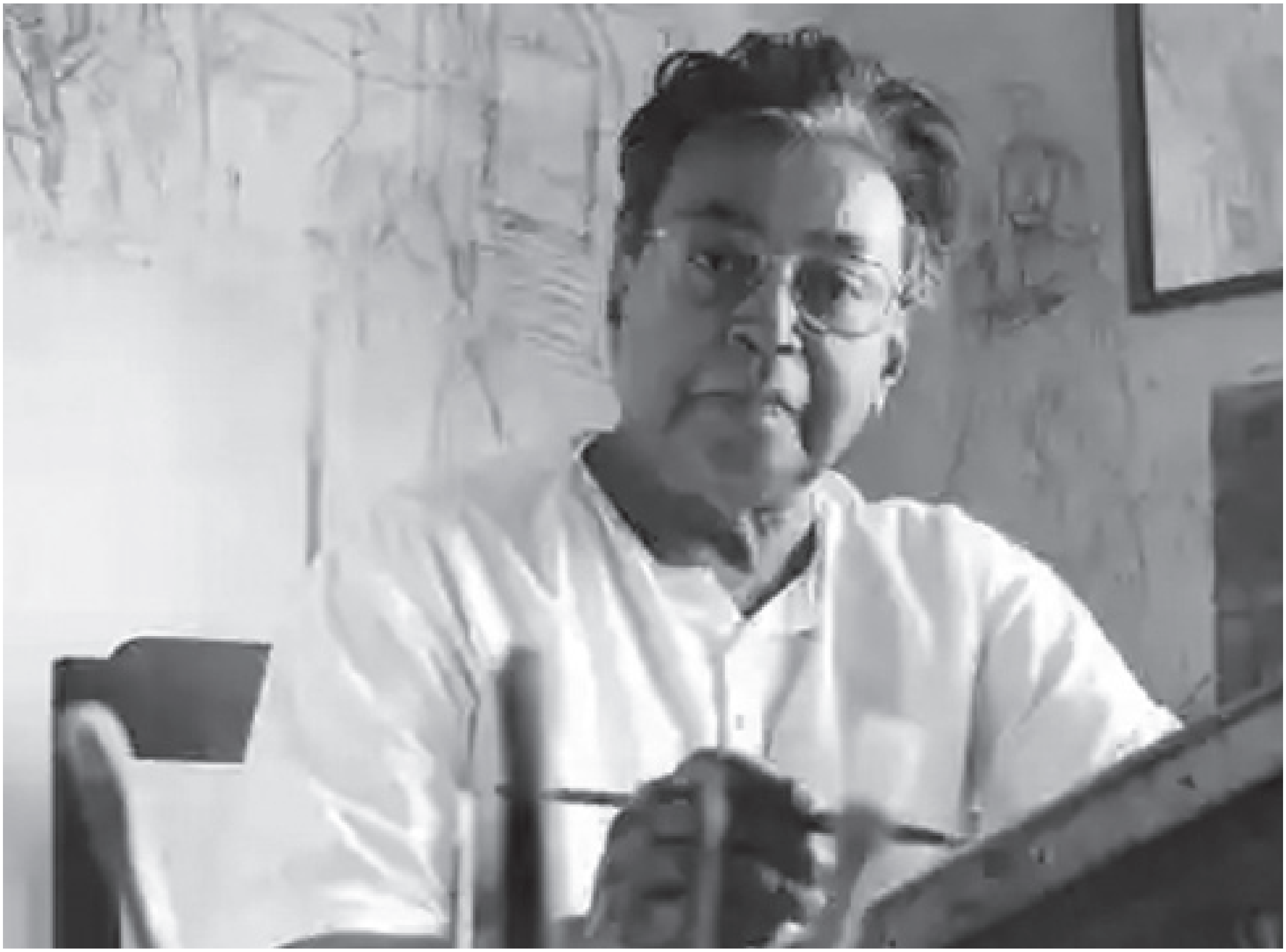

এই পরিবারের পূর্বনিবাস ছিল আদিসপ্তগ্রাম, কিন্তু আদিনিবাসের কোনো তথ্য বা নথি কিছুই পাওয়া যায়নি। যদিও কিছু রীতি-নিয়ম এবং পারিবারিক প্রথানুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিহিত সাজ-পোশাকের ছবি দেখে হয়তো অনুমান করা যায় অবাঙালি উত্তর ভারতীয় কোনো ঐতিহ্যের কথা। গণেশ পাইনের জন্ম ১৯৩৭ সালে এবং শৈশব ও কৈশোর জীবন অতিবাহিত হয় একান্নবর্তী যৌথ পরিবারে, গতানুগতিক সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে। পারিবারিক এই যূথবদ্ধতার মধ্যে থেকেই এক নিঃসঙ্গ কল্পনার জগৎ তিনি বানিয়ে নিয়েছিলেন। ‘গণেশ পাইন তাঁর শৈশবের গল্প বলতে গিয়ে বলেছিলেন, ছেলেবেলায় কাগজের নৌকা বানিয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার খেলা। অনেক শিশুই হয়তো এই খেলা খেলেছে তাদের ছোটবেলায় কিন্তু তাঁর খেলাটা ছিলো একটু অন্যরকম। জলের ঢেউয়ে যখন নৌকাগুলো ভেসে চলতো তখন তাতে জ্বালিয়ে দিতেন আগুন। ভাসমান সেই নৌকা আগুনের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, জলের গভীরে পড়তো সেই ছায়া। নিশ্চুপ বসে মুগ্ধ চোখে মায়াবী আলোয় জলের গভীর অন্ধকারের দীপ্তি দেখাই ছিলো তাঁর অন্যতম প্রিয় খেলা।’(২) পরবর্তী কালে তাঁর ছবিতে এই শৈশব স্মৃতি এক মরমী তাৎপর্য পেয়ে যায় যেন। অন্ধকারের এই প্রতীকী তাৎপর্য তাঁর ছবির এক অভিপ্রেত অনুষঙ্গ হিসাবে উদ্ভাসিত হয় বারবার।

সৌরীন মিত্র লিখছেন, ‘তাঁর শিল্পে কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকাশ সরাসরি ছিলো না। থাকার কথাও নয়। বিশেষ করে গণেশ পাইনের মতো জাতশিল্পীদের ক্ষেত্রে। কোনো একটা বিষয়কে সামনের আলোকস্তম্ভ করে ও এগিয়ে যেতো। কোনো ‘মিথ’ যেন সেই আলোকস্তম্ভের কাজ করতো। সব মিথেরই তো কেন্দ্রবিন্দু থাকে। তার মাধ্যমে কোনো জীবনসত্যের কাছে পৌঁছে যাওয়া।’(৩) এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে গণেশ পাইনের এক সাক্ষাৎকারের কথা, ‘আমিও চেষ্টা করেছি রিয়ালিটি ধরে কাজ করতে কিন্তু পারিনি। এক মুচিকে একবার আঁকলাম, মুচি আর মুচি রইলো না, হয়ে গেলো দার্শনিক। আরো দু-একখানা ছবি এঁকেছিলাম কিন্তু রিয়ালিটি প্রকাশ করতে পারিনি। ও পথ আমার নয়। দেখুন, বাস্তবকে সহ্য করতে পারি না, মাঝে-মাঝে এমন বাস্তবের রূপ দেখেছি, না পালিয়ে উপায় থাকেনি।’(৪) পাশাপাশি আর এক প্রখ্যাত চিত্রসমালোচক মৃণাল ঘোষ লিখছেন, ‘গণেশ পাইনের ছবিতে বাস্তবতা নেই, এরকম একটা ধারণা অনেকের মধ্যেই আছে। তাঁর নিজের উক্তিও অনেক সময় হয়তো প্রশ্রয় দিয়েছে এই ধারণার ভ্রান্তিকে।’(৫) মৃণাল ঘোষ তাঁর যুক্তির

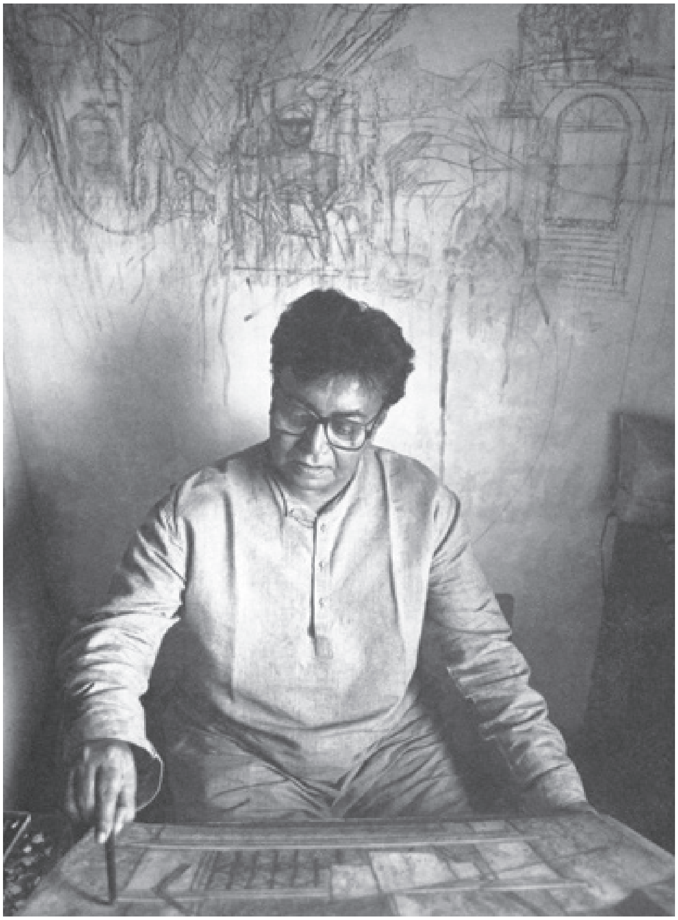

স্বপক্ষে উল্লেখ করেছেন একটি সাক্ষাৎকারের, যেখানে গণেশ পাইনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি সমকাল নিয়ে ছবি আঁকেন না কেন? সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘আঁকি না বিরক্তির জন্য, ক্রোধের জন্য।...ঠিক আছে আমি অলীক মিথ্যা নিয়েই থাকি। কিন্তু ব্যাপারটা সর্বৈব সত্যি নয়। মনের ভিতরে একটা ক্রিস্টালের মতো কিছুতে বাইরের জগতের সব ছাপ তো পড়ছে। তার পরে প্রসারিত হচ্ছে। হয়ে একটা কেন্দ্রগত বোধের মধ্যে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সেইখান থেকেই আমার ইমেজারিগুলো উঠে আসে। তার মধ্যে শুধু কল্পলোকের ব্যবহার আছে, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ভুল দেখেন, তাঁদের সঙ্গে আমার কোনো তর্ক নেই।’(৬) অর্থাৎ, সেই জারণ প্রক্রিয়ার কথাই তিনি বলতে চাইলেন। যা যে-কোনো শিল্প বা শিল্পীর ক্ষেত্রে এক একান্তই গভীর সত্যের কথা।

বাস্তবতার যে চলা-চলতি রূপ আমরা দেখতে অভ্যস্ত, শিল্পের বাস্তবতা কিন্তু তার থেকে আলাদা মাত্রার। হয়তো, সমকালের ঘটনাপ্রবাহের সেই অর্থে প্রত্যক্ষ প্রতিফলন গণেশ পাইনের ছবিতে অনুপস্থিত; কিন্তু ছবিতে তো জারিত রয়েছেই এক অন্য মাত্রার বাস্তবতা। মাইকেল এঞ্জেলোর ‘ডেভিড’ এক সময়ের সৃষ্টি, অবনীন্দ্রনাথের ‘ভারতমাতা’—সেও এক বিশেষ সময়ের প্রতিফলিত সৃষ্টি। কিন্তু মনে রাখতে হবে সত্তর দশকের তীব্র দোলাচলতার মধ্যে থেকেও গণেশ পাইন সেই সময়কে ধরেননি, বলা ভালো ধরতে চাননি। সেই ‘সময়’কে তিনি সচেতন ভাবে অস্বীকার করেছেন। কারণ, তাঁর কাছে মহৎ মানুষের জন্মও নেই যেমন, মৃত্যুও নেই। ‘This is a tale of two parallel paths, running neck to neck. The first involves the Crystallisation of Ganesh Pyne’s artistic vision through a period of loneliness and steadily eroding self-esteem. The second is a story that searches over two decades, covering the 60’s and the 70’s – a period as scarred by Political intrigues, shattered dreams and images of starvation as it was pervaded by the stench of gunpowder, death & nausea. Yet these two paths are interconnected, the way of a needle is to thread.’(৭) উল্লিখিত প্রথম পথটিই ছিল গণেশ পাইনের কাঙ্ক্ষিত পথ, মুক্তির পথ, শিল্পদিশারী পথ।

‘The visual language he adopted in the 60’s would reveal the influence of three distinct trends : Surrealism, Expressionism and Cubism. He sought to weave them together with Abanindranath’s mystic lyricism. Impressionism held no appeal for him; instead of projecting nature in its completeness, Pyne was more inclined towards projecting images of alienation and its repercussions on life. From the very outset, his eye for detail and his flair for creations atmosphere would be in evidence.’(৮)

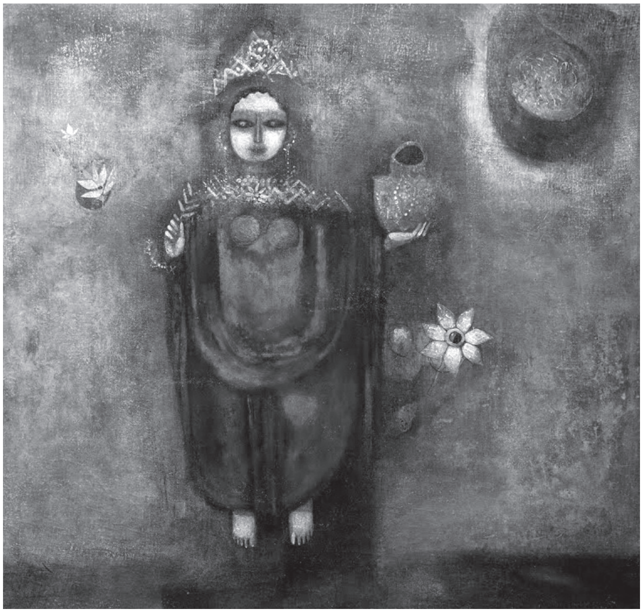

তাঁর চৈতন্যবোধে অধিকাংশ সময় এক আত্মসৃষ্ট নির্জনতার বোধই সংলগ্ন থাকে—একথা সর্বজনগ্রাহ্য হবে নিশ্চয়ই। তাঁর ছবির মূল গ্রথিত রয়েছে বাংলার জলবায়ুতে, তাঁর মৌল সাধনায় আমরা পেয়ে যাই শ্রীচৈতন্যদেবের গভীর প্রভাব। এই প্রভাবের বিস্তার আমরা লক্ষ্য করি গণেশ পাইনের আঁকা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ছবির মধ্যে। বাংলার তথা বাঙালির এই চিরন্তন ঐতিহ্য—এই জীবনদর্শন তাঁর অতি প্রিয় বিষয় ছিল। প্রাচ্য ঐতিহ্যকে তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিমায়। বাস্তবায়িত হয়েছে এক কল্পনার জগৎ। এই কল্পনার জগতের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে তাঁর পুরাণকালের আদি উৎস। সেইজন্যেই হয়তো আশৈশব নগরকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে থেকেও তাঁর ছবিতে নাগরিক চেতনার পরিবর্তে স্থান নিয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্য, গ্রামীণ সংস্কৃতি। বাস্তববোধ সম্পর্কে গণেশ পাইন তাঁর ধারণা আমাদের জানিয়েছিলেন, ‘ছবির স্বধর্মই বাস্তবকে রূপান্তরিত করা, মণ্ডিত করা। প্রাকৃতিক এবং সাদৃশ্য বোধক লক্ষণগুলি তাদের স্থানিক তাৎপর্য নিয়ে মানসিক স্তরে ক্রিয়া করে। স্মৃতি, ইচ্ছা, কল্পনার জট চেতনে অবচেতনে সঞ্চারিত থাকে। রূপকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে একটি অনির্বচনীয় বোধ জন্মায়। সম্ভবত সেই কারণেই চেনা কিছুকে অচেনা ঠেকে। এই পরিচয়ের অনুভূতি আধিবিদ্যক অনুভূতি ধারণার অন্তর্গত কি না জানি না। বাস্তব এবং বাস্তবোত্তর জ্ঞানের সম্পর্ক নির্ধারণের এই বিষয়টি দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত। নান্দনিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দর্শকের ব্যক্তিগত মানসিক গঠন এবং শিল্পীর অভিপ্রায়ের সঠিক সম্পর্কের ওপর তা নির্ভর করে। ধারণায় উপনীত হওয়াটাই লক্ষ্য, কাজে লাগানোর ব্যাপার নয় সেটা।’(৯)

একটি সাক্ষাৎকারে ব্যক্তি গণেশ পাইন বলেছিলেন, ‘আমার জীবন, আমার চিন্তাভাবনা নিয়ে ছবির জগতে বেঁচে আছি।’(১০) মানবজীবনে মৃত্যু এক চিরসত্য—এটা তিনি মেনে নিয়েছিলেন অন্তর থেকে খুব গভীর ভাবেই। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মৃত্যুকে তিনি বহুবার খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁর বিষণ্ণতা, তাঁর ছবির বিষণ্ণতা যেন এক মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল নিরবধি।

আত্মীয়জনদের বিয়োগব্যথা তাঁকে কাতর করেছে, সেই বিষাদই হয়তো জন্ম দিয়েছিল এক চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিক অবসাদের। তাঁর ছবিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে প্রায়শই। বাস্তবতা এবং কল্পকাহিনির মধ্যবর্তী এক জগৎ গড়ে তুলতেন তিনি, এক পরাবাস্তব জগৎ। সত্তরের দশক তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কলকাতায় নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আঙ্খ বর্তিত হয় এক রাজনৈতিক ডামাডোলের সময়, চারদিকে কেবলই মৃত্যুর মিছিল আর আর্ত হাহাকার। সেই রক্তাক্ত সময়ের আলেখ্যকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন তাঁর রঙ-তুলির আঁচড়ে। ১৯৭২ সালে আঁকা 'দ্য বার্ড' ছবিতে যে বিধ্বস্ত পাখিটিকে আমরা লক্ষ্য করি তা আসলে ভগ্নপ্রায় সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। ১৯৭৬ সালে তাঁর আরেক অনন্য সৃষ্টি 'দ্য উন্ডেড বিস্ট' ছবিটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের একের পর এক ছবিতে তিরবিদ্ধ মাথার খুলি, কঙ্কাল ইত্যাদি বীভৎসতা সেই 'মৃত্যুমিছিল'-এর কথাই আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়।

এক বিচিত্র কাব্যময় পরাবাস্তবতার ছবি পরিলক্ষিত হয় তাঁর বেশ কিছু কাজের মধ্যে। ইতিহাস, ঐতিহাসিক উপাদান, চরিত্র সবই যেন মিথে (myth) পরিণত হয়। গণেশ পাইনের ছবির ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেব এক ঐতিহাসিক চরিত্র, যার মিথীকরণ (mithicyzation) বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। এই সূত্র স্বয়ং তিনি নিজেই আমাদের দিয়েছেন—'সাহিত্য থেকে মিথ কিংবা মিথের অংশবিশেষ নিয়ে গড়ে উঠেছে আমার তৃতীয় স্তরের ছবিগুলি। এই স্তরে আমি ব্যক্তিগত মন্তব্য আরোপের চেষ্টা করেছি প্রধানত চৈতন্যদেবের জীবন ও সাধনাসম্পর্কিত ঘটনাবলীর উপর।'(১১) তাঁর কোনো ছবিতেই মিথ প্রকৃত অর্থে ঠিক মিথের চিত্ররূপ হিসাবে কিন্তু আসেনি। মিথিক চিত্রকলার প্রচলিত যে ধরনের ছবি আমরা দেখি, গণেশ পাইনের ছবি সে ধরনের নয়। তাঁর চিত্রকলায় তিনি আরেকটি মাত্রা জুড়ে দেন, যাকে বলা যায় মিথ সঞ্জনন (generation), যার অবাধ যাতায়াত মূর্ত থেকে বিমূর্তে। ঠিক বাস্তব রূপ নয়, বাস্তব-অধিবাস্তবে যাতায়াত। তাঁর এই মিথিক পরিমণ্ডল থেকে একটি নতুন মাত্রা পাওয়া যায়, পাওয়া যায় কথোপকথন বা ডায়লগ। এই আখ্যান সংবর্তিত হয়ে আরেকটি আখ্যানের জন্ম দেয়। নীরবতার আড়ালে সেই আখ্যান বা মৌখিক ভাষা মূর্ত হয়ে ওঠে। গণেশ পাইনের প্রায় প্রতিটি ছবিতেই থাকে এক চিত্রময় চিহ্ন যাকে মূর্তিচিহ্ন বলা হয়। এই মূর্তিচিহ্ন অনেক ক্ষেত্রেই মিথিক-লোককথা সূত্রের বা রূপকথা সূত্রের। তাঁর এই মিথিক ছবির অঙ্কন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, অথবা বলা যায় তাঁর অঙ্কনভাবনার ক্ষেত্রে, ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য-শিল্পকলার যে চলমান ধারা তার সঙ্গেই মিল বেশি। এর মূল কারণ, তিনি শুধু মাত্র প্রথাসর্বস্ব আঙ্গিক বা বর্ণসর্বস্ব চিত্রকর নন, তাঁর প্রতিটি ছবিতেই কিছু না কিছু বার্তা উচ্চারিত হয়ে থাকে—যা আমাদের ভাবায়, মুগ্ধ করে। গণেশ পাইন যন্ত্র বা শিল্পায়ন এবং তথাকথিত আধুনিক নাগরিকতার পক্ষপাতনির্ভর শিল্পী নন। বরং বলা যেতে পারে, মিথিক বাস্তবতা, লোকসাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্যশিল্প, দেশজ সংস্কৃতি বা আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক সমাজের সঙ্ঘশক্তিরই পক্ষপাতী তিনি। গণেশ পাইনের ছবিতে একটি মিথের ভাষণকে অবলম্বন করে আরেকটি মিথের প্রকৃত ভাষণ তৈরি হয়। কোনো এক জায়গায় মিথ স্থির থাকে না অথবা একই আকারে বা আখ্যানে তাকে আবদ্ধ রাখা যায় না। তা সংবর্তিত হতে থাকে, হতে থাকে পুনর্নির্মিতি। বন্ধুবর সৌরেন মিত্রের একটি চিঠির জবাবে গণেশ পাইন লেখেন (১৯৭৬) '...ইমপ্রেশনিস্টদের বুলিই ছিলো 'পেন্ট ঈজ লাইট', আমি সেই তত্ত্বটিই লিখতে চেয়েছিলাম। ওঁরা কালো রঙকে দেখতে পারতেন না দু-চক্ষে। চূড়ান্ত অন্ধকারকে কালোর ফাঁদ না পেতেই ধরতেন। তুমি যে অন্ধকারের কথা লিখেছ তা আঁকিয়ের ভাবনা অনুভবের গুহাগহ্বরের—আকাশের আলোয় যে নিসর্গ আমাদের চোখের আয়নায় ধরা দেয়, তার রঙ-রহস্যের কিনারা করার বিজ্ঞান নয়। এটা যদি মানো তবেই মন-মেজাজের অন্ধকার কালো দিয়ে আঁকার কথায় তোমার সঙ্গে সায় দিতে পারি। সেক্ষেত্রে 'আলোর পরিপ্রেক্ষিতে আঁধারের বিভিন্ন স্তর' অবশ্যই ছবির অলঙ্কার। আলো আর না-আলোর মধ্যে একটা সুষম সম্পর্ক তৈরি করতে আর-পাঁচটা রঙের দরকার হয়ে পরে সেখানে। এই রংগুলোই আলোর বিভিন্ন স্তর। এ কাজে না-আলোর রঙ কালো না হয়ে লাল হতে পারে, ধূসর হতে পাড়ে, বাদামিও হতে পারে।'(১২) আমরা তাঁর এই একান্ত কথনের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি তাঁর ছবির বিষাদ-নির্ভরতা, অন্ধকার বা কালোর জলছবিকে। এক আখ্যান থেকে আর এক আখ্যানের দিকে এগিয়ে চলাকেও।

তথ্যসূত্র

১. **নীল কস্তুরী আভার বর্ণমালা** সৌরেন মিত্র (পিলসুজ পত্রিকা, পৃ.৪৬/ফেব্রুয়ারি, ২০২২)
২. **গণেশ পাইন** (টেলিগ্রাফ/১৬ জুন, ১৯৮৫)
৩. **নীল কস্তুরী আভার বর্ণমালা** সৌরেন মিত্র (পিলসুজ পত্রিকা, পৃ.৫০/ফেব্রুয়ারি, ২০২২)
৪. **গণেশ পাইন** সাক্ষাৎকার (দেশ /১৫ মার্চ, ১৯৮৬)
৫. **গণেশ পাইনের ছবি** মৃণাল ঘোষ (পৃ.৩৪, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন/জানুয়ারি, ২০০১)
৬. **গণেশ পাইন** সাক্ষাৎকার (দেশ/২ জানুয়ারি, ১৯৮৮)
৭. **Thirst of a Minstrel : The Life and Times of Ganesh Pyne** : Shiladitya Sarkar P.31, Rupa & Co., 2005
8. **Thirst of a Minstrel : The Life and Times of Ganesh Pyne** : Shiladitya Sarkar P.77, Rupa & Co., 2005
৯. গণেশ পাইন **: নন্দনতত্ত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা** (গাঙ্গেয় পত্র/সংকলন ২/১৯৭৬)
১০. গণেশ পাইন **সাক্ষাৎকার** (বইয়ের দেশ/জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১০)
১১. গণেশ পাইন **আমি, আমার ছবির চারপাশ** (১৯৮৫)
১২. **নীল কস্তুরী আভার বর্ণমালা** সৌরেন মিত্র (পিলসুজ পত্রিকা, পৃ.৬৩/ফেব্রুয়ারি, ২০২২)

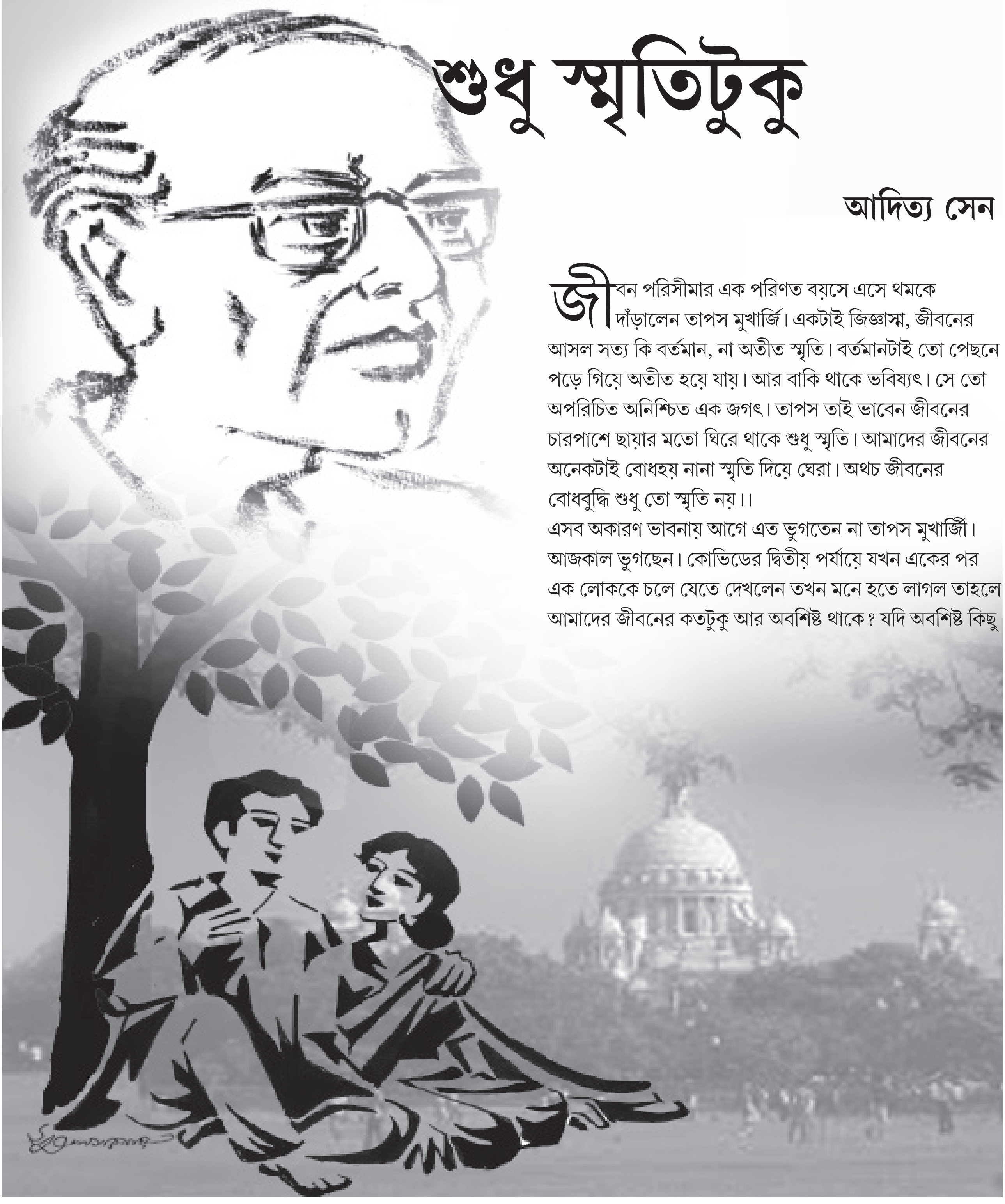

শুধু স্মৃতিটুকু

আদিত্য সেন

জীবন পরিসীমার এক পরিণত বয়সে এসে থমকে দাঁড়ালেন তাপস মুখার্জি। একটাই জিজ্ঞাস্য, জীবনের আসল সত্য কি বর্তমান, না অতীত স্মৃতি। বর্তমানটাই তো পেছনে পড়ে গিয়ে অতীত হয়ে যায়। আর বাকি থাকে ভবিষ্যৎ। সে তো অপরিচিত অনিশ্চিত এক জগৎ। তাপস তাই ভাবেন জীবনের চারপাশে ছায়ার মতো ঘিরে থাকে শুধু স্মৃতি। আমাদের জীবনের অনেকটাই বোধহয় নানা স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। অথচ জীবনের বোধবুদ্ধি শুধু তো স্মৃতি নয়।।

এসব অকারণ ভাবনায় আগে এত ভুগতেন না তাপস মুখার্জী। আজকাল ভুগছেন। কোভিডের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন একের পর এক লোককে চলে যেতে দেখলেন তখন মনে হতে লাগল তাহলে আমাদের জীবনের কতটুকু আর অবশিষ্ট থাকে? যদি অবশিষ্ট কিছু

থাকে তা কি শুধু স্মৃতি? তাই বোধহয় সবারই মুখে একই কথা শোনা যায়—‘মনে রেখো।’

আগে তাপস সকালে উঠেই আড্ডা মারতে বেরিয়ে পড়তেন চিত্তরঞ্জন পার্কের আইব্লকে। সেখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতেন। ওই জায়গাটায় বড়ো বড়ো দুটো অশ্বথ গাছ। বিশাল হয়ে আকাশ ছুঁয়ে আছে। মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকাতে হয়। এই বিরাট দুটি অশ্বথ গাছের নীচে বসে তাপস শুধু ভাবতে থাকেন। ভাবনা শুধু স্মৃতি নিয়ে নয়, জীবন নিয়েও। দিল্লিতে অশ্বথ গাছ মানেই দেবতা, তাকে পুজো করতে হয়, ছুঁতে নেই। দুটি অশ্বথ গাছ যদি পাশাপাশি বেড়ে ওঠে, তাও কেউ তার গায়ে হাত দেবে না। মালিকে বললেও কথাটা কানে তুলবে না সে। এই দেবতাকে নিজের হাতে সরিয়ে দেবার দায় কেউ নিতে চায় না। সেই দুটি গাছের এক পাশে বেঞ্চ পাতা। সেখানে সকালের আড্ডা বসে। বেশির ভাগই বৃদ্ধ। শুধু কেন্দ্রীয় সরকার কি করল আর রাজ্য সরকার কীভাবে সেটা নিল, কিংবা রাজ্য সরকার যা করেছে কেন্দ্র শুধু তারই অনুকরণ করছে কী না একবার দেখে নাও, অর্থাৎ ঘুরেফিরে সেই রাজনীতি। কিংবা জীবনযাপনের পুরোনো সেই বার্তালাপ অথবা তর্কে মশগুল হবার সুখানুভূতি। চাওয়ালা চা দিয়ে চলে যাবার পর আড্ডাটা আরও জমে ওঠে। কিন্তু কথার মোড় ফেরানো তাপসের সাধ্য নয়। তিনি চুপ করে দেখেন সূর্যের আলোটা কীভাবে আস্তে আস্তে অশ্বথ গাছ থেকে অন্য দিকে সরে যায়। তবে কি আমাদের জীবনের গতি শুধু পালটে যায়, আর শুধু কি থাকে স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট?

কিন্তু এখন এই কোভিডের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে এসে আড্ডার আসর বন্ধ। সবাই নিজের নিজের ঘরে বন্দি। কী দুরবস্থা! দেখা নেই, সাক্ষাৎ নেই, নিজের বউয়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়াও, না হয় বারান্দায় বসে বসে সামনে একটা যে অন্য অশ্বথ গাছ আছে সেটা দেখো। কত পাখি তাতে এসে বসে। পার্কের হলুদ রঙা চন্দ্রপ্রভা ফুলের দিকে চেয়ে অতীত জীবনে ফিরে তাকালেন তাপস।

মনে পড়ে গেল বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ জীবনের কথা। তাপস ইংরেজিতে কিছু লিখে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সুকুমার ভট্টাচার্যের বাড়িতে যেতেন। তখন অধ্যাপক সুকুমারের বোন শুভ্রা এক গাল হেসে কাছে এসে দাঁড়াত। শ্যামলা রঙ। ছিপছিপে গড়ন। বড়ো বড়ো চোখ। এক গুচ্ছ কালো চুল সামনের দিকে বিছিয়ে মুখের হাসিটি নিয়ে দাঁড়াত। তাপসের তখন মনে হত এমন রূপসী মেয়ে আর বুঝিবা তিনি কখনও দেখেননি। দাদা আজকে তাড়াতাড়ি বেরুবে না বলে সে তাপসকে নিশ্চিন্ত করে নানা গল্পগাছা জুড়ে দিত। শুভ্রার সেই সহজসরল অভিব্যক্তি, ওর বিহ্বলতা, ওর আকর্ষণ সব কিছু নিয়ে ওর স্মৃতি যেন জীবন্ত হয়ে আছে।

তাপস দিল্লিতে মা-বোনকে নিয়ে একটা ঘরভাড়া করে থাকেন। সাংবাদিকতা পেশা। নানা জায়গায় ছুটোছুটি করে বেড়ান আর সংবাদ সংগ্রহ করেন। একদিন শুভ্রা এসে হাজির।

—আরে শুভ্রা তুমি, আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না।

—বিশ্বাস না করারই কথা, অনেক কষ্ট করে, ঝড়ঝঞ্ঝাট সামলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

—আমি যে কী খুশি হয়েছি তোমাকে আমি তা কীভাবে বোঝাব। তুমি কত বড়ো হয়ে গেছ। কলেজে যখন তোমাকে দেখতাম ছোট্ট একটা মেয়ে ছিলে।

—সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। ওই ছোট্ট মেয়ে, ওই ছোট্ট মেয়ে করে তো আমাকে বড়ো হতে দিলেন না।

—সে কি, ছোটো বা বড়ো করার ক্ষমতা বা অধিকার কি আমার আছে? আমি শুধু দেখতাম একটি ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে হাসিমুখে আমার সামনে এসে দাঁড়াত। সে যে এত সুন্দর হয়ে চোখের সামনে বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে তাকাবে—কে ভাবতে পেরেছিল।

—কোথায় বেরুচ্ছিলেন নাকি, শুভ্রা তেমনি হাসি ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করল। হ্যাঁ, বেরুচ্ছি ইউনিভারসিটির দিকে। আজ আমার ছুটি। চলো ঘুরে আসি।

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। তাপস ইউনিভারসিটির দিকে যাবেন বলেছিলেন কিন্তু নানা জায়গায় ঘুরে এসে শেষে লোদী গার্ডেন্সে বসলেন। বললেন—তুমি আগে লোদী গার্ডেন্স দেখেছ কি জানি না। দেখো, কী সুন্দর জায়গাটা। বড়ো বড়ো গাছ, গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে। আলো এসে পড়েছে ঘাসে, বসার জায়গায়।

—ইউনিভারসিটি যাবেন বলেছিলেন আর নিয়ে এলেন লোদী গার্ডেন্সে?

—এই তো মজা। যাকে দেখেছিলাম ছোট্ট মেয়ে সে এত বড়ো হয়ে গেলে চমক দিতে ভালো লাগে। তাছাড়া এখানে যারা আসে তারা মেয়েদের মধ্যে নিত্যনতুন কিছু-না-কিছু আবিষ্কার করে। শক্তির জাত তো, চাট্টিখানি কথা।

দুজনে এসে একটা গাছের নীচে পাশাপাশি বসল। তাপস বললেন—এবার বলো, তোমার কী খবর?

—আমার কোনো খবর নেই। আপনি যখন বেনারস ছেড়ে যান তখন আমি সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। তারপর এইসবে ইংরেজি নিয়ে এম.এ. পাশ করলাম। এক মাসের জন্য দৌলতরাম গার্লস কলেজে চাকরি পেয়েছি।

—এক মাসের জন্য কেন? কেউ ছুটিতে গেছে বুঝি! তাপস জানতে চাইলেন।

—ঠিক তাই। এর মধ্যে যা কিছু করার করে নিতে হবে।

—কথাটা এমনভাবে বললে মনে হল তোমার জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই একটি মাসের ওপর।

—মেয়েরা যতই আধুনিক হয়ে উঠুক সমাজ কিন্তু অত লিবারেল হয়ে পা ফেলতে রাজি নয়।

তাপস বললেন—সেটা আমি খুব ভালো করে জানি। কিন্তু আমার প্রফেসরের বোন নিশ্চয় সেরকম কোনো বাধানিষেধ মেনে নিতে রাজি হবে না।

—আমার কথা থাকুক। আপনার কথা বলুন। শুভ্রা কী এক গভীর কারণে নিজের কথা আর বেশি বলতে রাজি হল না।

তাপস বললেন—জার্নালিজমের কত ধাপ জানি তা বলা একটু

মুশকিল। সিনিয়র ও জুনিয়ার ছাড়া মাঝখানে একটা রেখা থাকে সেখানে আমি এখন দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ এটা এমন একটা সময়, যখন একটু সাবধানে চলতে হয়। এই সময়টা যোগ্য ও অযোগ্যের বিচার চলতে থাকে। তাই অতি সাবধানে পা ফেলছি।

শুভ্রা খুব হাসতে লাগল। তাপস অবাক হয়ে ওর হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—হাসছ যে, যে হাসি দিয়ে আমাকে একেবারে বিভোর করে—তাপস কথাটা শেষ করলেন না।

শুভ্রা স্মরণ করাল—সূর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকে ছায়ার অন্ধকার।

—না, তোমার হাসিতে সবটুকু আলো, সেখানে কারুর লুকিয়ে থাকার জায়গা হবে না।

—আচ্ছা, আমার কি শুধু হাসি আছে, দুঃখ নেই? আমার সবটুকু নিয়ে বোঝার একটা ব্যাপার আছে তো। সেখানে যখন দেখি তাপসবাবু নির্বিকার—তখন আমার কী মনে হতে পারে, একবারও কি ভেবে দেখেছেন?

— হাসির মধ্য দিয়ে যাকে জেনেছি, ভালোবেসেছি, তাকে অন্য ভাবে দেখতে যাব কেন?

—এই জন্য দেখার প্রশ্ন ওঠে যে মানুষের স্বপ্ন আছে, বেদনা-দুঃখ আছে আর ঘটনার দুর্বিপাক আছে। সেজন্য শুধু স্বপ্নের মধ্যে মানুষ বিচরণ করতে পারে না। তাকে চলে ফিরে বেড়াতে হয় সমাজের সামনে এবং অনেক সময় সমাজের দাবি পূরণ করে।

—ওরে বাবা! এতটা যে ভেবে রেখেছ তা তো আমি জানি না। সেইজন্য তো বলছি, তোমার খবর আগে বলো। আমি শুধু এটুকু জানি শুভ্রাকে আমি ভীষণ—

—থাক থাক। সেটা আমিও জানি। তবে শুধু একটি মাস, তার পরেই বিচ্ছেদ ও অসীম দুঃখ লেখা আছে।

—বলো না, কী তোমার দুঃখ? তাপস শুনবার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন।

—আমি মামার বাড়ি থাকি।

—এ তো ভালো কথা যে মামার বাড়ির আদর খাচ্ছ।

—সে রকম মামাবাড়ি আমার নয়। এখানে এই বাড়িতে মেয়েদের বেশ কড়াকড়ি শাসনের মধ্যে চলতে হয়।

দুজনে নির্জন একটা স্থানে ঘাসে বসে গল্প করছিল। শুভ্রার চোখে জল। তাপসের বুকে একবার মাথা রেখে উঠে পড়ল, বলল—চলুন যাই, আর বেশি বেলা হলে মামা সন্দেহ করবে, বকাঝকা করবে অকারণে। আমার এসব আর সহ্য হয় না। আমি বড়ো ক্লান্ত বোধ করি।

তারপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর কেটে গেছে। কতবার তাপসের শুভ্রার কথা মনে হয়েছে। সেই অসহায় ভালোবাসার মুখখানার মধ্যে কী যে এক অসামান্য আবেদন ছিল—যার স্মৃতি এখনও তাপসকে বেদানার্ত করে অভিভূত করে রাখে।

শুনেছে শুভ্রার বিয়ে হয়ে গেছে এবং সে লক্ষ্ণৌতে সুখে আছে। পুরানো স্মৃতি কোনো মেয়েরই বোধহয় সংসারে খুব একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। একদিন শুভ্রার ফোন পেয়ে আনন্দে অধীর হলেন তাপস।

—কোথায়, তুমি কবে এলে লক্ষ্ণৌ থেকে শুভ্রা?

—আমার স্বামী দিল্লিতে বদলী হয়ে এসেছেন। আমি এখন দিল্লিতে।

—তোমার সঙ্গে আমি কি তবে দেখা করতে পারি?

—আগে হলে বলতাম আসুন, এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি—একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল, দেখা করার খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

—তোমার সেই হাসিভরা মুখখানা আমাকে যে এখনও তাড়া করে বেড়ায়।

—দুই ছেলে আর দুই বউ নিয়ে আমি খুব সুখে আছি। কী করব, মেয়েবেলার সেই হাসিটা আমার আর নেই।

—তবুও একবার যদি দেখা হয়।

—অত ব্যাকুলতা এখন আর আপনাকে মানায় না। আমি না-হয় মাঝে মাঝে আপনাকে ফোন করব।

তাপস বুঝে গেলেন শুভ্রা এক আকাশ-ছোঁয়া বেদনা নিয়ে ঘর করে। সেখানে স্মৃতি হয়তো শুধু বিদ্রুপ।

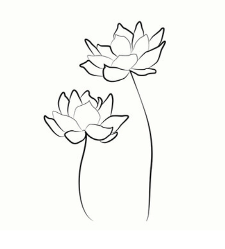

ভূতগলি

নিবেদিতা ঘোষ রায়

রাস্তা যেখানে বেঁকে গেছে জনশূন্য এক চিহ্নহীন উধাও মাঠের দিকে, তারপর নীল সাদা আকাশকে ছুঁয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, ঠিক সেই মোড়ে একটা বেজায় ভিড়ে ভর্তি ত্যাবড়ানো টিনের কৌটোর মতো বাস থেকে নামল যে লোকটা তার চেহারাটা বেশ সন্দেহজনক। হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা পাঞ্জাবি থেকে লালচে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে যেভাবে এদিকওদিক চাইছে তাতে মনে হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই। সরু ছুঁচোর মতো মুখে একটা পেনসিলের রেখার মতো গোঁপ। চেনকাটা ব্যাগের মুখ হাঁ হয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় পয়সা কড়ি বিশেষ নেই। হ্যাঁ, বেশ শক্ত একটা কাজ নিয়েই সে এখানে এসেছে। ছায়া ধরার ব্যবসার চেয়েও কঠিন। কারণ, বেঁটে চৌকো গোল লম্বা তেকোনা যত রকমের ছায়া আছে তাদের অন্তত দেখা যায়। লম্বা বাড়ির কোনায়, চাঁদনী রাতে পাঁচিলে, ঝুপসি গাছে ঝোপে ঝাড়ে। কিন্তু ভূত ধরা কি সোজা কথা।!

কলকাতায় হাজি জ্যাকারিয়া লেনে একটা অন্ধকার ঘরে বসে অনেক ভেবেচিন্তে তবে এতদূর আসা। টিকটিকিটা তিন সত্য দিয়েছিল। কাল থেকে ভেবে ভেবে মাথার ঠিক নেই। মুখের স্বাদ তেতো। চোখে কেমন ঘূর্ণি ভাব। কানের ভেতর কী যেন গুণগুণ করছে।

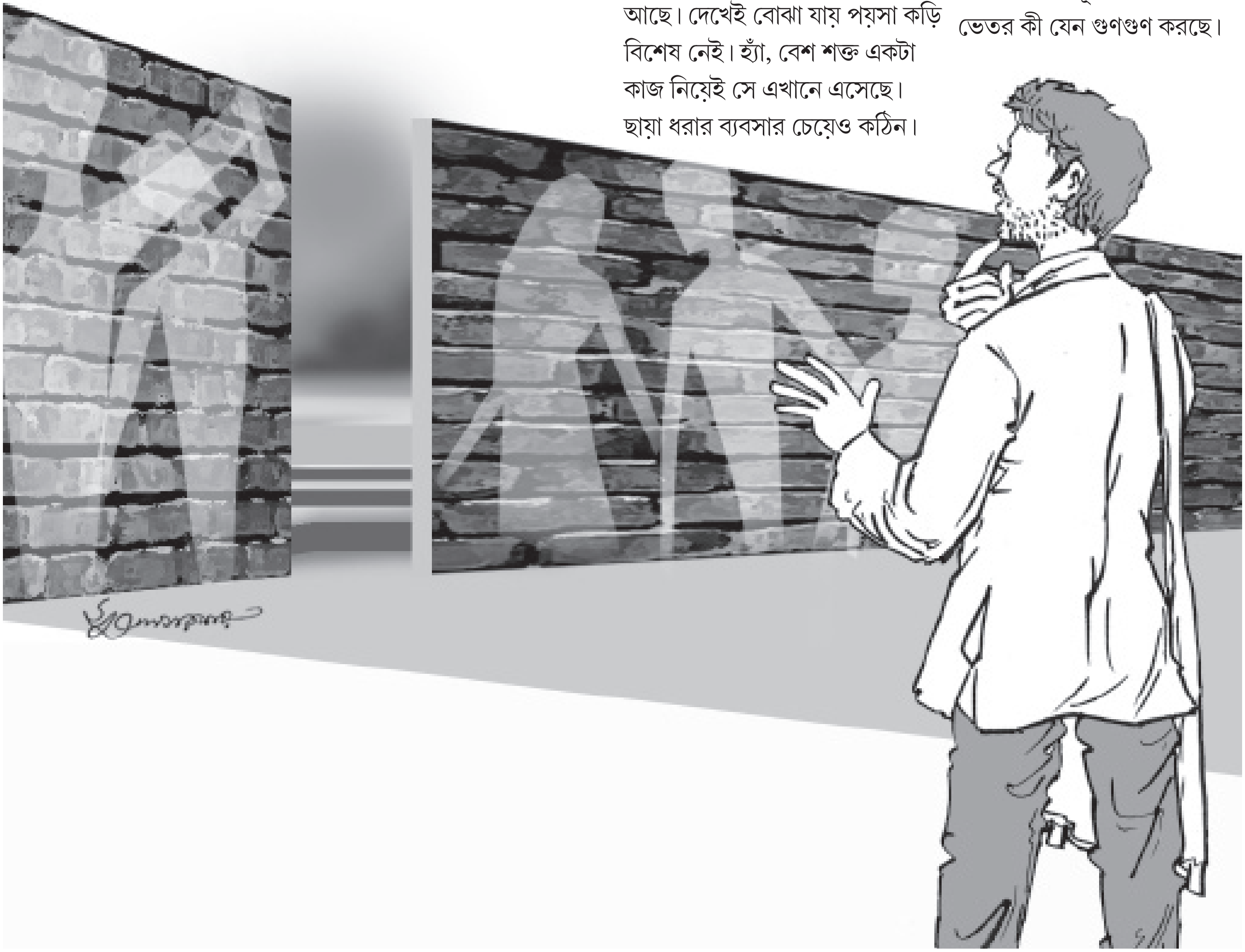

ঠাকুমা বলল, ও শ্যামা! আমতেল দিয়ে দুটি মুড়ি খাবি নাকি? শ্যামলাল কথাটা কানে তুলল না। খিদে যে পায়নি তা নয়, আসলে মাথার মধ্যে চৌখুপি সব হলুদ কালো নীল রং মিলে মিশে নানা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। হলুদ রঙের যে আলোটা এখনি বেড়ার চিলতে ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকল অমনি মাথার ভিতর থেকে নীল রং একটা বিষণ্ণ বাতাস এসে তাকে সপাটে থাপ্পড় দিল। একটা ধূসর ইচ্ছা হলুদ আলোটাকে নিয়ে একটা নতুন খেলায় ঘুঁটি সাজাতে যাচ্ছিল কিন্তু বেয়ারা কটকটে খিদেটা পেটে মোচড় দিয়ে উঠল এবং মুড়ির নাম শুনেই হাত দূরে গিয়ে জিভ ভেঙতে লাগল। গরম লুচি আর আলুর তরকারি, ভোলার জিলিপি, নলেন গুড়ের সন্দেশ নানারকম মনখারাপ করা খাবারের গন্ধ ঝড় তুলে তেড়ে এল এবং ভাবনার সব রং ঘুলিয়ে দিয়ে একাকার। শ্যামলাল ভাবে আর দেখে। যা অন্য কেউ চোখে দেখতে পায় না তাও দেখে। এই তো সেদিন হাতকাটা বিষ্টু মালিবাগান মাঠের ধারে ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়েছিল। বোম বাঁধতে গিয়ে মরেছিল। শ্যামলালকে দেখে হাসল যেন একটু ফিচকে মতো। খাঁদুদের বাড়ির, বউটা মরেছিল গায়ে আগুন দিয়ে যে সেও তো সেদিন গঙ্গাঘাটে কলসি নিয়ে কি করছিল, শ্যামলালকে দেখে ঘোমটা টেনে সরে পড়ল। শ্যামলাল দ্যাখে গাছের ছায়ায় রোদের কাটাকুটি কত রং। তার মধ্যে কিলবিল করছে কালো কালো ছায়া। সেদিন তো দেখল ফ্যাকাশে নীলচে রং এর ক্ষয়াটে রোদের ছায়া বেড়ার ধারে করে নেতিয়েছিল, চড়চড়ে হলুদ রঙের একটা রোদ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে শিকার ধরার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। শান্ত নিরীহ ঠান্ডা ছায়াটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খেল। তারপর বেজায় ক্লান্তিতে ঢেকুর তুলে ওখানে শুয়ে পড়ল। লবা দাদু নিম গাছ থেকে নেমে এল সেই রোদেরর ওপর। কতকাল আগে সব গত হয়েছেন এঁরা, তবু শ্যামা এদের হামেশাই দেখতে পায়। চণ্ডী পিসি যখন আলুর চপ ভাজার জন্য গনগনে আঁচ তোলে তখন কেরোসিন কুপির দাউ দাউ আগুনের কালিমাখা ঝাপসা ধোঁয়ায় শ্যামলাল দেখেছে খাঁদুদের বউটা কড়ার দিকে চেয়ে আছে। চপের গন্ধে চারদিক মম। ঘুম ঘুম চাঁদের ফালি নারকোল পাতার ঝালর নকশা কাটছে বউটার মুখে। আহা! চপের গন্ধে এসে হাজির হয়েছে, না খেতে পেয়ে মরেছিল কিনা।

কিন্তু এসব তো বাজারে বিকোয় না ভাই! সত্যি একটা ভূতের ইন্টারভিউ চাই। হাজি জ্যাকেরিয়া লেনে শ্যামলালের অফিস ঘর। বস বড়ো কড়া। বলেছে আনকোরা টাটকা ভূত চাই। কথাবার্তা বলে দিন কাল সম্বন্ধে তাদের মতামত যোগাড় করা চাই। ভূতপিছু ৩০০ টাকা। শ্যামলাল মরিয়া। তার বড়ো অভাব। কিন্তু শ্যামলালের চেনাজানা ভূতেরা তাকে পাত্তা দেয় না। লবা দাদুকে ধরবে বলে নিমতলায় দাঁড়িয়েছিল সেদিন অনেকক্ষণ। সে বললে, সারা জীবন অনেক মতামত দিয়েছি এখন শান্তিতে তামাক খেতে দে। কেন র‍্যা, বাঙালিদের মতামত দেওয়ার লোক কম পড়েছে যে আমাদের ঘাঁটাতে এয়েচিস। শ্যামলাল বোঝায় কী করে ভূতেদের আজকাল কদর বেড়েছে, তাদের নিয়েও সংখ্যা হয়, তাদেরও ভবিষ্যৎ আছে, কেবল শ্যামলালেরই নেই। বস বলেছে যেখান থেকে পারো অন্ততপক্ষে তিনটে ইন্টারভিউ জোগাড় করে আনো। এসময় ভূতেরা বেরোয়, সামনে কালীপুজো, অমাবস্যা। পাবলিক এখন ভূত খুব খাচ্ছে। মেঘলা আকাশ। টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হল চোখে অনন্ত ঘুম নিয়ে সোজা করে দৃষ্টি ভাসিয়ে শ্যামলাল চাইল সমুখ পানে। ভরসাহারা ভাবটা কাটিয়ে উঠে বেশ করলেই-করা-যায় ভাব জোর করে মুখে ফুটিয়ে শ্যামলাল এগুল।

সাজসরঞ্জাম অনেক। পোড়ো বাড়ি চাই, অশ্বথ-বটের ছায়া চাই। সর্বোপরি ইন্টারভিউ দিতে চাইছে এমন ভূত চাই। সেলিব্রেটি হলে ভালো হয়— যেমন রবীন্দ্রনাথ ও উত্তম কুমার।

শ্যামলাল গুটিগুটি এগোল। আলমবাজার জুটমিল। গঙ্গার সোঁদা জলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। খবর আছে এখানে পাওয়া যাবে। সামনে চায়ের দোকান। কাঠের সরু বেঞ্চিতে বসে একটা লোক বিড়ি ধরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনবার ফুঁ দিল, দুবার কানের কাছে এনে তামাকের গাঁথুনির মচমচানি শুনল। বিড়ি ধরিয়ে ছুঁচোলে ঠোঁট শরীরটাকে সোজা করে চোখ পিটপিট করে জিজ্ঞাসা করল, এদিকে নতুন নাকি, যাবেন কোথায়?

শ্যামলাল লজ্জা লজ্জা মুখে বলল, এই একটু ভূত, ইয়ে, শুনেছিলাম নাকি ভূতগলি নামে একটা বিখ্যাত মানে গা শিউরোনো গলি আছে। সাহেবকুঠি, কালপিন সাহেবের শ্মশানঘাট, সেখানেও নাকি তেনারা হামেশাই গল্পগাছা করতে আসেন?

লোকটা বিড়ি হাতে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বললো, ভূতগলি! তা যান না ওই জুটমিলের পাঁচিল গঙ্গার ধার ঘেঁষে। মজিদ ঘাট। লোকে স্নান করতে গিয়ে কত মরেছে ঐ ঘাটে, তবে মরে শান্তি পেয়েছে, মিল বন্ধ থাকলে খাবে কি? তা আবার গলিতে ঘুরতে আসবে কেন, ভীমরতি ধরেছে নাকি? ওই আমার ছোটো মেয়ে এখনই গলিতে ঢুকল, ছেলেও তো প্রায়ই বিড়ি ফুঁকতে ঢোকে তা কি আর জানি না। ঈদের দিন ঘাটে যাচ্ছি লুঙ্গি ধুতে, সাৎ করে একটা ছায়া সরে গেল। কে রে বলে হাঁক দিলাম। বুকটা একটু চমকে উঠেছিল। দেখি আমার ছেলে পাঁচিলে দাঁড়িয়ে ফুঁকছে। আমায় দেখে চাতালে উঠে পালাল। এর মধ্যে আপনি ভূত পেলেন কোথায়?

শ্যামলাল এগুল কথা না বাড়িয়ে। তার বিভ্রান্ত হলে চলবে না। কড়কড়ে টাকা। বিকেল শেষ হয়েছে। দুশো মিটার লম্বা একটা চাপা গলি। দুপাশে মিলের পাঁচিল। গলি ঢালু হয়ে নেমে গেছে গঙ্গার দিকে। গলির প্রবেশপথে চৌকো মাটির ফ্রেমে বাঁধানো গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। ইটের সিঁড়িতে জল ছলছল ধাক্কা মারছে। গলিটায় থমকে আছে একটা অদ্ভুত নীলচে আলো। একটা অজানা গাছ থেকে ঝরে যাচ্ছে পাতা, স্রোতের ওপর। বাইরের শব্দ ক্ষীণ হয়ে ভেতরে ঢুকে ধাক্কা মারছে দেওয়ালে, নানা রকম শব্দ হচ্ছে। ক্যালিডোস্কোপের মতো নানা টুকরো রং খেলছে। গলির সামনে মাদুর পেতে বসে তাস খেলছে লোকেরা। একটা বদ্ধ হাওয়া ঘুরছে! কী যেন আছে, দেখা যায় না!

শ্যামলাল এগুল সাহেব কুঠির দিকে। চারমাথা মোড় পেরিয়ে বিরাট গেট। একপাশে একটা বিহারী কুলপিওলা বসে আছে। সে বলল, হাঁ

হাঁ, চলিয়ে যান, ভিতর ভূত উত কুছু নাই, সব লোক আতে হ্যায় টাট্টি করনেকে লিয়ে। গঙ্গামাঈয়া কা ঘাট ভি হ্যায়। শ্যামলাল ভেতরে ঢুকে দেখে চাঁদের হাট। বিশাল চত্বরে মেলা লোক ছড়িয়েছিটিয়ে। হিন্দুস্থানী বউগুলো ঘাটে বর্তন মাজছে। মেয়েরা মোবাইল কানে প্রেম করছে। ছেলেরা তাদের তাক করে নিজেদের মধ্যে অবান্তর বকছে। মেয়েরা হেসে হেসে পাগল হয়ে যাচ্ছে। এমনকি এক পাল বাচ্চা বইখাতা নিয়ে পড়তেও বসেছে পোড়োবাড়ির চাতালে। শ্যামলাল বেকুব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়িটার যা চেহারা তা বেশ ভয়াবহ। দরজার কাঠের পাল্লা খুলে ঝুলছে। দোতলার জানলাগুলো ভাঙা। ভেতরে হা হা করছে অন্ধকার। ছাদে জং পড়া লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। দেওয়ালে প্লাস্টার চিরে উঠেছে বটের চারা। ঘোরানো গোল বারান্দা। মদ্যপায়ী বদ মেজাজি সাহেব নাকি পোষা কুকুরকে মাঝরাতে গুলি করে। সেই থেকে কালো বিশাল হাউন্ডকে দেখা যায়। বাঁশের নৌকা, বালির নৌকা যায়; তারা দেখেছে। বাগানের গাছ থেকে কুয়াশার মতো অন্ধকার ছড়াচ্ছে। মাঠ ছেড়ে লোকজন বাড়ি ফিরছে। একমাথা আগাছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা থাম। মাঠের নাম নাকি টাইগার মাঠ। কিন্তু তারা কোথায়? দু-চারটে নেড়ি কুকুর ধুলো শুঁকছে।

শ্যামলাল পা চালাল। কালপিন সাহেবের শ্মশানঘাট। ঝকঝকে পরিষ্কার মাটির ঘাট, বাঁধানো নয়। অন্ধকারে চকচক করছে সাদা জল।   এখানে-ওখানে ফস জ্বলে উঠছে আগুন। দেশলাই। গাঁজা টানছে। পড়ে আছে বাংলা মদের বোতল। একটা মরা পুড়ছে চড় চড় আওয়াজে। আগুনের লাল ছায়ায় মূর্তির মতো বসে আছে কয়েকটা ছেলে। শ্যামলাল তাদের মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেলল তারা কেউ ভূত দেখেছে কিনা। একজন বলল দানা খাওয়া, দা-খাওয়া, তেলে পোড়া কত রকম মাল আসে। দেখিনি কিছু, তবে একটা স্যাড কেস আছে। আমাদেরই বন্ধু ফালতু ফালতু চ্যালেঞ্জ নিতে গিয়ে ফুটে গেল। মাঝরাতে শ্মশানে এসেছিল একটা পেরেক পুঁতে ফিরে যাবে। পেরেকের সঙ্গে নিজের পাঞ্জাবির খুঁট পুঁতে ফেলেছিল, যখন ফিরে যাবে বলে উঠেছে পাঞ্জাবিতে টান, ওখানেই হার্ট অ্যাটাক। এই তো এখানেই পোড়ালাম। শ্যামলাল ভারি মনে পেছন ফিরল। কি একটা স্যাঁত করে সরে গেল। ছেলেটা বলল, ও কিছু না, শেয়াল। শ্যামলালের মনটা হতাশ। তিনশো টাকা করে তিনটে ভূত— নশো টাকা আয় হত। শ্যামলালের পেছন থেকে একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল, দাদা, মিঠুনদাকে বলবেন শ্মশানে একটু কম লাশ পাঠাতে, হেভি লোড পড়ে যাচ্ছে। বাকিরা খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল। শ্যামলালের অভিমান হল। লোকজন এরকম খিল্লি ওড়াচ্ছে কেন? ঠিকঠাক ভূত কি নেই? শ্যামলাল তো রোজই দেখে। নাকি তারা জানাশোনা, তাই দেখে। সাঁই সাঁই করে হাওয়া দিচ্ছে। হেমন্তের হিম হিম রাতের স্তব্ধতা আর নেই। বৃষ্টি এল। ছিপছিপে জলের ছাট আসব-আসব শীতটাকে একেবারে মেরে দিয়েছে। অন্ধকার জমে আছে কোনায় কোনায়। তাদেরও তাড়ানোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আলোয় ট-ট করছে চারি দিক। কী করে থাকবে তারা? দুরগুম দুরগুম শব্দে পেঁচা ডেকে গেল। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে বটতলায়। খড়ের খাঁচায় মাটি লেপা জিব বের করা একটা আধ খেচরা ল্যাংটো কালীমূর্তি। রোদে জলে হেজে মজে কেতরে আছে। হঠাৎ দেখে চমকে উঠেছিল। একটা ধেড়ে ছুঁচো ছুটে পালাল শ্যামলালের পায়ের ওপর দিয়ে, চিকচিক শব্দে ব্যঙ্গ করে। প্রবল ইয়ার্কি করে যেন ধরা পড়ে গেছে এমন ভাবে জিভকাটা কালী তাকিয়ে আছে শ্যামলালের দিকে। আর কোথাও কেউ নেই। অন্ধকারকে চেটেপুটে খেতে খেতে এগোচ্ছে আলোর জিভ। লাল-সবুজ টুনি জ্বলছে নিভছে। মনে এসে বাসা বেঁধেছে অনিশ্চয়তার অন্ধকার। মাঠের ঢালু আল বেয়ে আলো গড়িয়ে নামছে প্রকৃতির অন্ধকারে ঢেকে দিতে। দু বাহু তুলে দাড়িয়ে আছে সভ্যতার ত্রিফলা আলো। শ্যামলাল ফিরে চলল ভূতগলির দিকে। ওখানে এখনো রয়েছে অদ্ভুত এক নীলচে ম্যাজিক। বেচতে হলে ম্যাজিকটাই বেচবে।

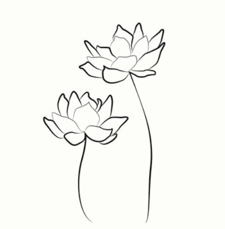

লাল লিফলেট

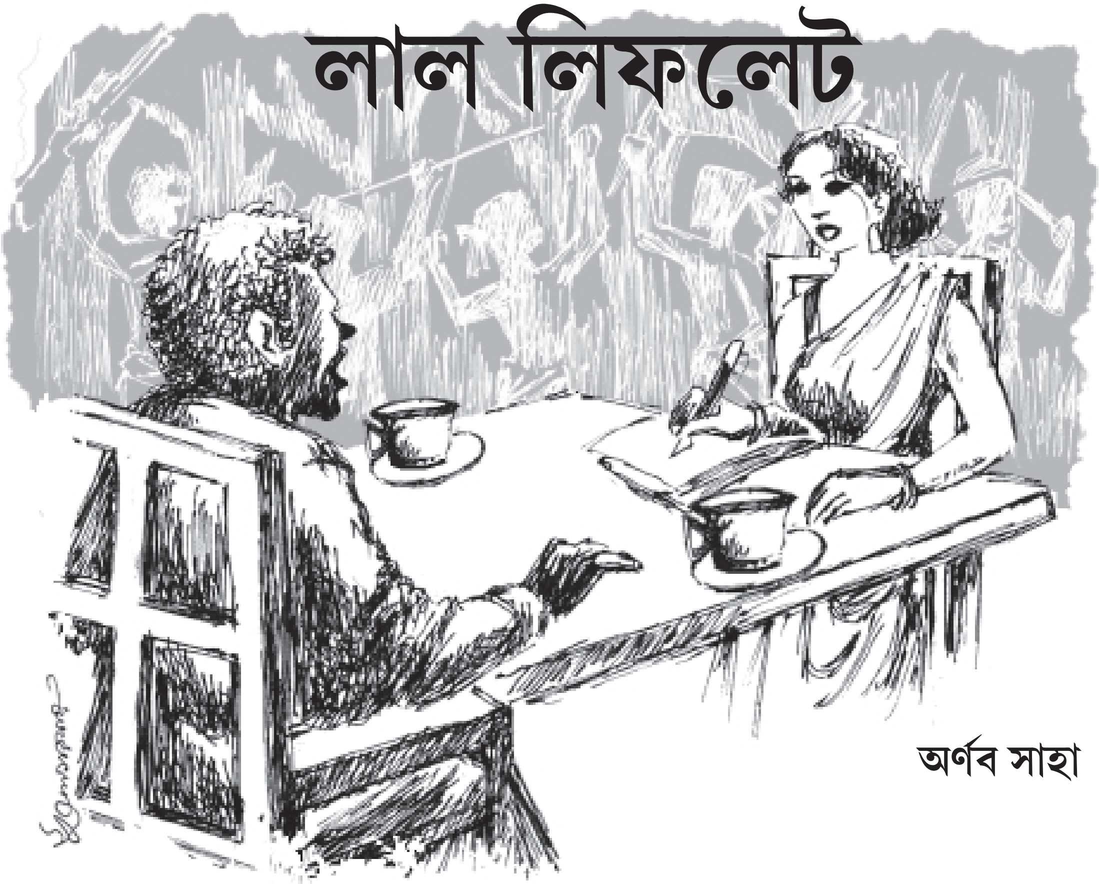

অর্ণব সাহা

গোলপার্ক মৌচাকের সামনে যখন নামলাম, রোদ্দুর প্রায় নিভে এসেছে। আশেপাশের বাড়িগুলো, দোকানপাট, বিশেষত ফুলের দোকান, এক অদ্ভুত তামাটে অন্ধকার চাদরেমোড়া। মন বিষণ্ণ থাকলে আলোর অভাব চোখে পড়ে। সেন্টার থেকে বেরোনোর আগের মুহূর্তগুলো যতবার মনে পড়ছিল, অক্ষম রাগ গুলিয়ে উঠছিল পেটের ভিতর। এরকম সময়ে যতটা সম্ভব বাতাস টেনে নিতে হয় মগজে, শরীর হালকা করে দিতে হয়। আমিও সেটাই চেষ্টা করছিলাম। লোকটা অবশ্য হাত ধরেছিল, আর এগোয়নি। ওর অদৃশ্য আঙুল আমার বুকের আশপাশের শূন্যতায় কিছু খুঁজছিল। টের পেয়েছি আমি। মেয়েরা টের পায়। আর গত ছ-মাসের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট? পুরোটা রাখা আছে আমার মোবাইলে। টার্ম পেপার জমা দেবার আগেই এই চেহারা রিসার্চ গাইডের? পুরো কোর্স তো এখনও বাকি! আমি ধীর পায়ে এগিয়ে যাই উজ্জ্বল সিসিডির দিকে। ভিতরে লোক সামান্যই। কোভিড পরিস্থিতি নরম্যাল হবার পরও দামি ক্যাফেগুলোয় ভিড় তেমন হচ্ছে না। সেটা অবশ্য একদিক থেকে ভালোই। আমি আজ যাঁর সঙ্গে বসব, কথা বলব, উল্টোপাল্টা ভিড়ের মধ্যে তিনি বেমানান। মানুষ নয়, আমি একটা অদেখা স্বপ্নের ইন্টারভিউ নিতে চলেছি আজ। যে স্বপ্ন আমি নিজে দেখিনি, কেবল আমার আশৈশব পড়াশুনো, বাড়ি-ইউনিভার্সিটি-আত্মীয়-বন্ধুদের পরিসরে দেখেছি সেই স্বপ্নের বিস্তার। আর এখন আকাশে কালো রং ঘন হয়ে উঠেছে। কিছুটা ক্রুদ্ধ অভিমান, ক্ষোভ, অসহায়তা নিয়ে আমি অটো থেকে নামলাম। কিন্তু আমার শরীরে রোমাঞ্চ আর রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। আমি এই হালকা শীতেও ঘামছিলাম। সিসিডির সিঁড়িতে পা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। না। যাঁর সঙ্গে কথা বলব বলে আজ এসেছি, তিনি এখনও অনুপস্থিত। আমি কাচের দরজা ঠেলে ভিতরের একটা কর্নারের টেবিলে গিয়ে বসলাম। নজর রইল দরজায়...

প্রায় মিনিটদশেক বাদে একটা ভারী ছায়া পড়ল গেটে। তিনি ঢুকছেন। সেই মোনা চৌধুরীর ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলোতে যেরকম দেখেছি। আমাদের সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের আর্কাইভে প্রায় সব ছবিই ডিজিট্যালি সংরক্ষণ করা আছে। এখনও অসম্ভব স্বাস্থ্যবান, কালো পেটানো চেহারা। যদিও বয়সের ভারে একটু ক্লান্ত, ন্যুব্জ। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা, যা আমি আগে কোনো ছবিতেই দেখিনি। পরনে একটা ধূসর আধময়লা প্যান্ট, গায়ে চাদর জড়ানো। ভিতরে ঢুকে একটু

দিশেহারা হয়ে গেলেন যেন। খুঁজছিলেন। আমাকে। আমি নিজেই উঠে এগিয়ে গেলাম। আমায় দেখেই একটা অদ্ভুত শিশুসুলভ হাসিতে ভরে উঠল মুখ। গোটা ক্যাফের ভিতর যেন খানিকটা বেমানান উনি। চাপা মিউজিক বাজছে। টোনি মরিসন। আমি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এলাম আমার টেবিলে। উনি প্রথমে ক্যাফের ভিতরটা খুব খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন

—পুলকের মেয়ে তুমি?

—হ্যাঁ...কী বলে ডাকব ভাবছি তখন স্যার? জেঠু? দাদা?

—পুলক কেমন আছে এখন?

—বাবার বয়স হয়েছে। রিটায়ার করবে সামনের মাসে...

—ওকে যখন প্রথম দেখি, ঠিক তোমার মতো বয়স ওর...

—জানি। বাবা সারাক্ষণ বলে আপনার কথা...

—আমার কথা আর কীই বা বলার আছে...উনি যেন হাসলেন একটু...

—আপনি ছিলেন লিজেন্ড। আপনার সম্পর্কে বাবার মুখেই প্রথম শুনি। পরে রিসার্চ করতে এসে আরও পড়েছি, জেনেছি...

—কী জেনেছ?

—যেগুলো জানিনি সেইসব কথা জানতেই তো আজ এসেছি এখানে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। প্রচুর খেটেছি আমি...

উনি মৃদু হাসলেন। একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতা জড়ানো সেই হাসিতে...

—একটু দূরে, যোধপুর পার্কের ওখানে একটা বস্তি আছে না?

—ওটা এখন আর নেই। লোকগুলো সরে গেছে ঢাকুরিয়া স্টেশনের দু-ধারে। ওখানে সুখিয়া বলে একটা লোক থাকে। আমি তারও ইন্টারভিউ নিয়েছি। লোকটা চেনে আপনাকে...

—তুমি জানো, আমি কলকাতায় ওদের বস্তিতেই অ্যাবস্কন্ড করেছিলাম...

—জানি। সুখিয়া, চমনলাল, ফুলমণি ওঁরাও—এদের কাছে আপনি এখনও ভগবান...

—সুখিয়ার বয়স এখন কত? বহুকাল আগের কথা সেসব...

—সত্তর পেরিয়ে গেছে। সুখিয়া বলে জঙ্গল ভগবানের কথা...

‘যব কানু-জঙ্গল ছুটেগা/জেল কা তালা টুটেগা’! কারা তৈরি করেছিল এইসব লাইন? কারা ফিসফিস করে উচ্চারণ করত ঝোড়ো হাওয়ার উদ্দাম শ্লোগান? আমার সামনে এখন বসে আছেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর। আগের চলমান কিংবদন্তী জঙ্গল সাঁওতাল! কয়েকটা লোক, প্রেমিক-প্রেমিকা, ছাত্রছাত্রী, ছড়ানো-ছেটানো এই ক্যাফেতে কেউই জানে না, আমি আজ কার সামনে বসে আছি। এমন একটা লোক, কাগজে-কলমে যাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে ১৯৮৮ সালের ৩ ডিসেম্বর। কিন্তু নথি সবসময় সত্যি বলে না। এই তো, লোকটা আমার সামনে বসে আছে এখন...ভঙ্গুর শরীরটা দেখে মায়া হল। অথচ একবারের জন্যও মনে হল উনি নিজে কোথাও ভেঙে পড়েছেন। তাহলে ’৭৭-এ বামফ্রন্ট আসার পর যখন জেল থেকে বেরোলেন, তারপর আর সেইভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে থাকতে পারলেন না কেন? কেন ওঁর একদা-কমরেডরাই পরিত্যাগ করল ওঁকে? প্রশ্নটা কুরে কুরে খাচ্ছিল আমায়। যেদিন সিদ্ধান্ত নিই ওঁকে নিয়েই আমার এম.ফিল ডিসার্টেশন তৈরি করব, সেদিন থেকেই। বিশেষত জঙ্গল সাঁওতালের জীবনের ওই শেষ অধ্যায়টাই আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক। আমি, মূলত, সেই শেষদিনগুলোর হদিশ খুঁজতেই আজ এসেছি এখানে। বহু কষ্টে ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করেছি। শুনেছিলাম চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছেন। আমি আর দেরি করিনি। পুলক সরকার, আমার বাবা, একসময় কানু সান্যালের গ্রুপে সক্রিয় রাজনীতি করত, তখন বাবার বয়স কতো হবে? চব্বিশ-পঁচিশ মাত্র। সেই আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নব্বইয়ের গোড়ার দিক পর্যন্ত বাবা ছিল ওই সংগঠনে। সেসময় দিনের পর দিন উত্তরবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে পড়ে থেকেছে বাবা। ঘুরেছে একের পর এক চাবাগানে। এখন একটা বিখ্যাত বিজ্ঞাপন এজেন্সির মাথায় বসে থাকা লোকটার পুরোনো কন্ট্যাক্ট যথেষ্ট। বাবা আমার এই গবেষণার কাজে সবচেয়ে বড়ো সহায়।

—কফি খাবেন?

—এখানে কফির প্রচুর দাম, তাই না?

খাবেন?..নরম গলায় বলি আমি...

—কত দাম এককাপ কফির?

—শ’দুয়েক টাকা হবে। খাবেন আপনি?

—তুমি খাবে না?

—নিশ্চয়ই। আমরা দুজনেই নেব...অর্ডার করি?

—কী নাম যেন বলেছিলে তোমার?

—তৃষা। তৃষা সরকার..

—জানো, আমার শেষদিনটায় পুলকের একটা চিঠি পেয়েছিলাম...

—শেষদিন?

—আমার তো ইচ্ছামৃত্য রে বেটি...সেদিন বুকে ব্যথা হচ্ছিল দুপুর থেকেই আমার বোন বাসন্তী আমারে একটা গাড়ি করে নিয়ে গেল নকশালবাড়ি হাসপাতালে। সেখানে বেড নাই। সারারাত আমারে শুইয়ে রাখল মেঝেতে। পরদিন সকালে আমি নিজেই উঠে চলে এলাম বাড়ি। দুপুরে বেশ স্পষ্ট টের পেলাম দেহটা ছেড়ে আমি নিজেই বেরিয়ে আসছি...

—বাবার সঙ্গে তো অনেকবার দেখা হয়েছে আপনার...

—হ্যাঁ অনেকবার। যেদিন কানুদার পার্টি ওপেন হল, সেইদিন তুমার বাবা আর ওই ফটোবাবু গেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হল। ওদের সঙ্গে ফেরার রাস্তায় কত কথা হল। চা খাওয়া হল...

—ফটোবাবু কি মোনা চৌধুরী?

—হ্যাঁ। মোনা। তারিখটা আমার আজ আর মনে নেই...

—২৪ মে, ১৯৮৫...নকশালবাড়িতে...

—তার আগেই আমারে ফুটিয়ে দেছে পার্টি...আর সেই সভাতেও আমারে ওরা ডাকে নাই। আমি কেনে যাব?

—কিন্তু আপনি তো গিয়েছিলেন? সেই মিটিং-এ একাধিকজন আপনাকে দেখেছিল...

—হ্যাঁ গেছলাম। একধারে বসে ছিলাম। কেউ আমারে দেখে কিছু কয়নিকো। আমিও কিছুক্ষণ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম...আচ্ছা, তুমি

এত কথা আমারে জিগাও কেনে?

—আপনাকে যে আগের দিন বললাম, আমি থিসিস লিখছি আপনাকে নিয়ে...

—থিসিসে সব সইত্য লিখতে পারবা?

—সত্যিগুলো জানার জন্যই তো আমি আজ এখানে এসেছি। আপনার সামনে বসে আছি...আপনি জানেন, আমি এ অব্দি অন্তত দু-ডজন লোকের ইন্টারভিউ নিয়ে ফেলেছি...নর্থ বেঙ্গল গেছি। কানুবাবুর সিওআইএম.এল-এর লোকজনের সঙ্গেও মিট করেছি...আপনার 'লাল লিফলেটে'র অরিজিনাল কপি আছে আমার কাছে...'তরাইয়ের কৃষকের পাশে দাঁড়ান'...নীচে স্বাক্ষর—'জঙ্গল সাঁওতাল, সভাপতি, শিলিগুড়ি মহকুমা কৃষক সমিতি'। জেল থেকে বেরোনোর পর তো কানুবাবুর গ্রুপে আপনি জয়েন করেছিলেন শুনেছি...১৯৭৯ সালে...ওসিসিআর-এ...কিন্তু ১৯৮৩-তে পার্টিফর্মেশনের সময় আপনি সরে এলেন কেন?

—সরে আসি নাই...আমারে তাড়ায়ে দেল...

—সেটাই তো জানতে চাইছি। কেন?

—ওই নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন আমি করছি...আমি...তোমরা তো এটা জিগাও না আমারে পার্টিতে প্রথম থেকেই কোনঠাসা কইরা রাখছিল কেন ওরা?

—১৯৭০-এ রাজ্য কমিটিতে আপনাকে রাখা হয়েছিল...কিন্তু প্রথম পলিটব্যুরোতে আপনি ছিলেন না...

—আমি সাঁওতাল। আমার পদবি কিস্কু। আমি লিখাপড়া শিখি নাই। মার্কসবাদ পড়ি নাই...আমি বাবুলোক নই। ওরে বিটি...ওরা গোড়া থিক্যাই আমারে খাটো নজরে দেখত...

—হ্যাঁ, এই কথাগুলো অনেকেই বলেছেন পরবর্তীকালে...

—লাল লিফলেট তুমি পেলা কুথায়?

—বাবার কাছে ছিল। কালো ঝুরঝুরে হয়ে গেছে পুরোটা। আচ্ছা, ওটার নাম 'লাল লিফলেট' হল কী করে?

ফের শিশুর সারল্যে হেসে ওঠেন জঙ্গল। একবার গোটা ক্যাফেটেরিয়ার ভিতর চোখ বোলান...

—ওটা ছাপা হয়েছিল একটা লোকাল প্রেসে। ছাপার আগে লাল কালিতে কিছু একটা ছাপা হয়েছিল ওই মেশিনে, লাল কালি মুছে কালো কালিতে ছাপতে অনেক সময় লাগত, তাই ওই মেশিনেই ছাপা হল লিফলেটটা, নাম হয়ে গেল লাল লিফলেট...আমরা কিন্তু এই নাম দিই নাই!

—জানি। এই নাম কলকাতার পার্টিকর্মীরা দিয়েছিল...

—আমি পার্টিতে ছিলাম ১৯৭০ অব্দি। যখন জেলে যাই, তখনই জানতাম, চারুদার লাইন ভুল...

—কোনটা ভুল?

—কেন? খতম লাইন!

—সেকথা আপনি তখন বলেননি কেন?

—বললে কেডা শুনত আমার কথা? চারুবাবুর লাইন ছিল ভুল। ওরা কেউই কৃষক না। আমি হালবলদ নিয়া মাঠে চাষ করা লোক। আমি চাষের কথা ওদের চ্যায়া ঢের ভালো বুঝি...চাষার মন আমি অনেক বেশি পড়তে পারি...আন্দোলন দেড় বছরেই শেষ হত না ওই ভুল না করলে...

—আপনি তো ইলেকশনেও দাঁড়িয়েছেন...

—হ্যাঁ। দুইবার।

—তখনও আপনি অবিভক্ত পার্টিতে ছিলেন। প্রথমবার ১৯৬২ সাল...আপনি কংগ্রেসের কাছে। হারেন, পিএসপির ঈশ্বর তিরকের সঙ্গে ভোট-ভাগাভাগি হয়ে যায়, আপনি ১৩,০০০ ভোট পেয়েছিলেন...দ্বিতীয়বার ১৯৬৭-তে সিপিএমের প্রার্থী হিসেবে...ফাঁসি দেওয়া কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী তেনজিং ওয়াংদির কাছে ৬,০০০ ভোটে হেরে যান, নইলে যুক্তফ্রন্টের বিধায়ক হতেন...

—তুমি এত কিছু জানলা কোত্থেকে?

—আমি তো এটা নিয়েই কাজ করছি...আমার গাইডও নকশাল রাজনীতি করতেন...তবে অন্য গ্রুপ..উনি বাবার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়ো...

—কী নাম?

—প্রবীর রায়চৌধুরী...চেনেন?

—জালি মাল!

আপনি চেনেন?

—ওরে চিনে আরও অনেকেই। সেকেন্ড সিসি করত। নিশীথ-আজিজুলদের সঙ্গে পার্টির তহবিল তছরুপ করেছিল...পার্টি থেকে ওরে তাড়ায়ে দেছেল...

—হ্যাঁ। উনি এক্সপেলড হয়েছিলেন...

আমার চোখে-মুখে কি মুহূর্তের জন্য অন্য কোনো ধূসর ছায়া পড়েছিল? প্রেসিডেন্সি থেকে মাস্টার্স করে এই সেন্টারে আসি এমফিল করার জন্য। মাত্রই ছসাত মাস হয়েছে এখানে জয়েন করেছি আমি। বিষয় নকশালবাড়ি, বিশেষত জঙ্গল সাঁওতালের কন্ট্রিবিউশন হওয়ায় এই বিষয়ে সবচেয়ে নামী এবং রিসোর্সফুল অধ্যাপক প্রবীরবাবুর সঙ্গেই যোগাযোগ করি। এবং ওঁর আন্ডারেই কাজ করতে শুরু করি। বাবার পরিচিত, তাই উনি প্রথম থেকেই একটু আলাদা গুরুত্ব দিতেন আমায়। যদিও ওঁর সম্পর্কে বেশ কিছু বিরূপ কথাবার্তাও শুনেছিলাম আগেই। কাজ শুরুর সময় থেকেই উনি ওঁর পাটুলির ফ্ল্যাটে যেতে বলতেন আমায়।

সেখানেই তুমুল আড্ডা, পড়শুনোর আলোচনা, মদ খাওয়া হত। একদম শুরুতে আমার সেরকম কোনো আলাদা অনুভূতি হয়নি। প্রবীরদার স্ত্রী ওঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। একমাত্র মেয়ে আমেরিকায় থাকে। অধ্যাপনা করে। কিন্তু যেদিন ফাঁকা ফ্ল্যাটে উনি প্রথমবার আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরলেন, আরও কিছুদিন পরে নিয়মিত নানা ছুতোনাতায় আমার শরীরে হাত দিতে শুরু করলেন, আমি রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়লাম। বাড়িতে কিছু বলিনি, কারণ, আমি মনে করি আমি যথেষ্ট স্বাবলম্বী, আর এইসব সমস্যা নিজে একলাই ট্যাকল করার মতো মনের জোর আমার রয়েছে। আমি একাই সামলে নেব। আসলে রাগের চেয়েও আমি

আহত হয়েছিলাম বেশি। বাবাকে দেখেছি, অত উঁচু কর্পোরেট পোস্টে চাকরি করেও নিজের যৌবনের রাজনীতি এবং সংশ্লিষ্ট বন্ধুদের প্রতি বাবার শ্রদ্ধা ও দরদ কতখানি গভীরা, এখনও কলকাতায় যেকোনো সিভিল রাইট মুভমেন্টের সামনের সারিতে থাকা মানুষটির নাম পুলক সরকার। প্রবীরদা অসম্ভব ভালো স্কলার। অস্ট্রেলিয়া থেকে পিএইচডি। বহুবার বিদেশে গেছেন। কিন্তু ওঁর রাজনৈতিক অতীত আর আজকের উনি একেবারেই দুমেরুর। বিপরীত। এখন জঙ্গলের মুখে শুনে টের পাচ্ছি, ওঁর ভিতরে অনেকরকম ভাইস একদম গোড়া থেকেই ছিল। এরপর রাতের পর রাত ড্রাঙ্ক অবস্থায় আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে উষ্ণ টেক্সট অথবা ভোররাতের দিকে ফোনকল আমার কাছে পুরোটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। আবার একইসঙ্গে ভাবছি, মাত্র দু-বছরের এমফিল কোর্স। কমপ্লিট হয়ে গেলেই আমিও দেশ ছাড়ব। এসবের মধ্যে ফের বাবা-মাকে জড়িয়ে ফেলা, বন্ধুবান্ধবকে জড়িয়ে একটা স্ক্যান্ডাল তৈরি করে আমার নিজের কাজটা ক্ষতিগ্রস্ত হোক এটা কাম্য নয়। হয়তো অন্য কোনো মেয়ে হলে এতদিনে সেন্টারের অ্যান্টিহ্যারাসমেন্ট সেলে জানিয়ে, ফেসবুক পোস্ট করে বিরাট হৈচৈ বাঁধিয়ে দিত। ইনফ্যাক্ট, এরকম কাজ আমার বন্ধুরাই আকছার করছে। কিন্তু আমি অকারণ নাটকীয়তা পছন্দ করি না। আমার জীবনযাপনে কিছুটা একাকিত্ব, নিজস্বতা জরুরি। নিভৃতি পছন্দ করি। আমি চাই না আমার কারণে আমার চারিপাশের লোকজন অকারণে ব্যতিব্যস্ত হোক। কিন্তু এমফিলের কাজ যে বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমার গাইডেরই কারণে, এটা নিশ্চিত। পুলকস্যারের কাছে যেতেই একধরনের রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে নিজেরই ভিতর থেকে।

জঙ্গল সাঁওতাল কিছুক্ষণ কফির কাপটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন এতাক্ষেণ। এইবার হাতে তুলে আলতো চুমুক দিলেন। তারপর চেয়ে রইলেন আমার দিকে! উনি কি কিছু বলবেন?

—প্রবীর তোমারে বিরক্ত করছে, তাই না?

আশ্চর্য! আমি তো কিছুই বলিনি ওঁকে। উনি কি অন্তর্যামী? কে উনি? অন্য কেউ? জঙ্গল সাঁওতাল সেজে এসেছেন আজ আমার সামনে? কফির কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে উনি বাইরের দিকে তাকান...

—৭ ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২। হাতিঘিষা কৃষক সভার প্রথম সভাপতি আমি। জোতদার সেরকেত সিং-এর জমিতে তেভাগা নিয়ে একটা প্রচণ্ড গণ্ডগোল হয়। আমাদের কমরেডরা প্রচণ্ড মার খায়। আমরা পালিয়ে গেছিলাম।

—জানি। চা-শ্রমিক আন্দোলনের শুরুর দিকেও তো আপনিই ছিলেন, তাই না?

—১৯৫৫ সালে বোনাসের দাবিতে, আরও পরে বেনামী জমি উদ্ধারের দাবিতে লড়াই ছড়িয়ে পড়ে গোটা জেলায়। তখনও অত আড়কাঠি ঢোকেনি পার্টিতে। এই প্রবীরের মতো লোকজন দেখলে এক কোপে মুণ্ডু আর ধড় আলাদা করে ফেলতে ইচ্ছে করত আমার...

—প্রবীর-স্যারকে আপনি চিনলেন কীভাবে?

উনি কিছুক্ষণ থামলেন, না একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল যেন!

—কানুদা পরে আমার নামে যা-তা কুৎসা করেছে। আমি মদ খাই। পার্টির কাজে সময় দিই না। নারীসঙ্গ করি। আমার মধ্যে বাবুয়ানি ঢুকছে, আরও কত কী!

—উনি বলেছেন, জেলে থাকার সময় থেকেই আপনার মধ্যে বদল আসছিল...

—না। আমি বাবুদের মত মানছিলাম না সেই ১৯৭০-৭১ থেকেই। জানতাম একটা দিন আসবে যেদিন আমি এদের সঙ্গে থাকতে পারব না...

—আমার স্যারকে কীভাবে চিনলেন আপনি?

—কানুদার পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে আমি বসে থাকিনি। লড়াইও ছাড়িনি...

—জানি। ১৯৮৪ সালে 'সংগ্রামী কৃষক ঐক্য সমিতি' তৈরি করেছিলেন। হাতিঘিষা থেকে বারো কিলোমিটার দূরে আপনাদের প্রথম সম্মেলন হয়েছিল। সেখানেই আপনি প্রথম বলেন, কৃষক আন্দোলনে পার্টি নেতৃত্ব প্রয়োজন নেই...

—নেই তো। একশোবার নেই। উয়ারা কৃষকের কী বুঝে?

—বোঝে না? কিন্তু তার আগে-পরে এতগুলো লড়াই পার্টির নেতৃত্বেই তো হয়েছে...

—ফাঁক ছিল। অনেক ফাঁক। আর সেই ফাঁক দিয়েই প্রবীরের মতো জোচ্চোরগুলা ঢুকে পড়ে। কৃষক সংহতি নষ্ট করে। তোমার স্যার ছিল আমার সঙ্গে, সেই সভায়...

—বলেন কী!

—হ্যাঁ। খুব চতুর...খুব সেয়ানা...যখন বুঝল আমাদের ছোট্ট সংগঠনে থেকে কিছু হবে না, তখন নিশীথ-আজিজুলদের সঙ্গে ভিড়ে গেল... ওদের নামডাক অনেক বেশি তখন...

—কিন্তু সেকেন্ড সিসির পার্টিলাইন তো আপনাদের থেকে একেবারেই আলাদা...

—পুরোটাই ভুল লাইন। চীনা পার্টির লিন পিয়াও লাইন। সেই ভুল খতমের রাস্তা...কিছু ছেলে মরে গেল আর প্রবীরের মতো কিছু ধান্দাবাজ নকশালি নাম ভাঙিয়ে করে খেল...নামডাক হল তাদের...

—আচ্ছা! কানুবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নষ্ট হল কেন? উনিই তো আপনার পার্টি মেম্বারশিপ প্রোপোজ করেছিলেন...সেই তিনিই আপনাকে জেল থেকে চিঠি লিখছেন ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৭। আপনাকে সঠিক পথে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন...

—উ আমারে হুকুম দিবার কে? কে উ? আমি জঙ্গল সাঁওতাল। আমি নিজেই নিজের মালিক...

—বামফ্রন্ট সরকার আপনাকে পুনর্বাসন দিতে চেয়েছিল...দিনাজপুর লাইনে বাসের পারমিট বের করে দিয়েছিল, আপনি সেই পারমিট নিয়েওছিলেন...কানুবাবু আপনাকে লম্বা চিঠি লিখে পারমিট নিতে বারণ করেছিলেন...বলেছিলেন, এটা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি...

—আরে রাখো তুমার কানুবাবু..আমারে সিপিএম পার্টিতে ফিরে আসতে হাতেপায়ে ধরেছিল..আমি যাই নাই...বেইমানি করি নাই... পারমিট আমি নিছি...কিন্তু রাখি নাই..বেইচ্যে দিছি...আমার পরিবার

যখন না খ্যায়া মরতেছিল তখন কুথায় ছিল তুমার কানুবাবু?

—উনি কিন্তু বিপ্লবী হিসেবে আপনার বিচ্যুতি নিয়ে কথা বলেছিলেন...

—আরে থামো। অত বড়ো বড়ো বিপ্লবী পণ্ডিত উয়ারা...পার্টির নেতারা...উয়ারা কেউ কারো সঙ্গে বনাতি পারে নাই...আমি লিখাপড়া শিখি নাই...কিন্তু আমি বুঝছিলাম এই পথ ভুল...এখন তুই বল্ বিটি, আমি কী করতাম? আমি কোন্ পথে যেতাম?

—কোন পথটা আপনার ভুল বলে মনে হয়েছিল?

—উয়াদের কৃষিবিপ্লবের লাইন...আরে কৃষিই তো পালটে যাচ্ছিল গোটা দেশে...বামফ্রন্ট আসার পর তো আরও পালটে যাচ্ছিল সব... আমি একা লড়তাম কারে নিয়া?

আমার কফির কাপ প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। লক্ষ করলাম উনি তখনও দুয়েক চুমুকের বেশি খাননি। ওঁকে উত্তেজিত লাগছিল...গায়ের চাদর খুলে ফেললেন...কাঁধেরঝোলাটা একবার মেঝে থেকে তুলে নিয়ে ফের রেখে দিলেন...আজ এত বছরের পর, সত্যি-মিথ্যার কুহকে পুরো আন্দোলনের ইতিহাস আর সেই শিকলছেঁড়া মানুষদের কাহিনি একটু একটু করে মুছে গেছে...এইমুহূর্তে পুরো ক্যাফেতে যেকটা লোক, তারা কেউই কি জানে আমি কার সঙ্গে কথা বলছি? এক জীবন্ত কিংবদন্তীর মুখোমুখি বসে রয়েছি আমি, যার কফির কাপে ঠাণ্ডা হচ্ছে ফেনায়িত তরল। জানি, উনি অস্বস্তিবোধ করছেন এই দামি ক্যাফেটেরিয়ায়। কিন্তু এই সিসিডিটা আমার বাড়ির খুব কাছে হয়। বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে আমাদের বাড়ি। এখান থেকে ওয়াকিং ডিস্ট্যান্স। এমএ পাশ করার পর যেদিন থেকে এই বিষয় নিয়ে কাজ করার কথা ভেবেছি, আমার স্বপ্ন ছিল এই লোকটাকে মিট করব। ওঁর ইন্টারভিউ নেব। এখন কাচের টেবিলের উপর আমার মোবাইলের রেকর্ডার অন করাই রয়েছে। উনি যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছেন। আমার জন্ম ১৯৯৫-তে। আমরা সেই প্রজন্মের সন্তান, যারা বিশ্বাস করে এসেছে 'নেতি'-তে। চূড়ান্ত ডিসটোপিয়ায়। যখন গোটা দুনিয়া জুড়ে 'হ্যাঁ' কথাটার মানেই সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বাবামায়ের জন্যই আমি হয়তো খানিকটা অন্যভাবে বড়ো হতে পেরেছি। অন্যভাবে চিন্তা করতে শিখেছি। আমার গাইডও হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চিত বিশ্বাস করবে না আমার সঙ্গে জঙ্গল সাঁওতালের আজ সাক্ষাৎ হয়েছিল। এতক্ষণ কথা হয়েছিল। কিন্তু এই ইন্টারভিউয়ের কথা আমি কাউকে কোনোদিনও জানাব না। এটা শুধু ধরা থাকবে আমার রেকর্ডারে। ছোটোবেলা থেকে বাবার কাছে এই অসম্ভব রূপকথার নায়কের মতো লোকটার গল্প শুনে এসেছি। বাবা বলত, চারু-কানু-সৌরেন-সুশীতল-সরোজ-সুনীতি-অসীম এরা সকলেই ছিলেন উচ্চবর্ণের লোকাসান্যাল, রায়চৌধুরী, চ্যাটার্জি, দত্ত ঠিক সেই অতীতের অবিভক্ত ও ভেঙে-যাওয়া পার্টির দাশগুপ্ত-বসু-মুখর্জি-ভট্টাচার্যেরই উত্তরসূরি এঁরা। একমাত্র ব্যতিক্রম এই জঙ্গল সাঁওতাল-খোকন মজুমদার, যিনি আসলে ছিলেন মুসলমান, প্রকৃত নাম শামসুদ্দিন আহমেদ, এইসব মাটির সঙ্গে মিশে থাকা লোকেরা, যাঁরা এক অর্থে নকশালবাড়ির অন্যতম স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও আগাগোড়াই অবহেলিত থেকে গিয়েছিলেন। প্রথাগত অর্থে মার্কসবাদী শিক্ষায় এরা দড় ছিলেন না, জঙ্গলের তো স্কুলের শিক্ষাও সেই অর্থে সম্পূর্ণ হয়নি। ফলত, এমএলপার্টিতেও ওই একই শিক্ষিত বর্ণকৌলীণ্য বজায় ছিল এবং শিক্ষিত মুষ্টিমেয় নেতার নিঃসপত্ন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এখানেও। সেই অধিকারীভেদ এবং সামন্তবাদী মানসিকতা এতটাই দৃঢ়মূল ছিল যে একটা সময়ের পর জঙ্গলের মতো তীব্র স্বাধীনচেতা মানুষ এঁদের নিগড়ে থেকে হাঁসফাঁস করছিলেন। অবশেষে বেরিয়ে এসেছিলেন। আমার নিজস্ব অনুমানে এটাই ছিল জঙ্গল সাঁওতালের পার্টিত্যাগের মৌলিক কারণ। আর একবার মূল পার্টির থেকে সরে আসার পর প্রথাগত ভঙ্গিতেই পার্টিনেতৃত্ব তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা আর অপপ্রচার শুরু করে। সেটাই জঙ্গলের মোহভঙ্গের আরও একটা বড়ো কারণ। আমি এগুলো বরাবর টের পেতাম, যখন থেকে ওঁর সম্পর্কে জেনেছি। আজ এই সামান্য আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে সেই ভাবনা আরও পোক্ত হল। একচুমুকে পুরো কাপের কফি শেষ করে নিয়ে জঙ্গল বললেন্ম

—পেচ্ছাপ করব। বাথরুমটা কোথায়?

—ওইদিকে। আমি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিই...

—আমি কাউরে কুনো দিন মানি নাই, জানিস তো?

—জানি...আপনার পরিবারের কথাও জানতে চাই আমি...

—প্রথম বউটো মরে গেল না খ্যায়া। আমি ফিরেও তাকাই নাই রে বিটি...আমার অত সময় ছিল না... যখন দিনের পর দিন জেলে ছিলাম, বউবাচ্চা কী খাইল না খাইল ফিরাও দেখি নাই...আর আমারে কয় বিপথগামী...দালাল!

—আপনার ছেলে উপেন কিস্কুর সঙ্গে আমি মিট করেছি...

—হ্যাঁ উয়ো কানুবাবুর পার্টি করে...আমার পথেই চলে...

—আর আপনার দুই বোন। তাদেরও সঙ্গে কথা হয়েছে আমার... আপনাকে এখনও ওই এলাকায় ভগবান বলে মনে করে লোকে, জঙ্গলদা...।

'দাদা' সম্বোধন কীভাবে বেরিয়ে এল, আমি সত্যি জানি না। অবচেতনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ আমরা পুরোটা বুঝতেও পারি না। বললাম—যান। টয়লেট থেকে আসুন। উনি উঠলেন। বিশাল শরীরটা যেন কাঁপছে...ফাইবারের দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকলেন উনি...আমার অদ্ভুত লাগছিল। যেন আজকের সাক্ষাৎকার সত্যি নয়। পুরোটাই স্বপ্ন। আর স্বপ্ন জিনিসটাকে আমি বাস্তবের চেয়ে খুব একটা আলাদা করে দেখিনি কোনোদিন। বাবার লাইব্রেরিতে যখন সত্তরের বিপুল বইপত্রিকার আর্কাইভ খুঁজে পেতাম আর গোগ্রাসে সেগুলো পড়তাম, যেদিন পোকায়কাটা পুরোনো প্যালেটে জঙ্গল সাঁওতালের অস্পষ্ট ধূসর ছবি দেখতাম, আমার মনে হত, এটাও তো একটা অধরা স্বপ্ন। আমাদের ইতিহাস যাকে সত্যির সমান্তরালে রেখে দিয়েছে অথচ পুরোটা সত্যি হতে দেয়নি। আর সেই ছেঁড়া, বিক্ষিপ্ত, অসমান স্বপ্নগুলোকে রিফু করা, তাদের ফাটলগুলোকে সেলাই করার দায় ইতিহাসকারের, যে দায়বোধ থেকে আজ এইখানে এসেছি আমি। একটা তামাদি-হয়ে-যাওয়া লোক, ইতিহাস যাকে মার্জিনে ঠেলে দিয়েছে, যার অস্তিত্ব ইরেজার দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে, তাকে খুঁজে বের করার দুরূহ কাজে চ্যালেঞ্জ যেরকম

রয়েছে, তেমনই রয়েছে এক অসম্ভাব্যতা, এক চূড়ান্ত অসম্ভবের পিছনে ছুটে বেড়ানোর দুঃসহ তাগিদ।

উনি টেবিলে এসে বসলেন। আমি রেকর্ডার অফ করলাম।

—বিশ্বনাথ মুখার্জিরে আমি ধুয়ে দেছলাম, জানো তো?

—জানি। ১৯৫৯ সালের কৃষক সভার মিটিং।

—বেনামি জমি দখলের লড়াই চলছিল। পার্টির বাবুরা বুঝাতে চায় আইনের চৌহদ্দিতে থেক্যে লড়তি হবে...

—আপনি সরাসরি বিশ্বনাথবাবুকে যা-তা বললেন?

—আমি তো ভদ্দরলোক নই গো। প্রথম থেকেই উরা একটা দালাল পার্টি...

—আপনাকে নিয়ে অনেক অনেক মিথ জঙ্গলদা...।

—হ্যাঁ তুমারে তো কইলাম, আমি নিজেই ভগমান...

—আমার কাজের একটা আস্ত চ্যাপ্টার থাকছে নর্থ বেঙ্গলে আপনাকে নিয়ে যে মিথগুলো এখনও চালু রয়েছে, সেগুলোর উপর!

—কী কাজ করো তুমি? শিশুর সারল্যে হেসে জিগ্যেস করেন উনি...

—এমফিল করছি সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে...

—আমি ভাবতেছিলাম তুমি রিপোর্টার। একসময় শয়ে শয়ে রিপোর্টার হাতিঘিষা যেত আমার লগে কথা কইতে। আমি যখন জেল থিক্যা বেরোলাম...

—জানি। তাদের অধিকাংশ রিপোর্ট আমি পড়েছি...

—তুমি খুব ভালো মেয়ে। সাবধানে থেকো...

—আপনিও ভালো থাকবেন। এখান থেকে কোথায় যাবেন আপনি?

—যোধপুর পার্কের সেই বস্তিটা আর নাই, তাই না?

—না। নেই। কার সঙ্গে দেখা করবেন আপনি?

—আমার নেপালে যখন সংসার ছিল, তখনকার কিছু লোকরে খুঁজি আমি...জানি না উয়ারা এখন কোথায়!

—ইসলামপুরের পাটাগাড়ায় আপনি যখন গ্রেফতার হলেন ১৯৭০ সালে, তখন এক নেপালি আইবি আপনাকে শনাক্ত করেছিল, তাই না?

—হ্যাঁ। আমি তো নেপালে থাকতাম একসময়...

—আচ্ছা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং-এর সঙ্গে কি সত্যিই দেখা হয়েছিল আপনার?

—দূর! চরণ সিং তিহার জেলে আসেই নাই...আমাদের সঙ্গে দেখা করে বিহারের সত্যনারায়ণ সিং। আমাদের সাতজনারে ডাকছিল দিল্লি থিক্যে, সাতাত্তরে জনতা সরকার আসার পর!

—আপনাকে নাকি মুচলেকা দিতে বলেছিল?

মুহূর্তে দু-চোখ জ্বলে ওঠে জঙ্গলের। চোয়াল শক্ত হয়ে যায় ওঁর!

—মুচলেকা আমি দিই নাই। মুচলেকা আমি দিব নাই। কুনোদিনও না...

উঠে পড়ি। ওঁকে নিয়ে ক্যাফের দরজা অব্দি হেঁটে আসি। উনি ধীর পায়ে সিঁড়িতে নামেন। আমি উপরের সিঁড়িতে রাস্তায় নেমে হঠাৎ মুখ তুলে উপরে তাকিয়ে দেখলেন আমায়। আকস্মিকভাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে অভিবাদন জানালেন আমায়। আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে এই অভিবাদন তো সংগ্রামী যোদ্ধারা জানায় তাদের কমরেডদের। আমি তো কোনো লড়াকু মানুষই নই। তবে কি আমার মধ্যে অন্য কাউকে টের পেলেন তিনি? কী করে সম্ভব? আমি তো সামান্য এক গাইডের অন্যায়েরই প্রতিবিধান করতে পারছি না বিগত ছ'সাত মাস যাবৎ।

একসময় বাংলা-বিহার জুড়ে জঙ্গল সাঁওতাল ছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক। জামশেদপুরের গাঁওবুড়োরা রটিয়ে দিয়েছিল, তারা প্রায়ই জঙ্গলকে দেখতে পায়। কীভাবে? জঙ্গল না কি 'উরাকল'-এ চড়ে নকশালবাড়ি থেকে সাঁওতাল পরগণায় এসে সকলকে জোতদারের জমি দখল করার ডাক দিয়ে গেছে। ফেরার সময় বলে গেছে, আমি আবার আসব। তৈরি থেকো কমরেড। কীরকম দেখতে তাকে? বিরাট লম্বা। বিশাল চেহারা। বড়ো বড়ো চুলদাড়ি তার। অনেকেই নাকি দেখেছে তাকে। আমি উত্তরবঙ্গের গ্রামে গিয়ে শুনেছি জঙ্গল সাঁওতাল না কি এক বিশাল ধুমসো বাঘের পিঠে বসে জোতদার আর পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করত। বাঘের দাপটে শত্রুরা সকলেই পালাত। আর জঙ্গলের হাতে ছিল এমন এক অস্ত্র, যা দিয়ে অনায়াসেই একসঙ্গে পাঁচশো পুলিশ ঘায়েল করা যায়! ওই তো! বাঘের পিঠে চেপেই তিনি এখন ক্রস করছেন লোকারণ্য গোলপার্ক। রাস্তা পেরিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ফুটপাথ বেয়ে একলা হেঁটে চলেছেন তিনি। হালকা, দুলকি চালে। মহানগরের উপর ঘন রাত্রি নেমে এসেছে। আশেপাশের কোনো লোক তাঁকে দেখতে না পেলেও আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ পিছন থেকে একটা ডাক শুনলাম, ম্যাডাম, এই কাগজটা আপনি ফেলে গিয়েছেন। চমকে পিছন ফিরে তাকাই। একটা ঝকঝকে 'লাল লিফলেট'। যেন সদ্য প্রেস থেকে ছাপা। উপরে বোল্ড টাইপে আহ্বান—তরাইয়ের কৃষকের পাশে দাঁড়ান। নীচে জঙ্গল সাঁওতালের স্বাক্ষর। আর, উপরের ফাঁকা অংশে কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা—'তৃষাকে, জঙ্গল সাঁওতাল'। কখন ব্যাগ থেকে এই অরিজিনাল লিফলেটের কপি বের করলেন উনি? কখনই বা সেটা চেয়ারের উপর ফেলে গিয়েছেন? আমার কাছে যে পুরোনো লিফলেটটা আছে, সেটা কালো হয়ে গেছে। মুচমুচে। যেকোনো দিন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু এই লিফলেটটা একদম তাজা। যেন আজই প্রেস থেকে হাতে এসেছে...

আরেকবার দূর রাস্তার দিকে তাকালাম। জঙ্গল সাঁওতাল আঙ্ম মার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছেন। কোথাও তাঁর কোনো চিহ্ন নেই। আদৌ কি তাঁর কোনো অস্তিত্ব ছিল এতক্ষণ? কার সঙ্গে বসে কথা বলছিলাম আমি? এই উজ্জ্বল সিসিডিতে? এই সুবেশ, উদাসীন, ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট লোকজনের মাঝে?

আমি রাস্তায় নামি। একটা সিগারেট ধরাই। বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করি...প্রবীর স্যারের কাছেই কাজ করব, নাকি গাইড বদলাব, ভাবতে থাকি...একটু শীত করে আমার...অদ্ভুত, এলোমেলো হাওয়া দেয়!

এই লেখায় প্রকাশিত সমস্ত মতামত লেখকের নিজস্ব। অন্য কারও কোনো দায় নেই।

বন ভ্রমণের ভ্রম কাহিনি

পরীক্ষিৎ মান্না

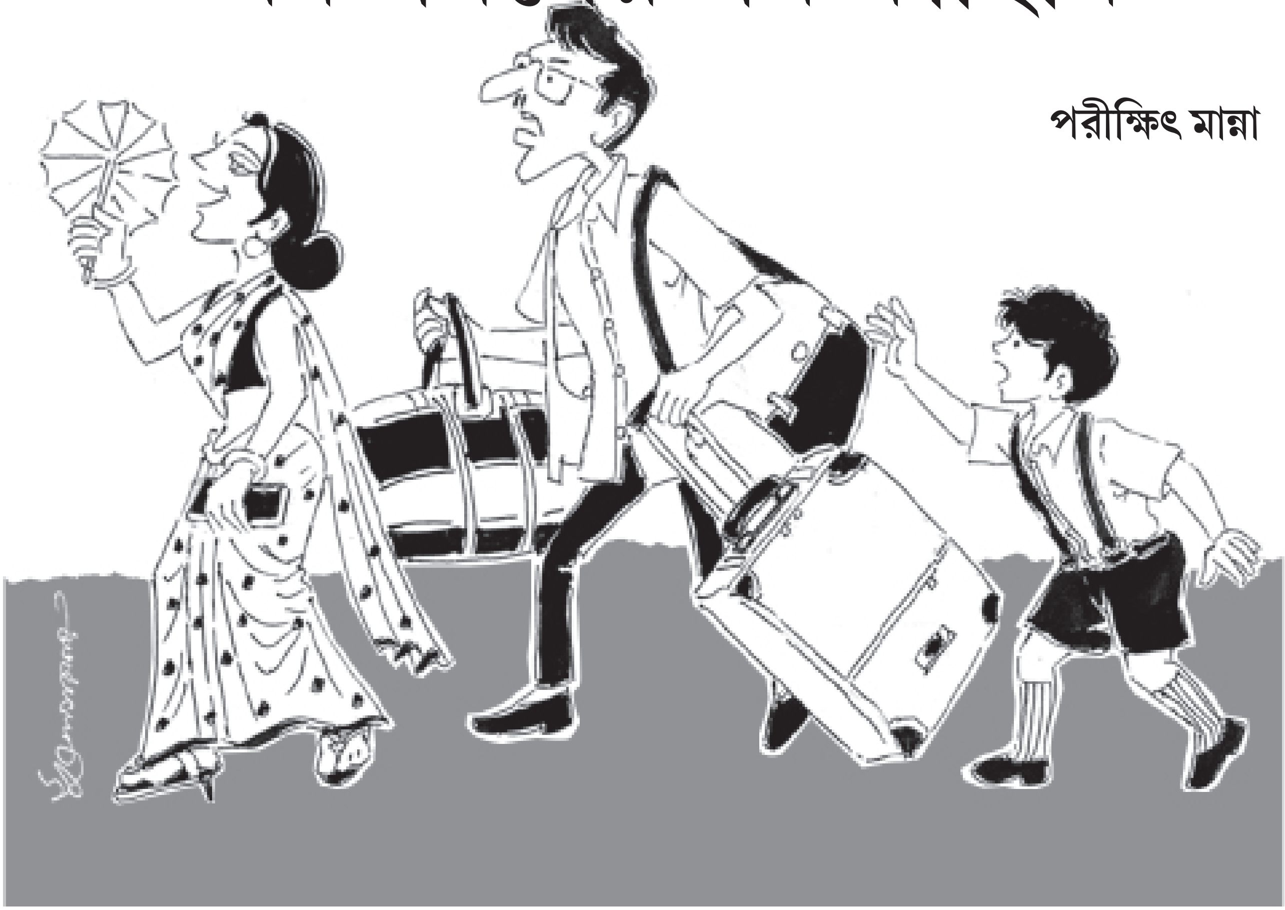

অনেক ঝক্কি ঝামেলা সামলে, অফিস কোলিগদের টা টা বাই বাই করে, শিয়ালদায় ভিড় ট্রেনে চাপতেই মাথাটা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে লাগল। পাশে বসা পরিচিত যুবককে সে কথা বলতেই, সে ব্যাঙ্গমার মতো বঙ্গীয় সুরে বিলি কাটল—ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টিক্লক? সেই তামাশা আমার কানে আমাশার মতো বাজল। অ্যান্টিক্লক শুনে মনে পড়ল, ওদের আন্টি, মানে আমার মিসেস, কক্ অর্থাৎ মোরগের মাংস কিনে নিয়ে যেতে বলেছিল। যাক্ গে যাক্। ঠাট্টার তেমন ঠাট্ বাট্ না থাকলেও, আমার মতো ভুলোমনের মানুষকে মাঝে মধ্যে মনে করিয়ে দেয় কাজের কথা। আর তার সঙ্গে ঠাটিয়ে... আব্বুলিস !

এসব কথা জনসমক্ষে বলতে নেই। বনমোরগ জবাই হলেও, বনমুরগির বিক্ষোভ এই বিদেহী আত্মা সামলাতে পারবে না।

তাই, নেমে পড়লুম ভিড় ঠেলে। মাথাঘোরাকে অগ্রাহ্য করেই।

বনমোরগের ঝুঁটি, না না, টুঁটি চেপে কোঁকর কো এক কিলে ভুলিয়ে দিল কেষ্ট। কেষ্টর দোকান থেকেই মাংস কিনি। বাবা চিনিয়েছিলেন এই দোকান। পরম্পরাকে অক্ষত রেখে মাংসভর্তি কালো পলিথিনখানা সন্তর্পণে নাইলন থলেয় ভরে একটা ই-রিক্সা ধরলুম। হাসিমুখে ঘাম মুছতে মুছতে থলেখানা গিন্নির হাতে দিতেই উনি তো রেগে লাল ! এখন আমি মাংস রাঁধতে বসব? তোমার আক্কেল কবে হবে? ভুলেই গিয়েছিলুম, কাল আমাদের বেড়াতে যাওয়ার কথাটা। লাগেজ গোছানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ডিউটির কারণে আজ যে মাংস বন্ধ, তা গিন্নি আমায় বলেছিলেন বটে, কাজের ঠেলায় এক্কেবারে ভুলেছি। বিড়বিড় করে বললুম, তুমিই তো আনতে বলেছিলে। আগুনে ঘি পড়ল যেন !

সে তো গত শনিবার বলেছিলুম !

অতএব, মাংস রান্নার গুরুদায়িত্বটুকুও পড়ল আমার কাঁধে। বাথরুমে ঢুকে, গায়ে জল ঢালতে ঢালতে ঠিক করে নিলুম, টকদই মাখিয়ে মাংস মেরিনেটে রেখে ট্রলি নামাব আলমারির মাথা থেকে। তারপর প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড়, অন্যান্য জিনিস বের করব।

এর মধ্যেই মোবাইল ফোন বেজে উঠল। বাথরুম থেকে তড়িঘড়ি বাইরে এসে ফোন ধরলুম বন্ধুর। আমার সফরসঙ্গী।

আমাদের দুটো টিকিট ওয়েটিং থেকে আরএসি হয়েছে। চিন্তা কমল খানিকটা। চলে আয়, একটু আনন্দ করি।

আমি, ‘আচ্ছা’ বলে ফোন রাখতেই ছেলে চিৎকার করে উঠল, বাবা তোমার গামছা কোথায়? আমি তখন লজ্জায় ঘামছি আবার। গামছা না জড়িয়েই ফোন ধরতে বাথরুম থেকে বেরিয়েছি! এক ছুটে আবার বাথরুমে প্রবেশ করলুম। বাইরে তখন হুলুস্থুল কাণ্ড। ডাইনিং স্পেস জলে ভরাল কে? আমি কি ন্যাতা বালতি নিয়ে সারাদিন কাটাব? বের হোক তোর বাবা। দেখাচ্ছি।

কে জানে কী দেখাবে! অঙ্গহানির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ যাত্রা অতটা হবে না বোধহয়। কাল যাওয়া আছে যে! শুধুই ‘দেখাবে’। ও সব অভ্যেস আছে।

কমোডে বসে ভাবছি কাল কোথায় যেন যাচ্ছি আমরা? পাহাড়ে না সাগরে? না কি জঙ্গলে? ভুলো মন আমার। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেই হত। গিন্নিকে জিজ্ঞেস করার মতো পরিস্থিতি নেই। জোলো করে ফেলেছি শনিবাসরীয় সন্ধ্যে।

যাক্! চা দিয়েছে। তাহলে রাগটা নেমে গেছে মনে হয়। মাথা মুছে, গামছাটাকে গলায় জড়িয়ে জিগালুম, তোমাদের জামাকাপড়গুলো দাও। পুরে ফেলি। উদ্দেশ্য অন্য। গরম পোশাক থাকলে বুঝে যাব, পাহাড়। আর সাধারণ সুতিবস্ত্র বুঝিয়ে দেবে সাগর।

তুমি যে কতটা কী পুরতে পারবে তা আমার এই কুড়িবছরে জানা হয়ে গেছে। আমার আর ছেলের লাগেজ আমিই গুছোব। তুমি দয়া করে নিজেরটা গুছিও, তাহলেই চলবে। বললেন আমার সহধর্মিনী।

বেশ। তাহলে তো অনেকটাই হালকা হলুম। মাংসটাকে মেরিনেটের জন্য রেডি করে, জামাকাপড় বের করার জন্য ফ্রিজ খুললুম। ছেলে এবারে চিৎকার করল না। টুক করে ওর মাকে লাগিয়ে এল, বাবা আলমারিতে মাংসের বাটি রেখেছে মেরিনেটের জন্য!

ওদিকে আবার ফোন বাজছে। বন্ধু কলিং। শনিবাসরীয় আনন্দের লহরী চাপা পড়ল গিন্নির গোঙানিতে।

এই ভুলো মালটাকে নিয়ে যে আর পারি না—ভগবান!

মাল! আমি মাল!

হ্যাঁ! ভুষিমাল! আলমারিতে মাংস মেরিনেট করতে দিয়েছ? আর ফ্রিজ খুলে জামাকাপড় খুঁজছ? মাল ছাড়া আর কী বলব তোমায়?

আমার তখন মাল খাওয়া লাটে। নিজের গোটানো লাটাইয়ের সব সুতোয় জট পাকিয়ে একাকার। আবার বন্ধুর ফোন। ধরিনি। গিন্নি ধরেছে। এবং যথারীতি আমার গুণকীর্তন বর্ণিত হচ্ছে। আমি রান্নাঘরে বনমোরগের সঙ্গে সহবাস করছি সিক্ত বদনে।

মাংসটা কষা ভালোই হয়েছে মনে হয়। সবাই বেশ মন দিয়ে খাচ্ছে। পরিবেশ অনুকূল ভেবে ছেলেকে বললুম, লাগেজে জ্যাকেট নিয়েছিস? ছেলে দাঁতের ফাঁক থেকে মাংসের কুচি বের করতে করতে বলল, এই জৈষ্ঠ্যে জঙ্গলে জ্যাকেট? আমি কি শিকার করতে যাচ্ছি? নাকি ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার?

এতক্ষণে সব মনে পড়ল আমার। বনদপ্তরের অফিসে গিয়ে হলংয়ের কটেজ বুক তো আমিই করেছিলুম। রিসেপশনিস্ট মহিলাটি বাঘের থাবার মতো হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। তারপর বুকিং রেজিস্টারের তারিখ খোপে সে কী কাটাকুটি খেলা! বুকিংয়ের তারিখ ২৩ থেকে ২৬ মার্চ লেখানোর বদলে ভুল করে ২৩ থেকে ২৬ মে লিখিয়ে দিয়েছিলুম। পরে আর শোধরানো হয়নি। সে কী আর আজকের ঘটনা! জানুয়ারির ঠান্ডায় তখন সমস্ত ঘিলু জমাট বেঁধে যাচ্ছিল। বন্ধুকে কোনোরকমে ম্যানেজ করলেও, বাড়ির লোককে....থাক সে কথা। মনে পড়লেই কেমন হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র ওইটুকু ভুলের খেসারত দিতে কনফার্মড টিকিট ক্যানসেল করে ওয়েটিং টিকিট কেনা। কত রাত কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসেছি বিছানায় ঐ দুঃস্বপ্ন দেখে। ময়াল সাপের মাথায় আমার পরিবারের মুখমণ্ডল। আর আমি একটা পেল্লায় বটের ঝুরি ধরে দুলছি। নিচে আদিগন্ত সবুজ। সবকটা কাঁটাগাছ। সবুজের ফাঁক থেকে কোঁকর কোঁ শব্দে আমাকে ভ্যাঙাচ্ছে বনমোরগটা। আমি চোখ বুজে একাগ্র চিত্তে কেষ্টকে স্মরণ করছি। না না দোকানী কেষ্ট নয়, ইনি আমার ইষ্টদেবতা।

সকাল থেকে তাড়াহুড়ো। ট্রলির চাকা ভাঙা। আগেই খেয়াল করা উচিৎ ছিল। নিজের পোশাকগুলো গুছিয়ে নাইলনের থলেতে ভরে নিয়েছি। জুতোর র‍্যাক থেকে ময়লা স্নিকার্স নামিয়ে সাবান জল আর ব্রাশ দিয়ে ভালো করে পরিস্কার করে বারান্দায় শুকোতে দিয়েছি। কিছু জিনিসপত্র কেনা বাকি। টুথপেস্ট, সাবান, বিস্কুট, মুড়ি, চানাচুর, বাদাম এবং অতি অবশ্যই মোমবাতি। ওখানে খুব লোডশেডিং হয় যে! মিসেসের ব্যাগ গোছানোর ইভেন্টে ছেলের সহায়তা সাময়িক গতি বাড়ালেও, লাঞ্চে আজ ভাতে ভাত।

একটু চায়ের আশায় গোলফিশের দোকানে গেলুম। সুকুমারদা এবং অপুদা অনেক হিন্ট দিয়েও হলং নামটা মনে করাতে পারল না আমায়। আমার ভুলোমনা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি কী অবলীলায় ভাইরাল হচ্ছে পরিবেশে! জিনিস কিনে ঘরে এলুম। এবার তৈরি হতে হবে জলদি। লাঞ্চ সেরেই রওনা দেব শিয়ালদা স্টেশন। চান করতে গিয়ে মনে পড়ল সকালে দাঁত মাজতে ভুলে গিয়েছি। স্যাট্ করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে (এবারে গামছা জড়াতে ভুলিনি কিন্তু) ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে মেজে ফেললুম বাসি দাঁত। নিজেকে কেমন মানুষ মানুষ লাগছে। বাঘ তো আর দাঁত মাজে না। অথচ কী অসীম শক্তি বাঘের দাঁতে! অবাক লাগে। আমরা রোজ দাঁত মেজেও আখ আর পাঁঠা ছাড়া তেমন কিছুই চিবোতে পারি না। আমাদের মধ্যে যারা প্রভাবশালী, তারা অবশ্য চিবোন—অন্যের মাথা। সাবান, শ্যাম্পু সহযোগে চান সেরে বেরিয়ে এলুম। আজ বাথরুম সংগীত স্থগিত। হঠাৎ ব্রাশের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল, এটা দিয়েই তো সকালে জুতো পরিস্কার করেছি! সব্বোনাশ! কেউ কিছু বোঝার আগে বারকয়েক কুলকুচি করলুম ভালো করে সাবান দাঁতে ঘষে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম না বোঝার ঔদ্ধত্য আমার ভুলোমনকে চোখ মারল যেন!

ভাতে ভাত খেয়ে লেগে পড়েছি ওলার খোঁজে। একশো টাকার

মান্থলিতে যে শিয়ালদায় মাসে ছাব্বিশ দিন যাই, আসি, সেই শিয়ালদা হঠাৎ ওলার এক ধমকে সাড়ে চারশো! বেড়াতে যাচ্ছি বলে কথা। গিন্নি আমার নাইলন ব্যাগভর্তি জামাকাপড়, তোয়ালে, অন্তর্বাস দেখে তো ওলা ড্রাইভারের সামনেই চন্ডীরূপে অবতীর্ণ হলেন। কী করব! রুক স্যাক ছিল। নিতে ভুলে গেছি। অগত্যা শিয়ালদা থেকে নতুন রুক স্যাক বারোশো টাকায়। নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল পরের মাসে বনমোরগহীন চারটে উইকএন্ড কাটাতে হবে।

হার্টবিটের মতো ট্রেন চলেছে ধস্ ধস্ ধস্ ধস্। আমি একমনে মুখস্থ করছি হলং, হলং, হলং। এতক্ষণে ভুলে গেছি গন্তব্য স্টেশনের নামটা। ডিনারের পরে বন্ধু পত্নীর সঙ্গে গপ্পে মশগুল আমার অর্ধাঙ্গিনী। ছেলে মগ্ন মুঠোফোনে। কান বন্ধ। বন্ধু আপার টায়ারে নাক ডাকাতে শুরু করেছে। আমি খরচের হিসেব লিখছি। কফি আর চা বিকেল থেকে ঠিক কত কাপ হয়েছে ভুলে গেছি। লজ্জার বিষয়। অতএব, গাঁটগচ্চা আমারই। এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুম এল। সাথে স্বপ্ন। বটগাছটা আছে। সাপটাও। তবে কাঁটাগাছগুলোর ডগায় জংলী ফুল ফুটেছে এবারে। সেই সমস্ত ফুলের গন্ধ বড়ো মায়াবী। বিরিয়ানির মতো। সাইডডিসে যেন বনমোরগের ঝোল। আমি ঝুলছি এখনও। দুলছিও। কারা যেন কোরাস সুরে বলে চলেছে কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ! আমি ঘামছি। ঘামগুলো আমার ভ্রু টপকে চোখে মিশছে। স্বপ্ন ঝাপসা হচ্ছে। ক্যাঁঅ্যাঁঅ্যাঁঅ্যাঁচ্!!

একটা স্টেশন। নামটা দেখতে পাচ্ছি না মিডল টায়ার থেকে। এই সব স্টেশনে গাড়ি মাঝরাতেই আসে। শূন্য প্ল্যাটফর্মের মন এক মিনিটের জন্য ভারাক্রান্ত করে দিয়ে চলে যায়। ঝিমিয়ে পড়া গাছে বাসা বাঁধা ঘুমন্ত পাখির দল হঠাৎ জেগে ওঠে আমার মতো। গার্ড সাহেবের সঙ্গে কেবল প্ল্যাটফর্মে রাতজাগা কোনো রেলওয়ে কর্মীর রুমালের মতো পতাকার রং প্রদর্শনীর খেলা চলে। সেই মুহূর্তের রঙিন মিলন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে প্রকৃতির নিশাচরেরা। শূন্য বেঞ্চিতে ঝোলা নিয়ে বসে থাকা পাগলীটা আর বাসিমুখের পাখির দল। এক গাড়ি ভর্তি জৈবিক চেতনা দেখতে পায় না সেই আঁধারে রঙের দোলন। সিটির কর্কশ শব্দে পাশ ফিরে শোয় ভ্রমণপিপাসু পৃথিবীর মন। গন্তব্যটুকুই যার কাছে প্রাধান্য পায় কেবল। নিশুতির বেসাতিতে ডুবতে ডুবতে হিসাবের ডায়েরির লেখা উবে যায়। পড়ে থাকে মোবাইল। মোবাইলের কিপ নোটস-এ আঙুল রাখতে শুরু করে বিগত হিসেব। জানলারা ফর্সা হয়। হকারের আওয়াজে ঘোর কাটে। বেডটি হাতে সামনে দাঁড়ায় আমার শ্রীমতি। চোখে ওর তৃষ্ণা। জ্যোৎস্না রাতে সবাই মিলে বনে যাওয়ার আদিম তৃষ্ণা। মুখে ওর সদ্য মাজা দাঁতের সুন্দর লবঙ্গের গন্ধ, পরনে ঢাকাই শাড়ি ভাবাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তাই কুর্তা প্লাজো। প্রিন্টটা অবশ্যই জংলা। চায়ের কাপে নারীর অভিমানের মতো পাতলা ছায়া ভাসছে। সে ছায়ার একটা সুন্দর নাম দিয়েছিলুম কুড়ি বছর আগে। এখন মনে পড়ছে না। আমি বটগাছ থেকে ওড়না ধরে নেমে এলুম ধরায়। কাঁটাগাছগুলো মিলিয়ে গিয়েছে। ফুলগুলো বিছিয়ে আছে। নতুন রুকস্যাক থেকে নতুন টুথ ব্রাশ বের করে পেস্ট লাগালুম। মানুষ যখন, দাঁতের যত্ন তো নিতেই হবে। না হলে যে সংরক্ষণের আওতায় পড়ব। আয়নায় নিজেকে দেখছি। মধ্যবয়সী এক ত্রুটিপূর্ণ অবয়ব। কুলকুচি সেরে সবে মাজতে যাব, ছেলে আমার ব্রাশ সমেত হাত চেপে ধরল!

পেস্ট নয়। ওটা হেয়ার কালার ডাই লাগিয়েছ! এই দেখো টিউবটা ভালো করে।

সমস্ত কামরার সহযাত্রীরা তখন হাসির খোরাক পেয়ে গেছে। আমার ভুল সত্যিই সার্থক আজ। ভাইরাল ভাইব্রেশনে রেলের চাকাও হাসতে হাসতে পৌঁছে গেল গন্তব্য স্টেশনে। আমি বাসিমুখেই লাগেজ নামাচ্ছি। হাসিমুখেও। এবারে কিছুটা হাঁটতে হবে। সে পথ সরল, না কি ঘূর্ণি? ক্লকওয়াইজ, না কি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? জানি না। পরোয়াও করি না। বুকের মধ্যে এখন উথাল পাথাল বনপলাশি বনমোরগের বিরহে কাতর।

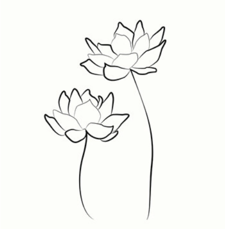

ক্ষণিকের ভুল

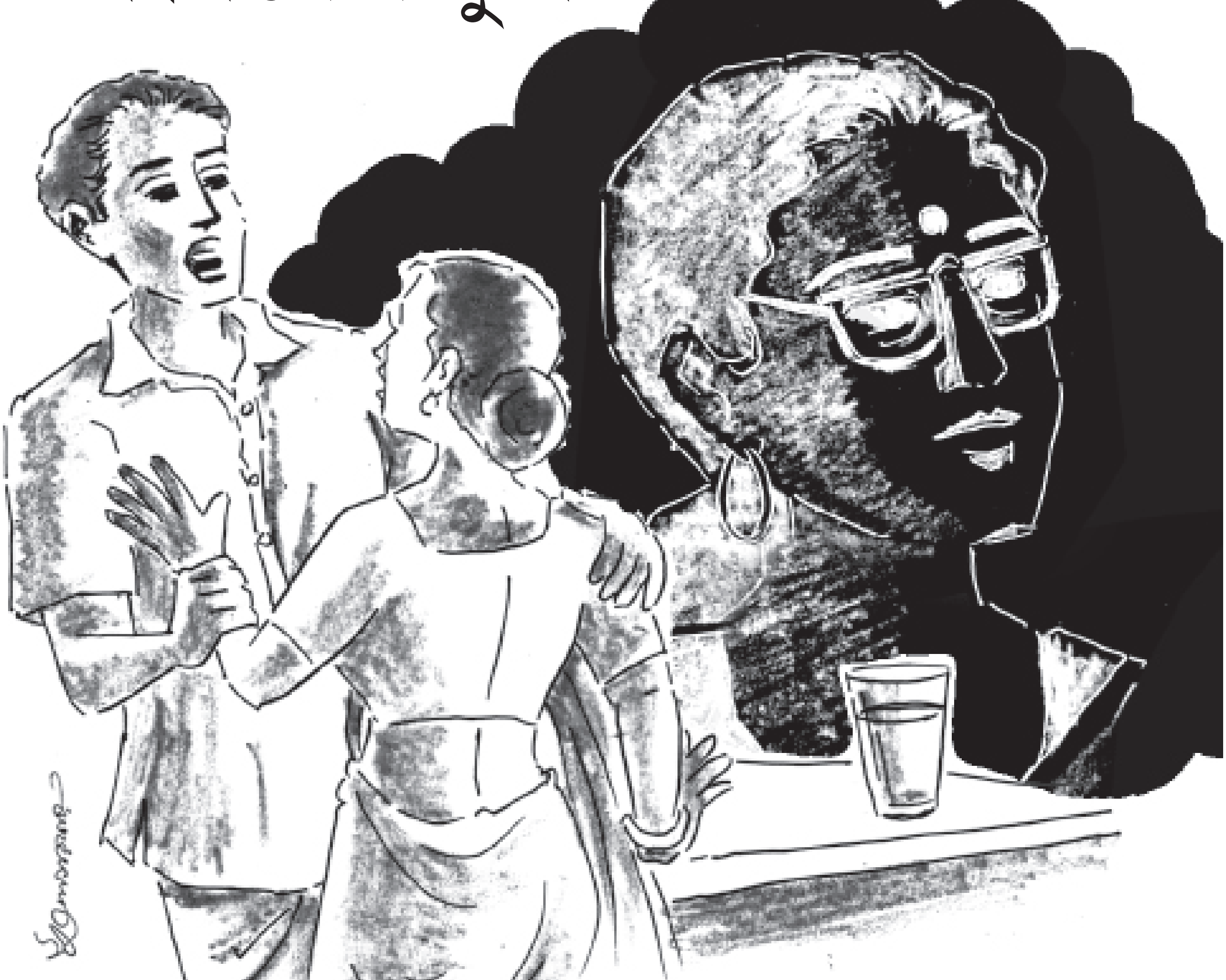

অর্পিতা ঘোষ পালিত

বাড়ির কাজের মেয়ে রমা যখন রোজ সকালে ঘর মোছে তখন অফিস যাওয়ার তাড়া থাকলেও আড়চোখে তাকিয়ে দ্যাখে সুভাষ, ওর মন চায় না দেখতে কিন্তু চোখ বারণ শোনে না। চল্লিশ পার হয়ে গ্যাছে অথচ দেখে মনে হয় না রমাকে; যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম। লহমায় যৌবনের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। দেখে এক-বছরের উপোষী দেহে বিদ্যুৎ খেলে যায় ছেচল্লিশের সুভাষের। বীথি একটু আগে অফিসে বেরিয়ে গ্যাছে, ওর অফিস অনেকটা দূরে আর ও ভীষণ পাংচুয়াল, সময়ের আগে পৌঁছবে। যাতে কেউ ওর কোনো ত্রুটি ধরতে না পারে। বীথি এক-বছর আগে জরায়ুর রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, অপারেশনের পরে এখন সুস্থ। তবু অন্য ঘরে শোয়, কাছে ঘেঁষতে দেয় না সুভাষকে। বলে... আর কিছুদিন যাক, তারপর। সুভাষের সবকিছু খেয়াল রাখে বীথি, যেমন ও ভালো স্ত্রী তেমনই প্রিয়

বান্ধবী। ওদের একমাত্র ছেলে ব্যাঙ্গালুরুতে পড়াশোনা করছে। সচ্ছল সুখী পরিবার। তবু কেন যে রমাকে দেখে সুভাষের শরীরের মধ্যে এরকম হয় ও বুঝতে পারে না।

রমার কাজ হয়ে গ্যাছে, বাইরে বেরোবার সময় বলল, দাদা আপনার টিফিনের ব্যাগ ডাইনিং টেবিলে, নিতে ভুলে যাবেন না যেন। নাহলে সন্ধ্যে বেলায় বৌদির কাছে বকা খাব আপনাকে মনে করিয়ে দিইনি বলে। আসছি ...বৌদি বাড়ি ফিরলে সন্ধ্যের পর আসব।

প্রয়োজনের থেকে বেশি কথা বলে রমা; তবে ভালো কাজ করে ও বিশ্বাসী। কাছের বস্তিতে থাকে দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে। স্বামী থেকেও নেই, রমাকে ছেলেমেয়ে উপহার দিয়ে অন্য জায়গায় সংসার করতে চলে গ্যাছে; তাও পনেরো ষোল বছর হয়ে গেল। এসব রমার মুখেই শোনা। তারপর থেকে সুভাষদের বাড়িতে রান্না ও বাড়ির সমস্ত কাজ করে।

অফিসের ব্যাগ নিয়ে বারান্দায় এসে ঘরে তালা দিতে যাবে, মনে পড়ল টিফিনের ব্যাগ নেওয়া হয়নি। ওর এই ভুলের জন্যই বীথির কাছে বকা খায় বেচারি রমা। আবার ঘরে ঢুকে ব্যাগটা নিয়ে বাড়ির বাইরের গেটে তালা দিয়ে বাইকে স্টার্ট দিলো সুভাষ। বীথি সন্ধ্যের সময় ফিরবে, ওর কাছে ডুপলিকেট চাবি আছে। সুভাষের ফিরতে রাত নটা হবে।

তালা খুলে ঘরে ঢুকে অফিসের ব্যাগটা সোফায় ছুঁড়ে দিলো বীথি। রোজ সকালে অফিসে যাওয়ার সময় একটা ব্যাগ নিয়ে যায়, ফেরার পথে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসে। ব্যাগটা রান্নাঘরের টেবিলে রেখে ব্যাগের ভেতর থেকে চিকেনের প্যাকেটটা বের করে রান্নাঘরের সিঙ্ককে রাখল; রমা এসে এর ব্যবস্থা করবে। হাত ধুয়ে ফ্রেশ হতে বাথরুমে ঢুকলো। হাউসকোট গায়ে জড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে যাওয়ার সময় কলিংবেলের আওয়াজ শুনে দরজা খুলল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রমা বলল, একটা সুখবর আছে গো বৌদি। সেই যে আমার পিঙ্কিকে একটা সম্বন্ধ দেখে গিয়েছিল না... তারপর আর কোনো খবর দেয়নি। আমি তো ভেবেছিলাম ওদের আমার মেয়েটোকে পছন্দ হয়নি। তা আজ হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ছেলের বাবা আর মামা এসে হাজির। আমি তখন স্নান সেরে সবে পুজোয় বসেছি, তখনও রান্না চাপাইনি। আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমার পল্টু গ্যারেজ থেকে খেতে আসতে আসতে বেলা তিনটে করে, তাই একটু দেরি করে রান্না চাপাই... কথা বলতে বলতে বীথিকে ডাইনিং টেবিলে চা এনে দিল রমা।

বীথি জানে রমা নিজের ঘরের সব কথা যতক্ষণ না ওর কাছে শেয়ার করছে ততক্ষণ ওর দম আটকে থাকে। বীথি কিছু বলে না, কেননা ও জানে রমা যতই বকবক করুক ওর কাজে গাফিলতি কখনো করে না।

রমা রান্নাঘরে নিজের কাজ করতে করতে বলতে লাগল, আজ কাজ করে বাড়ি ফেরার সময় বাজার থেকে একটু বেশি করেই বাটা মাছ নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই দুপুরে বাড়িতে আসা অতিথিকে বললাম... না বলে যখন এসেছেন, তখন যা রান্না হবে তাই দিয়ে দুটো ভাত না খাইয়ে ছাড়ব না। আমার কথা শুনে ছেলের বাবা বলল, আয়োজন করবেন বলেই তো না বলে চলে এলাম। এবার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি হোন। বাড়িতে একটা মেয়ে নেই, মেয়ের খুব প্রয়োজন। তাই ভাবছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ির লক্ষ্মীকে বাড়ি নিয়ে যাব। একেবারে বিয়ের জন্য দিন ঠিক করে যাবো বলে দুজনে এলাম... আমি আকাশ থেকে পড়লাম, কিছু না বলে সরাসরি বিয়ের কথা!

বীথি ছেলে যেন কি করে বলেছিলে?

রমা বাড়িতে তাঁত আছে, শাড়ির ব্যবসা করে বাবা আর ছেলে। ছোটো ছেলে পড়াশোনা করে। মোটামুটি সচ্ছল পরিবার। পিঙ্কিকে পছন্দ করে বিনা পণে যখন ওনার ছেলের বউ করতে রাজি হয়েছে তখন আমার তো কিছু বলার নেই। তবে আমি গরিব মানুষ, পণ না দিতে হলেও অন্যান্য আরও অনেক খরচ তো আছে।

—সরকার থেকে তো মেয়ের বিয়ের জন্য বেশ কিছু টাকা পাবে। তোমার দাদাকে বলব খোঁজ খবর নিতে। কোনো চিন্তা কোরোনা, আমরা তো আছি। মেয়েটা সুখে থাকলে শান্তি পাবে মনে।

—আমি জানি তো, আমার বৌদি যখন আছে তখন কোনো চিন্তা নেই। সেজন্যই তো আরও হ্যাঁ করে দিলাম... এই নেন মুড়ি মাখা খান, আমি এবার রান্না চাপাই।

পরের দিন সকালে বীথি অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর রমা রান্নাঘরে কাজ করছে। সুভাষের খাওয়া হয়ে গ্যাছে, এবার অফিসের জন্য তৈরি হবে। রান্নাঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় রমাকে বলল, তোমার মেয়ের বিয়ে তাহলে ঠিক হয়ে গেল। ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে তবে বিয়ে দিচ্ছ তো?

রমা আমার দিদি সম্বন্ধটা এনেছিল। দিদি বলেছে কর্মঠ ছেলে, ভালো পরিবার। আমরা গরিব মানুষ। মেয়ে যাতে দুটো খেয়ে পরে সুখে শান্তিতে থাকে এটুকু চাই, আর কিছু চাই না।

—আচ্ছা, আমি দেখছি কীভাবে টাকাটা তাড়াতাড়ি পাবে। চিন্তা কোরোনা, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।

—তা জানি দাদা, আপনি আর বৌদি সব সময় সব ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেন। আপনারা না থাকলে একা একা ছেলেমেয়ে দুটোকে কী করে বড়ো করতাম জানি না। তবে ছেলেটাকে আরও লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছে ছিল। ওর পেছনে সেরকম সময় দিতে পারিনি বলে পল্টু সঙ্গ দোষে বখে গেল। স্কুল পালিয়ে খেলা করত, বিড়ি ফুঁকত। তখনও তো আপনি আপনার বন্ধুর গ্যারেজে কাজ শেখার জন্য ওকে লাগিয়ে দিলেন। কাজ করে কিছু পয়সা হাতে পেয়ে পল্টু এখন ভালো হয়ে গ্যাছে। ও বলছে আরও কিছুদিন ভালো করে কাজ শিখে পয়সা জমিয়ে রোডের ধারে ফাঁকা জায়গা দেখে ছোট-মোটো একটা গ্যারেজ খুলবে।

—যাক পল্টুর তাহলে সুবুদ্ধি হয়েছে। আগে মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাক তারপর পল্টুর কথা ভাবা যাবে।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে বলল, আজ তোমার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে অফিসের দেরি হয়ে গেল।

—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন দাদা, আমার কাজ হয়ে গ্যাছে। আপনার টিফিনের ব্যাগ থাকল, আমি আসছি...

তার পরদিন সকালে রমা কাজে আসার পর বীথি বলল, আজ তোমার

দাদা অফিসে যাবে না, জ্বর জ্বর মতো হয়েছে। গা-হাতপা ম্যাজম্যাজ করছে। আমি তো আগে না বলে হঠাৎ করে ছুটি নিতে পারি না, তাই আমাকে অফিসে যেতেই হবে। তা নাহলে দেখাশোনা করার জন্য তোমার দাদার কাছে থাকতে পারতাম। তুমি ওর জন্য চিকেনস্টু আর পাতলা করে রুটি করে রাখো।

অফিসের জন্য তৈরি হয়ে বীথি ঘরে ঢুকে সুভাষের গায়ের তাপমাত্রা মাপল। জ্বর সেরকম নেই। একটা প্যারাসিটামল নিয়ে বলল, নাও এটা খাও। আমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, সন্ধ্যে বেলায় ডাক্তার টি. রায়ের কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। পাশেই চেম্বার বলে তুমি যেন একা যেওনা। আমি ফোন করে জেনেছি উনি নেই, সন্ধ্যায় ফিরবেন। সবে তো একটু গা গরম হয়েছে, আপাতত এটা খেতে বললেন।

অনেকদিন পর বীথির স্পর্শে থরথর করে কেঁপে উঠল সুভাষের শরীর, হাতের প্রবল টানে ভারসাম্য রাখতে না পেরে বুকে পড়ল বীথি।

—কী হচ্ছে কী, অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। দরজা খোলা, রমা যেকোনো সময় চলে আসতে পারে। আর একটু অপেক্ষা করো, আসছি...

বীথি চলে গ্যাছে অনেকক্ষণ। সুভাষ জল খাবে বলে পাশের টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিতে যেতেই কাত হয়ে জল মেঝেতে পড়ল।

শব্দ পেয়ে দৌঁড়ে এলো রমা।

সুভাষ গ্লাস উলটে গেল...

ততক্ষণে জল সাপের মতো এঁকেবেঁকে সারা মেঝেতে বিস্তার করে ফেলেছে।

অন্য আর একটা গ্লাসে জল নিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরল রমা।

রমার হাত থেকে গ্লাসটা নিতে গিয়ে ওর হাতের স্পর্শে সাপগুলো ফণা তুলল। সব ভুলে রমার হাতের ওপর হাত রাখল সুভাষ। রমার হাত কাঁপছে, গ্লাসটা নিয়ে টেবিলে রেখে রমার হাত ধরে এক ঝটকায় কাছে টেনে নিল।

রমার দ্বিগুণ বেগে শ্বাস পড়ছে, বুক ওঠানামা করছে। পারিপার্শ্বিক সবকিছু ভুলে গেল ও।

সুভাষকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে এনেছে বীথি, তাও অনেকক্ষণ হয়ে গ্যাছে। আজ এখনো রমা কাজে আসেনি। এত বছর কাজ করছে, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া না বলে কখনো কামাই করে না। আজ হঠাৎ ওর কী হল? বীথি দুবার ফোন করল, দুবারই রিং বেজে কেটে গেল।

সুভাষ সব দেখছে, কী বলবে বুঝতে পারছে না। সকালের ঘটনার জন্য ভীষণ অনুতপ্ত ও লজ্জিত। চুপ করে আর সোফায় বসে থাকা যাচ্ছে না। বীথির চোখের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারছে না। খেতে বসেও বিশেষ কথা বলল না। বীথির কথার উত্তরও দিল না বেশি।

বীথি একবার তো বলেই ফেলল, তোমাকে আজ যেন কেমন লাগছে, খুব কি শরীর খারাপ করছে?

আজ বীথি খুব খুশি, সুভাষের বেডরুমে নতুন বেডকভার পেতেছে। পাশাপাশি দুটো বালিশ রেখেছে। অফিস থেকে ফেরার সময় একগোছা লাল গোলাপ নিয়ে এসেছিল, সেটা বেডরুমের কর্নার টেবিলে সাজিয়ে রাখল। সব ঘরগুলো রুমফ্রেশনার দিয়ে স্পে করল।

সুভাষ সব বুঝতে পারছে। আজ অফিস যাওয়ার সময় বীথি বলেছিল... ওকে আর একটু অপেক্ষা করতে। এতদিন বীথির সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করল, আর একটু অপেক্ষা করতে পারল না! ক্ষণিকের ভুলে আজ বীথির সঙ্গে কি করল ও?

সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে বীথি, সুভাষকে ভালোবেসে সব ছেড়ে চলে এসেছে। সুভাষ প্রথমে কলেজের হোস্টেলে থাকত, পরে চাকরি পাওয়ার পর মেসে থাকত। ঝাড়খণ্ডে বাবা-মা ভাইয়েরা থাকে। বীথির সঙ্গে বিয়ের পর এক কামরার ঘর নিয়ে ভাড়া ছিল। আনন্দ আর আলোময় ছিল দিনগুলো। বিয়ের তিনবছর পর ওদের দুজনের মাঝে টুবলু এল। টুবলু যখন দু-বছরের তখন অফিস থেকে লোন নিয়ে শহরের উপকণ্ঠে একটুকরো জমি কিনে এই বাড়ি করেছে। এসবই তো বীথি আর টুবলুর জন্য, নাকি ওর নিজের জন্য? নাকি নিজের ক্ষমতা বীথির পরিবারকে দেখাতে? ও কি বীথিকে ভালোবাসে না? বোধহয় না, কেননা ও যদি ভালোবাসত তাহলে আজ রমার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটাত না। বীথির কাছে ও কি সারেন্ডার করবে? তাতে বীথির চোখে ও হয়তো খুব ছোটো হয়ে যাবে, কিন্তু এ ছাড়া ওর আর কিছু করার নেই। ও কোনোদিন বীথির কাছে কোনো কিছু লুকায়নি। আর তাছাড়া রমা হয়তো আজ নাহয় কাল বীথিকে সব বলে দেবে। কেননা রমা বাড়ি যাওয়ার সময় বলছিল বৌদির কাছে ও অপরাধী। বৌদি ওকে এতো ভালোবাসে, বিশ্বাস করে, ওর আপদে বিপদে এগিয়ে আসে। সেই বৌদিকে ও ঠকাল? বৌদিকে মুখ দেখাবে কী করে?

হয়তো সেই কারণে রমা ফোন রিসিভ করছে না।

বীথি সেই থেকে ডাকছি, বসে বসে কী এতো চিন্তা করছ? শোবে চলো।

সুভাষ আর থাকতে না পেরে বলে ফেলল... আমাকে ক্ষমা করে দাও বীথি। জানি আমি ক্ষমার অযোগ্য। কেননা আমি যে ঘৃণ্যতম কাজ করেছি তা শুনে কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না।

জ্বরের ঘোরে কী আবোল তাবোল বকছ। কিন্তু জ্বর তো সেরকম নেই দেখলাম।

বীথির কথার উত্তর না দিয়ে সুভাষ বলল, তুমি আমাকে যা শাস্তি দেবে আমি মাথা পেতে নেবো। আমাকে ক্ষমা করে দেবে বলো?

বীথি এবার ঘাবড়ে গেল, সুভাষের পাশে বসে বলল, কী হয়েছে তোমার? আমাকে খুলে বলো।

বীথি অফিসে যাওয়ার পর থেকে পরপর সব ঘটনা বললো সুভাষ।

সুভাষের কাছ থেকে এরকম কথা শুনবে আশা করেনি বীথি, আস্তে

আস্তে উঠে দাঁড়াল। ওর সব স্বপ্ন আজ চুরমার, পৃথিবী আজ টলোমলো করছে; দ্বিখণ্ডিত হয়ে গ্যাছে। কাজের মেয়ের সঙ্গে... সুভাষের রুচিবোধ এতটাই বদলে গ্যাছে? বীথি ডিসিশন নিল, এতবড়ো অপমান ও কোনো মতে মেনে নেবে না। এক মুহূর্ত সুভাষের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করছে না। বাড়ির অমতে সুভাষকে বিয়ে করেছিল বীথি, কাজেই কোনোমতে মায়ের কাছে ও যাবে না। ওর অফিসের কলিগ অলিভিয়াকে একবার বলে দেখবে ভাবল। বয়স এবং পোস্ট দুটোতেই ওর থেকে সিনিয়র, তবু দুজনের মধ্যে খুব ভালো বন্ধুত্ব। সিঙ্গেল মাদার, ছেলে লন্ডনে পড়ছে। মোবাইল নিয়ে ফোন করল অলিভিয়াকে অলিভিয়া, আজ মানে এক্ষুনি আমি যদি তোমার কাছে যাই তাহলে তোমার কি খুব অসুবিধা হবে?

সুভাষ এক তরফের কথা শুনতে পারছে, অপর দিকে কী বলছে সেটা শুনতে পারছে না।

—ওকে, ওকে, অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে, এই সাহায্যটুকু করার জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি গিয়ে সব বলব এক ঘন্টার মধ্যে তোমার কাছে পৌঁছে যাব।

বীথি ফোনে উবের বুক করল। তাড়াতাড়ি ড্রেস চেঞ্জ করে ট্রলিব্যাগ নিয়ে সামনে যা পেল দরকারি কিছু জিনিস ও কটা জামাকাপড় ভরল। সুভাষকে বলল, কদিনের মধ্যে ডিভোর্স পেপার পাঠিয়ে দেব, সই করে অবশ্যই আমাকে মুক্তি দিও। ছেলের দায়িত্ব তোমাকে পালন করতে হবে না, সেটা আমিই পারব।

সুভাষ কেঁদে ফেলল আমাকে এত বড় শাস্তি দিও না, আমি তোমাদের ছাড়া থাকতে পারব না বিথী।

—আমাকে নাম ধরে ডাকার অধিকার তুমি হারিয়েছ, তোমাকে দেখে ভীষণ ঘৃণা হচ্ছে। এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাব। মানুষ চিনতে আমি ভুল করেছিলাম। এখানে এখনো দরকারি কয়েকটা জিনিস আছে, পরে এসে নিয়ে যাব। ভয় নেই, তোমার দেওয়া কিছু নেব না। তারপর ঘরের চাবি দিয়ে দেব।

গাড়ি এসে গ্যাছে, সম্মান নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে গাড়িতে উঠে বসল বীথি।

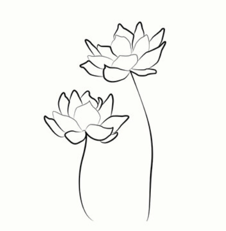

প্ল্যাটফর্ম

শৈলেন সরকার

—ট্রেন চলবে না আর?

—ঘুমিয়েছিলি নাকি, জানিস না?

—না তো। ভাবছি স্ট্রাইক হবে হয়তো।

—স্ট্রাইক কি এতদিন ধরে হয় নাকি?

—কেন হবে না, হয়নি একবার?

— তা হয়েছিল, কিন্তু এটা স্ট্রাইক নয়। এটা একেবারে ট্রেন না চালানোর গল্প। ফরমান।

—কার ফরমান?

—গরমেনের।

—কে গরমেন? থাকে কোথায়?

— তা জানি না। তবে যেখানেই থাকুক দেখতে পায় কিন্তু সব। এই যে আমি আর তুই—

ট্রেন নেই আজ অনেক দিন। ট্রেন নেই মানে ঠিক নেই নয়। আছে। দুটো-একটা। ওই রেলের স্টাফদের। সবার জন্য নয়। সে তুমি যতই কাকুতিমিনতি করো, পুলিশ তোমাকে যেতেই দেবে না ট্রেনের কাছে।

কার্ড দেখতে চাইবে। আই কার্ড।

হিসেব ধরলে এটা রাতই। রাত মানে অনেক রাত। এ টাইমে ট্রেনের হুড়োহুড়ি ছিল না কোনো দিন। বড়োজোর দুটোএকটা মালগাড়ি বা শুধুই ইঞ্জিন। ফার্স্ট ট্রেনের টাইমের দেরি আছে এখনও। আগেকার সেই দিনগুলি হলে কেবিনঘরের সেই মেয়ে ফার্স্ট ট্রেনের খবর বলার জন্য তৈরি হত। ঠিক জেগে উঠত এতক্ষণে। হয়তো চোখেমুখে জল দিয়ে—

—মেয়েটা গেল কোথায় বল তো?

—কোন মেয়ে?

—মাইকের।

—ওখানে মেয়ে নেই কোনো। ছিলই না।

—কে বলল?

—দেখেছি। দেখেছি মানে, আসলে দেখিনি।

—বলছিস দেখেছি, আবার বলছিস দেখিনি।

—কেবিনের লোকদের দেখবি আর কীভাবে? জাল দিয়ে ঢাকা সব। সব জানলা, সব ফাঁকফোকর।

— তার মানে আছে। দেখিনি বলে তো আর নেই বলা যায় না। হয়তো ওই দেওয়ালের ওপাশে, বন্ধ জানলার আড়ালে। কোনো ভাবে দেখছে সব কিছু। না হলে কী ভাবে থ্রু ট্রেনের বেলায় যাত্রীদের সরে দাঁড়াতে বলত। কীভাবে একেবারে ঠিক সময়মতো বলত, 'তিন নম্বরে থ্রু ট্রেন, তিন নম্বরে–' আর অমনি হুড়মুড় করে আমাদের গা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ধুলো-ময়লা-কাগজের টুকরো উড়িয়ে সেই ট্রেন কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই একেবারে উধাও হয়ে যেত। সেই মেয়ে তার মানে আগের থেকেই জানতে পারে সব কিছু।

—সব কিছু বলিস না। সব জানলে তো ট্রেন বন্ধ হওয়ার আগে থেকেই বলত মাইকে। বলত 'কাল থেকে সব ট্রেন—' বলেনি তো।

—হয়তো বলেনি, কিন্তু দেখিস একদিন ওই মেয়েই হঠাৎ ফার্স্ট ট্রেনের অ্যানাউন্স করে বলে উঠবে। হঠাৎ করেই সব ফলের হকার, চায়ের দোকান—। হঠাৎ করেই দেখবি একেবারে আগের মতোই ট্রেন থেকে হুড়মুড় করা ভিড়—

বৃষ্টি শুরু হল হঠাৎ। মেঘ একটু-আধটু ছিলই, তাই বলে বৃষ্টি যে হবে এমন আন্দাজের সুযোগ দেয়নি। অ্যাসবেসটসের ছাদের উপর খরখর-খরখর শব্দ তুলে কিছুক্ষণের মধ্যে ছাদটাকেও আর বুঝতে দিল না কিছু। সঙ্গে বাতাস। মানুষজন থাকলে এসময় ভালো জায়গা নেওয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। কেউ আবার ভিজতে ভালোবাসে খুব। আজ কিন্তু এ বৃষ্টি দেখার নেই কেউ। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি যে রেললাইনে পড়ে ভাঙছে, কংক্রিটের স্লিপারের গায়ে আছড়ে সাদা দানা দানা হয়ে ছিটকাচ্ছে চারপাশে— কে দেখবে? বা একটানা বৃষ্টির শব্দে আল্ল নমনা হয়ে নিয়ম নেই জেনেও সাইডে গিয়ে কারও সিগারেট ধরানো। আসলে বৃষ্টির দিনে যেন অনেকেরই মনে পড়বে অনেক কথা। পিঠে ব্যাগ নিয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাবে বলে বেরিয়ে ফার্স্ট ট্রেনের সেই ভোর-ভোরেও মনে পড়বে কত বছর আগে মাধ্যমিকের কোচিং এ পড়া মেয়েটির কথা। সেই যে ইংরেজি খাতা দিতে গিয়ে হাতে হাত। তাকানো। বা কলেজের সেই সব বান্ধবী। নাম্বার আছে এখনও কারো? আর তার মধ্যেই কেবিনঘরের সেই মেয়েটি, 'শিয়ালদহ যাওয়ার ডাউন নৈহাটি—।'

একটা কাক ডেকে উঠল। বৃষ্টির মধ্যেই। বৃষ্টি অবশ্য আগের মতো নেই আর, একটু ঝিমোনো। কাকটা পবিত্রদার কচুরির দোকানের ডাস্টবিনে নেমেছে। আছে কিছু? থাকবে কোত্থেকে? দোকানই নেই। মানে, আছে, ওই টিন আর কাঠের কাঠামোটা। পবিত্রদা মাঝে এসেছিল একদিন। ওর দু'নম্বরের দোকান। মানে প্ল্যাটফর্মের। একেবারে মাঝামাঝি। ট্রেন চলার দিনগুলিতে সেই ভোর-ভোর দোকান খুলত লোকটা। একেবারে ফার্স্ট ট্রেন থেকে। নৈহাটি। ফার্স্ট ট্রেনের আগেই আড্ডা বসাত মানুষজন। মাল আনতে যাচ্ছে শেয়ালদা কি হাওড়া থেকে। উঠবে একেবারে সামনের দিকে। শেয়ালদায় ট্রেন থামামাত্রই ছুটতে হবে। যে যত আগে—। কিন্তু তা ট্রেন থামার পরের ব্যাপার। তার আগে ট্রেনের অপেক্ষায় থাকা ভোরে পবিত্রদার দোকানে যখন পান্নালালের 'মা আমার সাধ না মিটিল' গান বাজে তখন কত কথাই না মনে পড়বে সবার। আরে, পলতার জলিলকে দেখি না তো ক'দিন। হল কিছু? জানে কেউ? কারও বা ঘরে ঘুমিয়ে থাকা ছেলে বা মেয়ে। কেউ বা পাশের কারও কাছে ভালো ছাতার কথা জানতে চায়। পাব কোথায়? মেয়েটা ঘুমের আগে মনে করিয়ে দিয়েছে বারবার।

পবিত্রদা এসেছিল ভোর-ভোরই। বৃষ্টি ছিল তখনও। হালকা। ঘরের কোনাঘুপচি দিয়ে ঢুকে পড়া ভেজা বাতাসের জন্যই হয়তো ঘুম ভেঙে গিয়ে থাকবে লোকটার। বা ভুলক্রমেও হতে পারে। ভোরটাকে হয়তো বিকেল ভেবে। বা সারারাত না ঘুমিয়ে ভোর হতে না হতেই আর পারেনি। বৃষ্টির মধ্যেই—। দোকানের সামনে এসে প্রথমে বিড়ি ধরাল একটা। এরপর ধারে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে দেখল ডানদিক। যেন ট্রেন আসবে কোনো এক্ষুনি। যেন কেবিনঘরের সেই মেয়ে অনেকক্ষণ আগে ট্রেনের খবর করা সত্বেও কেন ঢুকছে না ট্রেনটা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যেন হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল কিছু। এবার বেশ হন্তদন্ত হয়েই ঢুকল নিজের দোকানঘরে। দোকানঘর মানে চারদিকে টিন আর কাঠ, মাথায় প্লাস্টিক। এবার দেশলাই বের করল ফের পকেট থেকে। যেন স্টোভ জ্বালিয়ে তেল গরম করবে কচুরির। যেন দাঁড়িয়ে থাকা খদ্দেরদের গুনে নেওয়ার জন্যই আলতো করে চারপাশটা দেখে নেবে একবার। যেন রেডিওটা চালাবে। যেন সেই পান্নালাল রেডি হয়ে বসে, যেন রেডিওর নব ঘোরানোমাত্রই 'মা আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল—।' না, লোকটা এরপর কিছুই করল না কিন্তু। আর দেখাই গেল না এরপর। বেশ কিছুক্ষণ লোকটা সেই কচুরি রাখার শোকেসের আড়ালেই। বা হয়তো উবু হয়ে বসে। হঠাৎ করেই একটা গোঙানি, গোঙানি কেন, ওটা কান্নাই, 'আমি এখন কী করব, ও মা–' আর পান্নালালের গানের মতোই সেই কান্না প্ল্যাটফর্মময় গড়াতে থাকল। যেন 'অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না, বুক ফেটে ভেঙে যায় মা–।' ফাঁকা হলে যা হয়, সেই কান্না তখন দু' নম্বর থেকে লাফিয়ে রেললাইন টপকে এক নম্বর, এক নম্বরের বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দোকানঘরগুলিতেও পৌঁছে গিয়েছে। এক নম্বরের স্টেশন মাস্টারের ঘর বা বন্ধ টিকিট কাউন্টার

সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেই কেবিনঘর ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল কোথাও। কেবিনঘরের সেই মেয়েটি কি শোনেনি? নিশ্চয়ই শুনেছে। কান্না শুনেই ও হয়তো ফার্স্ট ট্রেন 'আপ নৈহাটি'র অ্যানাউন্স করবে ভেবে মাইক হাতেও নিয়েছিল। না, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কারও। কেননা, এ সময় মাইক চালু করার সেই 'খরর-খরর' আওয়াজের মতো কিছু একটা কানে এসেছিল। কানে এসেছিল পবিত্রদারও। আর তাই অনেকক্ষণ পর লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ করল। যেন সত্যিই মাইকে কেউ বলবে কিছু। যেন আজ—। কিন্তু না, গরমেন হয়তো লক্ষ্য করছিল সব, মেয়েটিকে রেডি হতে দেখে গরমেনই হাত তুলে—। পবিত্রদাকে এরপর সবাই দোকানের বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখেছিল শুধু। সবাই মানে যাদের দেখার। একটা কুকুর কিছু পাবে না জেনেও কী কারণে শুয়েছিল প্ল্যাটফর্মে কে জানে, কী বুঝে সে পবিত্রদার দোকানের সামনে এগিয়েও এসেছিল। পবিত্রদার কান্না বা গোঙানিটাকে ও হয়তো রোজকার পান্নালালের গান বলেই ভেবে থাকবে। আর হয়তো অনেকদিন পর পবিত্রদা দোকান খুলেছে বলে ভুলও করে থাকতে পারে।

ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন জায়গা অঢেল। সারাদিন যতক্ষণ খুশি ঘুমাও বলার নেই কেউ। কেউ এসে ফলের ঝুড়ি রাখবে বলে তোমার বিছানা বালিশ প্লাস্টিকশুদ্ধ লাথি মেরে—। শুরুর দিকে আর একটা জায়গাতেও সুবিধে ছিল। খাওয়ার। প্রথম কয়েকটা দিন অনেকেই বেশ ঝুড়ি বালতি করে দুপুর আর রাতের—। সন্ধ্যার মা জানত এসব বেশি দিনের নয়। দত্ত বুড়ো আবার এইসব লোকের কাছে ভালো গল্প ফেঁদেছে একটা। ইংরেজিতে একটাদুটো কথা বলে লোকগুলিকে কী বুঝিয়েছে কে জানে, এক ওই দত্ত বুড়োর জন্যই এখনও মাঝেমধ্যে একআধজন প্যাকেটে করে রুটি বা ভাত। কেউ আবার পাশে দাঁড়িয়েই খাওয়ায়। সে আবার খোঁজ নেয়। জানতে চায়, 'এত টাকা পয়সা, ছেলে-ছেলেবউকে বিশ্বাস করে—।' বুড়ো এমন ভাব দেখায় যেন ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না। কে বলবে রাত হলেই বিদ্যাকে ছোঁয়ার জন্য ছুকছুক করবে। প্রথম প্রথম সন্ধ্যার মাও আমল দিয়েছে লোকটাকে। বয়স্ক মানুষ। ছেলে-ছেলে বউ নাকি বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। কাজকর্ম করত নাকি ভালো জায়গায়। হতেও পারে। কিন্তু তাই বলে রাত হলেই মেয়েদের শরীরের লোভ জাগবে এ আবার কী কথা! বিদ্যা অবশ্য সেয়ানা মেয়ে। ছুঁতে দেবে, কিন্তু ওই হাত, হাতের আঙুল, বড়ো জোর গাল, মাথার চুল। আর তাতেই বুড়ার কাছ থকে দশ-বিশ যা পারে। অবশ্য বিদ্যাই বা পারবে কেন রোজ দিন। প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া শিবমন্দিরের পঞ্চানন আছে না! পঞ্চানন, ভজা। ওরা অবশ্য ওকে মন্দিরেই নিয়ে যাবে। মন্দিরে নাকি কোনো পাপ নেই।

এর মধ্যেই পুলিশ এল একদিন। বিদ্যা কোথায় গিয়েছিল কে জানে। পেল সন্ধ্যার মাকে। বিছানা-বালিশ দেখিয়ে নাম জিজ্ঞেস করতে বলতে হল, 'নাম, সন্ধ্যার মা।' 'এটা আবার নাম হল নাকি? আসল নাম বলো?'

— কোনো আসল নাম নেই তোমার?

'তোর' না বলে 'তোমার' বলায় বেশ সাহস পেয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যার মা। বলল, সবাই তো আমাকে সন্ধ্যার মা-ই বলে।

— সবাই কি বলে তা নিয়ে আমি করব কী? তুমি নিজে কী বলো নিজেকে?

কিন্তু সে কী বলে নিজেকে, কিছুই তো বলে না। প্রশ্নটা না বুঝতে পেরে পুলিশটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। লোকটা ফের জিজ্ঞেস করল, 'খাও কী দুপুরে? খাবার দিতে আসে কেউ? সন্ধ্যা কোথায়?' একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন। কোনটার উত্তর দেবে প্রথমে।

— আগে দিত একদল লোক, এখন আসে না।

— তা হলে কি না খেয়ে থাকো?

এবার আরও দু'জন পুলিশ উঠে এল নীচ থেকে। একজন পারলে তখনি লাথি মেরে বিছানা-বালিশ বাইরে ফেলে দেয়। বলল, 'এরা ডেঞ্জারাস স্যার, রাতে পুরো আসর বসে এখানে।'

—বিশ্বাস করুন বাবু, আমি নই, আমি কিচ্ছু না।

— কে জানে তাহলে?

— বুড়োকে জিজ্ঞেস করুন, ও জেগে থাকে অনেক রাত অব্দি।

দত্তবুড়ো এতক্ষণ শুনছিল সব। জয়ন্তের টি স্টলের সামনের পুরো জায়গাটাই এখন ওর। এমনকী সামনের বেঞ্চটাও। ওই বেঞ্চেও বসতেও দেবে না কাউকে। বুড়ো বলল, 'একেবারে রিলাই করবেন না স্যার, এই বুড়িটার চেয়েও বদমাশ হল এক ছুকরি, পালিয়েছে মনে হয় আপনাদের দেখে।'

বুড়ো এবারও কেমন ছাড় পেয়ে গেল ভাবো, কেমন দুটো ইংরেজি বলেই কেমন নরম করে ফেলল পুলিশগুলিকে। সেই প্রথম পুলিশই এবার বুড়োটাকে জিজ্ঞেস করল, 'ক'জন আছেন আপনারা এমন?'

— আছি ভাবুন অন্তত পনের জন।

— কোথায় বাকিরা?

বলতে বলতে বিদ্যা হাজির হল কোত্থেকে। বলল, 'আরে বুড়ি, শুনলাম আমার নামে আজেবাজে কী সব বলছিস বাবুকে?'

বিদ্যার ক্ষমতা আছে। সেই রাগী রাগী চেহারার দ্বিতীয় পুলিশ বিদ্যার দিকে তাকাল কেমন হিসেব কষে। সেই প্রথম পুলিশ জানতে চাইল, 'জ্বরজারি আছে কিছু তোমাদের?' বলল, 'খাবার আসবে তোমাদের জন্য, ঠিক বারোটায়, এখানেই, থাকতে বলবে সবাইকে।'

এইটুকুই। এইটুকু মাত্র বলেই লোকগুলি দুপদাপ নেমে গেল। কিন্তু খাবার আসবে কি শুধুই আজ, নাকি রোজ জানা হল না তো।

এবার সেই বুড়ো বলল, 'তোর মেয়ে কোথায় বললি? মানে সন্ধ্যা?'

— হঠাৎ কেন আবার তোর মনে পড়ল আমার মেয়ের কথা?

— কেন, ওই যে পুলিশ জিজ্ঞেস করল সন্ধ্যার কথা। পুলিশকে বললি না তো কিছু।

— সন্ধ্যা থাকে কেরালায়। ও কি আমার মতো হাভাতে নাকি? থাকে স্বামীর সঙ্গে। রোজগার করে। ওর খবর জেনে কী করবি?

— এমনি। তুই খোঁজ রাখিস না মেয়ের?

—আরে বুড়ো, নিজের মেয়ের খোঁজ রাখব না? রাখে ওরাই। কচুরিয়ালা পবিত্রের ফোনে খবর নেয় মেয়ে-জামাই দুজনই। টাকা লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করে। প্ল্যাটফর্মে থাকলে তো আমার মেয়েকেও

ছাড়তিস না। এবার বুঝলাম, কেন তোর ছেলে আর ছেলেবউ—। ট্রেনের একটা সুবিধা ছিল খুব। না, যাতায়াতের কথা বলছি না। না, তাই বা আবার বলি কী ভাবে? সে তো যাতায়াতই একটা। বলতে পারো, যাওয়াই শুধু, হয়তো আসা নয়। হ্যাঁ, ঝাঁপ দেওয়ার কথা। কত মানুষ আরামসে চোখ বুজে একবার–। বিষ খাওয়া বা ঘুমের ট্যাবলেটের ঝামেলা কত! বা গলায় দড়ির কথাই ভাবো! দড়ি জোগাড় করো, টুল বা চেয়ার না থাকলে নিয়ে আসো জায়গা মতো। সবচেয়ে বড়ো কথা, সময় যায় অনেকটাই। সেই চেয়ার বা চৌকি ঠিক করে সিলিং-এর কাঠ বা ফ্যানের ব্লেড। এরপরেও কেউ সন্দেহ করবে তোমাকে। বলবে, পা মাটিতে কেন? হাত উঠে আছে কেন ওভাবে? এত উঁচুতে নাগাল পেল কীভাবে? তোমার বাবা-মা বা ভালোবাসার মানুষদের কষ্ট বা যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে যে তুমি প্রাণটা দিলে—তা বুঝলই না কেউ। কিন্তু ট্রেনে ঝাঁপ দেওয়ার বেলায় ভাবো। হ্যাঁ, কেউ না দেখলে ভাববে কোনো শত্রু ধাক্কা দিয়ে, বা অন্য কোথাও মার্ডার করে—। কিন্তু সবার সামনে ঝাঁপ দিতে তোমাকে মানা করল কে? একেবারে দিন-দুপুরে ভরা অফিস টাইমে ঝাঁপালে কে আবার অ্যাক্সিডেন্টের কথা তুলতে যাবে?

—কিন্তু পবিত্রদা?

—পবিত্রদার কথা কী বলবি? ও তো জাস্ট লাইন পার হতেই গেছে, ট্রেন বন্ধ জানে। হোক ভোর-ভোর, হোক বৃষ্টি-বাতাস। ট্রেন বলতে যেখানে কিছুই নেই এখন, সেই লোক একেবারে হঠাৎ করে আসা এক ইঞ্জিনের ধাক্কায়—।

—কিছুই নেই মানে? ও তো প্ল্যাটফর্মেরই লোক, ভোরের দিকে যে একটা ইঞ্জিন—। জানবে না ও? কেবিন ঘরের মেয়েটি বলেনি? 'দু' নম্বরে থ্রু ট্রেন, দু' নম্বরে থ্রু—,' আমার নিজের কানে শোনা। মানলাম মেয়েটির কথা খেয়াল করেনি, কিন্তু ফার্স্ট ট্রেনের প্যাসেঞ্জার ধরা দোকানদার, ভোর-ভোরের এই ফাঁকা ইঞ্জিনের কথা ও জানবে না? প্ল্যাটফর্মের সব দোকান, ট্রেনের অ্যানাউন্সমেন্ট, মাইকের সেই মেয়ে, সবারই তো জানা। তবে কেন শুধুশুধু লাইন বরাবর দুদিকে তাকিয়ে একেবারে ওই সময়ই—। ওটা সুইসাইডই।

— বাড়ির লোক কিন্তু একবারের জন্যও সুইসাইড ভাবেনি। ওদের কাছে ওটা অ্যাক্সিডেন্ট। আমারও কাছেও—

—আবার এক কথা। বোকা নাকি তুই। ও তো আমাদের প্ল্যাটফর্মেরই। একেবারে ওই সময়ে যে একটা ফাঁকা ইঞ্জিন। হতে পারে ঘরের বউ-ছেলে-মেয়ে বা বাবা-মাকে খাওয়াতে না পেরে দুঃখ বা যন্ত্রণায়—হতেও পারে, মনে করে দ্যাখো, লোকটা সেদিন কেঁদেছিল খুব। ঠিক কান্নাও নয়, একেবারে পান্নালালের 'মা আমার সাধ না মিটিল' গানের মতো হাহাকারই সেটা। কিন্তু ওর সেই দুঃখ বা যন্ত্রণার কথাটা এখন আর বাড়ির লোকের অনুভবেই এল না। ওরাও তোর মতোই—কেউ ভাবল না শুধু ওদের কথা ভেবেই লোকটা—অ্যাক্সিডেন্টের ধুয়ো লোকটার সুইসাইডটাকে একেবারে ফালতু করে দিল।

কুড়ি হাজার টাকা গাড়ি ভাড়া করে এই কেরল থেকে সোদপুর পৌঁছে শুনল বিমল অন্য মেয়ের পেছনে পড়েছে। মানে সেই মেয়ে এসেছে তাদের সঙ্গেই। কেরল থেকেই নাকি প্রেম ওদের। আশ্চর্য, একবার সন্দেহ করতে পারল না সন্ধ্যা! এটাও শুনতে হল, টাকা নাকি সেই মেয়ে মুক্তির। বিমল নাকি থাকবে না আর সন্ধ্যার সঙ্গে। বিমল আর মুক্তি নাকি সেই কেরল থেকেই মন দেওয়ানেওয়ার পালা শেষ করে এসেছে। মুক্তির কথায়, সন্ধ্যা চাইলে দু'জনে মিলে একসঙ্গেই থাকতে পারে। দু'জনে মিলে মানে একই বাড়িতে মুক্তি আর সন্ধ্যা। এটা কে সহ্য করবে? এমনটা কী ভাবে চাইতে পারে সন্ধ্যা! তিন বছর আগে এই বিমলের হাত ধরে পেটে বাচ্চা নিয়ে পালানো মেয়ে সন্ধ্যা। বাচ্চা নষ্ট না করে উপায় ছিল না কোনো। সেই বাচ্চা থাকলে আজ কিছুতেই ট্রেনের তলায় গলা দেওয়ার কথা ভাবত না সে। কেরল থেকে ফেরার পর মাকে একবারের বেশি মুখ দেখাতে আসতে পারেনি সন্ধ্যা। মা ওইটুকু সময়ের মধ্যেই গলায় দড়ি দিতে বলেছে। বলেছে, আমি খাব কি তার ঠিক নেই, আর তোকে খাওয়াব? এখন এতদিন পর স্বামীকে ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে এলে মুখ দেখাতে পারব?

—কিন্তু আমি তাহলে যাব কোথায়? ওই হারামিটার সঙ্গে এক ঘরে আমি থাকব কীভাবে? আমার সব টাকাপয়সা—

মার ওই এক কথা, দড়ি দে গলায়। কিন্তু সন্ধ্যার যে ভয় করে খুব। ওর মা বলেছিল, তা হলে ঝাঁপ দে লাইনে। সন্ধ্যা ট্রেন না থাকার বলেছিল। আর তখন ওর মা-ই উপায় বাতলে দিল। ভোর-ভোর দুই নম্বর দিয়ে ফাঁকা ইঞ্জিন যায় একটা। একেবারে রোজ। পবিত্র কচুরিয়ালা নাকি ওই ট্রেনেই—। মা বলল, এমনিতেই প্ল্যাটফর্মে এখন থাকে না কেউ, তার উপর ভোর রাতে দুই নম্বরের সামনের দিকে ব্রিজের গোড়ায় দিনের পর দিন বসে থাকলেও ।

প্ল্যাটফর্মের নীচে তারকের দোকানে কুড়ি টাকায় ভাত-ডাল-সব্জি খেয়ে নিল সন্ধ্যা। লকডাউনের বাজারে চুরি করে খোলা দোকান। টাকাটা মায়েরই। বলল, খেয়ে নে কিছু তারকের দোকানে। তারপর? তারপর প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে ঘুমিয়ে নে একটু। মাঝরাত ছাড়ালে মালগাড়ি যায় একটা দু' নম্বরে, ঠিক ঘুম ভাঙবে তোর—হ্যাঁ, পারলে ওই মালগাড়িতেই ঝাঁপাতে পারিস, কিন্তু ঝাঁপাতে গেলে ট্রেনের ইঞ্জিনকে পাবি না কিন্তু, ইঞ্জিনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল যখন তোর, ততক্ষণে ইঞ্জিন সেই প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে, তোর চোখের সামনে তখন ঘটাংঘটাং শব্দ করা ওয়াগনের পর ওয়াগন, তখন ঝাঁপানোর চেষ্টা করলে ওয়াগনের ধাক্কায় হয়তো প্ল্যাটফর্মেই ছিটকে—, তার চেয়ে বাকি রাত ওই ভোর পর্যন্ত একটু কষ্ট করে—।

ভোররাত অব্দি অপেক্ষা করতে হয়নি। এমনকী মাঝরাতের সেই থ্রু যাওয়া অব্দিও নয়। প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে শুয়ে কিছুতেই ঘুম আসে না সন্ধ্যার। কী ভেবে প্ল্যাটফর্ম থেকে নীচে নেমে লাইনের ওপর দাঁড়িয়েছে সন্ধ্যা। তাকিয়েছে লাইন বরাবর সোজা। না ট্রেন, বা মানুষজন কিছুই নেই কোথাও। শুধু দূর, দূরের পরপর সিগন্যাল পোস্টের জ্বলতে থাকা লাল-সবুজ-হলুদ আলো। সেই ইঞ্জিন আসবে যখন, ঠিক সবুজ আলো দেখবে সন্ধ্যা লাইন বরাবর। আলো, হর্ণ। বা রেললাইনের কাঁপন। তার শরীরে উঠে আসবে কিছু একটা। কিন্তু সে

কি তখন চোখ খুলে রাখতে পারবে? সত্যিই চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল সন্ধ্যা। আর ঠিক তক্ষুনি শরীরের ওপর ভারী কিছু একটা। মা বলছিল, কিচ্ছু করতে হবে না তোকে, শুধু সময়মতো লাইনের উপর বসে, শুয়ে বা দাঁড়িয়ে—। বলছিল, চোখ বন্ধ করলেই ভয়ের কিছু নেই আর। না, সন্ধ্যাও ভয় পায়নি। শুধু গন্ধটাতে অবাক হয়েছিল। হ্যাঁ, পুরুষই। পুরুষের গায়ের গন্ধ ততদিনে ভালোই চেনা সন্ধ্যার। শুধু পুরুষ তো নয়, পুরুষের চোরাগোপ্তা সব ইচ্ছেগুলিরও।

একজন নয় দু'জন। সেই রাত কাটল ওদের সঙ্গেই। একেবারে দু'নম্বরের ব্রিজের নীচেই। কে কাকে দেখতে আসছে এখানে। শুধু ভোরের দিকে মাইকে একটা মেয়ের গলায় দু'নম্বর দিয়ে এক থ্রু ইঞ্জিন যাওয়ার অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে চমকে উঠেছিল সন্ধ্যা। মা কি জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে? ও যে এবারও মরতে পারবে না মা কি জানে? দু'জনের একজনকে পছন্দ করে নিল সন্ধ্যা। আগেকার সেই বিমলের গল্পের মতোই। বিমলও ঠিক এই ভাবেই ওর মায়ের কাছ থেকে কায়দা করে, না কি ওর মাই টাকার লোভে পড়ে— মোট কথা গল্পটা প্রায় আগের গল্পের মতোই একটা গল্প হয়ে গেল। এখন পেটে একটা কিছু এলেই হয়। না, এবার আর পেট নষ্ট করার কথা কিছুতেই ভাববে না সন্ধ্যা।

পুলিশ কিন্তু সন্ধ্যার মাকে খুব চমৎকার একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিল। ‘তুমি নিজে নিজেকে কী নামে ডাকো?’ অদ্ভুত না? কে আবার নিজেকে নাম ধরে ডাকে? দূরের কেউ হলে তবু—। কিন্তু যখন তুমি দূরের কেউ নয়, একেবারে খুব কাছের, মানে যখন কোনো দূরত্বই নেই—। যখন তুমি নিজেই নিজের লোক। যখন তুমি নিজের মনেই—। নিজের মনেই কোনো মেয়েকে, একেবারে নিজের মতো করেই, বা নিজের মনেই কাউকে রেপ অ্যান্ড মার্ডার, বা শুধু রেপই-কে দেখতে আসছে তোমাকে? কে তোমার নিজের মনে—।

—কিছু বলছিস?

— কেন, চারপাশে আর নেই তো কেউ।

— আছে। চারপাশে কেন, তোর নিজের মধ্যেই কে ঢুকে বসে আছে দেখ।

—আমার নিজের মধ্যে আমি ছাড়া কে থাকবে আর?

— আছে, তুই আর টের পাবি কী করে? সব শুনছে, সব দেখছে। আর সন্দেহ হলেই টেস্ট।

— কী সন্দেহ করবে?

—কী আবার, ভাইরাস ঢুকল কিনা, বা—। এরপর সেফ ডিটেনশন সেন্টার। মরলেও বডি পাবে না ঘরের লোক। জানতেও পারবে না কেন মরলি? কেন মরবি জানার ইচ্ছে হয় না তোর? কী হল? কাছে আসছিস কেন? আসবি না, খবর হয়ে যাবে কিন্তু, না কি হয়েই গেছে।

—কে খবর নেবে, কার কাছে? কাছে না এসে কী করব, কিন্তু পারছিই না তো তোর কাছে যেতে। শুনতে পারছি না যে তোর কথা।

আমরা যখনকার কথা বলছি, তার অনেক আগে থেকেই প্ল্যাটফর্মগুলি কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে নিজেদের মধ্যে কথা বলা। দূর থেকে যতই মনে হোক, যে ওরা শেষ পর্যন্ত মিলেছে কোথাও গিয়ে, বা আকুলিবিকুলি করছে মিলবে বলে, বা কান্নাকাটি করছে। কিন্তু না। লাস্ট ট্রেন ছেড়ে গিয়েছে জেনে, শেষ চেষ্টার মতো কিছু করবে ভেবে যতই প্রাণপণ তুমি ছুটতে থাকো, যতই ‘ও গার্ড, ও গার্ড থামাও একটু, যাব আমি, ও গার্ড’ বলে চিৎকার করো, যতই তুমি প্ল্যাটফর্মের গা ছুঁয়ে চলে যেতে থাকা ট্রেনের লাস্ট কামরার পেছনে আটকানো আলো দেখে ট্রেনটাকে কোনো মতে ঠিকই পেয়ে যাবে বলে মনে করো, দেখবে, প্ল্যাটফর্ম আর শেষই হচ্ছে না। দূর থেকে দেখে যতই দুটো রেললাইন ঠিক মিলেছে কোথাও না কোথাও বলে মনে করো, যতই একটা প্ল্যাটফর্মকে সঙ্গে আর একটা প্ল্যাটফর্মের কাছে যেতে চাইছে বলে মনে হোক না তোমার, দুটো প্ল্যাটফর্ম কিন্তু মেলার কোনো ইচ্ছেই দেখাচ্ছে না।

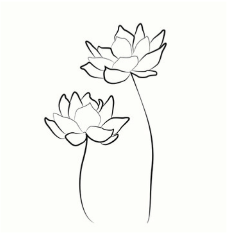

টেলিস্কোপ

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা হওয়াটাই সুবোধের কাল হল। শিক্ষিত মানুষ যে ভূতে অত বিশ্বাস করে এটা সে জানত না। রাতবিরেতে কুকুরের ভয়টাই এতদিন শুধু ছিল। মাস্টারমশাই তার সঙ্গে আবার জুড়ে দিলেন ভূতের ভয়। সুবোধ জানতে পেল ভূত হয়। শুধু মানুষের নয়, কুকুরেরও... তবে সুবোধ অস্বীকার করবে না মাস্টারমশাই সেদিন তাকে বাঁচিয়েছিলেন। সাইকেল থামিয়ে ফাঁকা রাস্তায় যদি তিনি চেনামুখ দেখে দাঁড়িয়ে না যেতেন, তবে নিঘঘাত টুঁটি ফেটে মরতে হত তাকে।

ঘটনাটা খুলে বলা দরকার।

সাউথের ডাউনট্রেনে ফিরতে সুবোধের রোজই রাত হয়। কলকাতায় একটা ইলেকট্রিশিয়ানের ওয়ার্কশপে কাজ করে। সেখান থেকে ছাড়া পায় রাত নটায়। তারপর অটো বা বাসে পড়ি কি মরি ছুট, সোজা বালিগঞ্জ। নটা চল্লিশের নামখানা গ্যালপিংটা পেয়ে গেলে জোর বরাত। নাহলে দাঁড়িয়ে থাকো পরের ট্রেনের জন্য। টিকির টিকির করে সোনারপুর স্টেশনে নামতে এগারোটা পার হয়ে যায়।

সেখান থেকে চণ্ডীতলা। জোরে হাঁটলেও কম সে কম কুড়ি মিনিট। এদিককার লোকজন স্টেশান থেকে সাইকেলে ফেরে। না হলে রিক্সা ভ্যান।

সাইকেলটা এখনো কিনে উঠতে পারেনি সুবোধ। আর অত রাতে প্রায় কোনোদিনই রিক্সাভ্যান পাওয়ার গ্যারান্টি নেই। অগত্যা চোখ কান

বুঁজে পায়ে হাঁটা।

শীতকাল। রেললাইনের পাশ ঘেঁষে বড়ো রাস্তাটা যেতে যেতে মাঝে মধ্যেই একেকটা করে বাঁক নিয়েছে। সব কটা মোড়ই দেখতে লাগে একরকম। ল্যান্ডমার্ক ঠিক করে না রাখলে বোঝবার জো নেই। ঠান্ডাটাও পড়েছিল বেশ কনকনে। জাম্পারের চেন ভালো করে টেনে, কানে গলায় মাফলার জড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে স্পিডে হাঁটছিল সুবোধ। পকেটে ঢোকানো হাত। গোটা পথটাই শুনসান। এই ঠান্ডায় তল্লাটের লোক খোপে ঢুকে গেছে। দরজা কপাটে খিল এঁটে মুড়িসুড়ি দিয়ে কুঁকড়ে গেছে হয়তো বিছানায়। জোরে পা চালাতে চালাতে নিজের গায়ের জাম্পারের ঘস্ ঘস্ শব্দটা অবধি শুনতে পাওয়া যায়, চারপাশে এমনই নিস্তব্ধতা।

সুবোধ একটু শর্টকাট নিল। বড়ো রাস্তা ছেড়ে ঢুকে গেল বাঁদিকের গলিটায়। এটা রেললাইন পার করে সিধে গিয়ে কাঁচা রাস্তায় উঠেছে। চন্ডীতলা পেরিয়ে যেদিকটায় সুবোধের বাড়ি, সেইদিকে। খুব সরু রাস্তা। এমনিতে ভ্যানট্যান এ রাস্তায় ঢোকে না, তবে আজ যেন মানুষজনের নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও নেই। ডানদিকে ঘুপচি ঘুপচি কিছু ঘর, সেগুলোরও দোর দেওয়া। আলোটাও ফুটে বেরোচ্ছে না বাইরে। একটু দূরে দূরে খেজুর গাছ, তাল গাছ স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে । আর বাঁদিকে বিশাল খোলা মাঠ বিছিয়ে রয়েছে আকাশের পরপার অবধি, তেমনি জমাটি কুয়াশা। তবে আকাশে চাঁদ ছিল, চাঁদেব মিহি আলো ছড়িয়ে ছিল রাস্তায়।

মাঠের ওদিক থেকেই হঠাৎ বেরিয়ে এল কুকুরটা। সুবোধের থেকে চার পাঁচ ফুট দূরত্ব হবে। রাস্তা কেটে মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ঠিক যেন ওই চাঁদের পানেই মুখটি তুলে গলা উঁচিয়ে সরু করে ডাক ছাড়ল—— ভউউউউ... !

গা হিম করা ডাক। ডাক নয়, কান্না। সে প্রায় একটানা অনেকক্ষণ। দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুবোধ। এবার একটু পাশ কাটিয়ে গুটি গুটি এগোতে চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে ডাকটা থেমে গিয়ে জ্বলে ওঠে ঝিকিমিকি সবুজ দুটো চোখ। গরর্ গরর্ গুমরানো চাপা আওয়াজ। সুবোধের পা ঠকাঠক কাঁপছে। মরতে কেন যে সে হঠাৎ এই রাস্তায় ঢুকল! কুকুরটা বসে পড়েছে, লক্ষ্য করে চলেছে সমানে। কিন্তু যখনই সে পা ফেলতে যায়, তখনই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। তেড়ে তেড়ে আসে মুখ বাড়িয়ে। কামড়ায় না, তবে প্যান্টে দাঁতের খোঁচাটা বুঝতে পারে স্পষ্ট। মা-বাপ, গুরুদেবের নাম স্মরণে এনে হনহনিয়ে পা চালাতে যায় সুবোধ। সামনে ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠল আরও দুটো কুকুর। হয়তো ঘাপটি মেরে ছিলই। সঙ্গিনীর ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে এসেছে!

তিনদিক ঘিরে কুকুর বাহিনী ফুঁসছে। কী যে চায়! যেন পণ করেছে, এক পাও নড়তে দেবে না লোকটাকে। পেছনের কুকুরটা শুঁকে শুঁকে অস্থির। দু-একবার হাত বাড়িয়ে বুকে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গেল। মাফলারে টান পড়ল।

হঠাৎ সুবোধের মাথায় ঝিলিক মারল বুদ্ধিটা। একটানে গলার মাফলারটা খুলে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল দূরে। কুকুরগুলোও লাফ মারল সেইদিকে। ব্যস্, আর কোনোদিকে না তাকিয়ে দে দৌড়! সুবোধ ছুটছে। পেছনে হয়তো ছুটে আসছে ওরাও। আসুক, ফিরলে চলবে না। হাঁপাতে হাঁপাতে সরু রাস্তা পার করে হাই জাম্প দেওয়ার মতোই সুবোধ ছিটকে পড়ল রাস্তায়। বেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ। সাইকেলটা তার মখোমুখি।

—আরে আরে কেরে তুই? ছুটতেছিস পাগলের মতো!

হাঁহাঁ করে ওঠে সাইকেল চড়া মানুষটা। সুবোধের চেনা লাগে গলা। প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারমশাই। তার ছোটোবেলার মাস্টারমশাই।

—ওফ্! দাঁড়ান গো। বাপরে, কুত্তাগুলো মেরে ফেলতেছিল আরেকটু হলে। আমি সুবোধ গো মাস্টার মশাই। সুবোধ নস্কর।

মাস্টার মশাই নেমে পড়েছিলেন সাইকেল থেকে। চ, হাঁটি। আমার সাথে থাকলে কুকুরের ভয় নেই। পিছন ফিরে চা দেখি একবার! সুবোধ পিছন ফিরে দেখল কুকুরগুলো যেন ভ্যানিশ হয়ে গেছে।

—হ্যারে, কোন সুবোধ তুই, ঠিক করে বল দিকি!

সুবোধ মাথা চুলকায়। কেলাস এইটে ম্যাপ আঁকতে পারিনি বলে সেই যে একবার খুব বকা বকেছিলেন! মনে পড়ে?

—হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে, শঙ্কর নস্করের ব্যাটা। তা ইস্কুল ছাড়লি কেন তুই?

—কেন আর কী? ওই..হল নে। ধান্দায় জুতে গেলাম, ইলেকট্রিকের কাজ শিখতিছি।

—অঁ, তা ভালো। মাস্টারমশাই মুখ ভারি করে গম্ভীর হলেন। হাঁটছেন পাশাপাশি। সেই ফাঁকে চোখ টেরিয়ে মাস্টার মশাইকে দেখছিল সুবোধ। বয়স হয়েছে। রোগাটে গড়নটা তেমনি আগের মতোই। জুলপি পেকেছে, তবে চুলে তেমন পাক ধরেনি। উলিকটের গেঞ্জির ওপর সেই হাতা গুটোনো ফুল শার্ট। ঘরে বোনা হাফ সোয়েটার। পায়ে পাম্প শ্যু। চোখে খয়েরি ফ্রেমের চশমা। বয়েসটাই যা কয়েক ঘর বেড়েছে। আর কিছু বদলায়নি।

—তা তুই ওই গলিতে এসে পড়লি যে হঠাৎ ! বড়ো একটা কেউ তো যায় না, এক আমি ছাড়া!

সুবোধ মাথা নাড়ে, হাঁ, আজ দেরি হয়েছিল বলে ঢুকে পড়ি, ভাবলাম তাড়তাড়ি হবে। বলে এক নিঃশ্বাসে সব ঘটনাটার বিবরণ দিয়ে চলে। মাস্টারমশাই চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। ভুরুতে ভাঁজ।

—বলিস কী! তিনটে কুকুর? আমি তো মাঝে মধ্যি ফিরি, কালও গেসলাম। কই তিনটেকে তো দেখিনি!!

মাঝমাঠ থেকে রাস্তায় উঠে আসা কুকুরটাই যে বাকিদুটোকে ডাক দিয়েছিল, সেকথা সুবোধ বেশ জোর দিয়ে বোঝায়। মাস্টার মশাই থম মেরে খানিক ভাবেন। তারপর জানতে চান রঙটা কী ঠিক করে বল তো? সাদা কালো? বেঁটে মতন? কানদুটো পিছনদিকি এট্টু ঢেউ খেলানো?

—হাঁ মাস্টারমশাই, অনেকটা তাই। আবছা আলো, ভালো করে তো ঠাওর করিনি!

—পাদুখানা লেগে ছিল কি মাটিতে? মনে কর, মনে করে বল!

——বড্ড কুয়াশা যে, সবি কেমনি আবছামতন, অতশত বুঝিনি। কেন বলেন তো?

মাস্টার মশাই সাইকেলের সিটে বার দুই চাপড় মারেন। যেন কি এক আপশোস! বলে ওঠেন, আঃ! ওটে কুকুর নয় রে, কুকুর নয়। প্রেতাত্মা!

সুবোধের বুকের কাছে ঘাই মারল কী এক অচেনা ভয়! ঢোঁক গিলল, বলেন কী মাস্টারমশায়? ভূ ভূ ভূত! মানে কুকুরের ভূত?

—দূর ছাগল, ভূত বলে কিছু হয় নাকি! আত্মা, আত্মা! সূদ শরীর! মহাশূন্যে পাক খেয়ে চলেছে অ্যাদ্দিন ধরে...জানতাম! আমি জানতাম একদিন না একদিন সে আবার আমাদের পৃথিবীতে ফিরে আসবেই! বলে মাস্টারমশাই ঠোঁট টিপে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিলেন, বেশ কাল আমি তোরে সাথে করে নে ফিরব। স্টেশানে ওয়েট করিস।

সুবোধ আজ দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনে নেমে লাইন ক্রস করে উল্টোপাড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ইচ্ছে যে খুব ছিল এমন নয়। তবে কাল কী এক অবোধ্য আকর্ষণ যে ছিল মাস্টারমশায়ের কথায়! কেমন যেন ধোঁয়ার চাক লেগে গেছিল মাথার মধ্যে।

তাছাড়া ভয়ও করছে। ও কুকুরগুলোর যা হাবভাব, ভূত হোক, শরীর হোক বা আত্মাটাত্মা যাই হোক, ঘ্যাঁক করে যখন তখন কামড়ে দিতেই পারে। ফাঁকা রাস্তায় ফিরতেই যখন হবে, তখন দুজনে ফিরলে ক্ষতি কী!

আজ সারাদিন ফ্যানের কয়েল পাকাতে পাকাতে সে নিজের সঙ্গে মনে মনে তর্ক করেছে, আর অস্বীকার করেছে। ভূত বলে কিছু হয় না, আত্মা বলে সত্যি কিছু আছে কিনা তাই বা নিশ্চিত করে কে বলেছে? কিন্তু ফেরার সময় ট্রেনের হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে শুধুই মনে হচ্ছিল, মাস্টারমশাই বলে কথা! তার মুখের বাক্য একেবারে কি ভুল হবে? একটা ব্যপার শুধু পরিস্কার হচ্ছে না। কাল কার ফিরে আসার কথা বললেন মাস্টারমশাই? মহাশূন্যে এতদিন পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল, সে কে?

ভাবতে ভাবতেই দুবার ক্রিং ক্রিং শোনা গেল।

—এসে পড়েছিস! নে চল। দাঁড়া দিকি, আগে এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে নে আসি গে।

বিস্কুটের প্যাকেট কিনে মাস্টারমশায় ফেরার পথ ধরলেন। পাশে পাশে সুবোধ।

—এই অ্যাতোখানি দূর আপনি সাইকেল হাঁটিয়ে নে যাবেন মাস্টার মশাই? আপনি পেছনে বসে যান, আমি ডবল ক্যারি করতি পারি।

—না রে ক্ষ্যাপা তা নয়। আমি হাঁটা দিচ্ছি কি আর এমনি নাকি? সভ্যতার বিপরীতে হাঁটতে লেগেছি আমরা, উজানে হাঁটতে লেগেছি। তুই বুঝছিস না কিছু? হাওয়ার গতিকটা একবার ভালো করে বোঝ! এসময় যা খুশি ঘটে যেতে পারে।

চমকাল সুবোধ। ঠান্ডাটা একটু বেশি লাগছে বটে! কী জানি আর কিছু তো মালুম হচ্ছে না! জাম্পারের চেনটা টেনে কলার তুলে গলা অবধি বেশ করে কাপটি এঁটে নিল সুবোধ। আজ মাফলার নেই।

—মাফলারটা সকালে খুঁজেছিলি নাকি?

—হাঁ মাস্টারমশায়, যাওয়ার পথে গোটা রাস্তাটা খুঁজলাম। পেলাম না।

—পাবি কি করে? ও জিনিস যেখানে যে নে যাওয়ার সঙ্গে করে নে গেছে...এই নে, বিস্কুটের প্যাকেটটা ছেঁড় দিকি, এবার আমরা কোণাকুণি বাঁক নেবো, আর কিছু পরেই তো খেলার মাঠ আর তোর সেই গলিটা!

সুবোধ তৈরি। ঠান্ডা হাওয়া খেজুর পাতায় খসর্ খসর্ আওয়াজ তুলেছে। শুক্লপক্ষ। চাঁদের কোণা একটু ভাঙলেও জোৎস্না ঠিক কালকের মতোই। পা টিপে টিপে আর একটু হাঁটার পরেই মাঠের কাছে দেখা গেল সেই সাদা কালো কুবুরটাকে। চাঁদের পানে মুখ তুলে ডাকবে ডাকবে করছে।

সুবোধ বিস্কুটের কোণা ভাঙল। হাত চাপলেন মাস্টারমশাই।

—এখুনই নয়। আগে কাছে আসতে দে।

এল। সবুজ চিকমিকি চোখ তুলে তাকাল বারদুয়েক। চরকির মতো চারপাশে ঘুরে ঘুরে দুটো মানুষকে শুঁকল খানিক্ষণ। মাস্টারমশায় বললেন, দে, এইবেলা দে। যদি তোর হাতে খায়...

সুবোধ খুব ভয়ে ভয়ে বিস্কুটের টুকরো ছুঁড়ে দেয়। সাদাকালো কুকুর মুখ নিচু করে বিস্কুটটার এপাশ ওপাশ শোঁকে, কিন্তু খায় না। মুখ ঘুরিয়ে হেঁটে চলে মাঠের দিকে। কুয়াশায় মিশে যায়।

মাস্টার মশাই উত্তেজনায় দুহাত তুলে সমানে চেঁচান, লাইকা! যাসনি রে, লাইকা, একবারটি শোন...

সুবোধ হকচকিয়ে গেল।

—কী হল মাস্টারমশাই? ও খেল না যে!

মাস্টার মশাই সাইকেলের হাতলটা শক্ত করে ধরে নিঃশ্বাস ফেললেন।

—খাবে কী করে? মানুষের ওপর অবিশ্বাস ওর এখনো যায়নি যে! আমি ঠিক চিনেছি সুবোধ, ও যে সে কুকুর নয় রে! আমাদের লাইকা। মৃত লাইকা।

—লাইকা! লাইকা কে?

মাস্টারমশাই চোখ পাকালেন।

—গর্দভ! অ্যাতো করে পড়িয়েছি তোদের। লাইকাকে ভুলে গেলি! প্রথম প্রাণী, মানুষ যাকে মহাকাশ অভিযানে পাঠিয়েছিল।

হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে। সুবোধ ছেলেবেলার মতোই মাথা নাড়ে। রাশিয়া থেকে পাঠানো সেই মহাকাশ যান।

—হায় রে সভ্যতা! নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারই করল শুধু ওকে!

মাস্টারমশায়ের চোখ ছল্ ছল্ করছে।

—চলুন মাস্টারমশাই, আমরা ফিরি।

অন্যদুটো কুকুর শুয়ে ছিল আজ একটু দূরে দূরে। ওদের দেখে উঠে দাঁড়াল। সুবোধ কিছু না বলে বিস্কুট ভেঙে দিল মুখের সামনে। ওরাও চুপচাপ খেয়ে নিল।

—লাইকা তাহলে কি সত্যিই আমাদের হাতে খাবে না মাস্টারমশাই?

মাস্টারমশাই হাত রাখলেন সুবোধের পিঠে। একটু হাসলেন।

—তোর কাছে মাফলার তো নিয়েছে। কাল দেখিস চেষ্টা করে, যদি খাওয়াতে পারিস!

বড়ো ইচ্ছা হয় সুবোধের একটিবার মাস্টার মশাইকে কথাটা বলে। ইচ্ছেটা সেই ইস্কুলবেলা থেকেই পুষে রাখা আছে। অন্য ছাত্ররা সব

বলাবলি করত, ‘ জানিস, মাস্টারমশায়ের বাড়িতে একখানা ইয়াব্বড় টেলিস্কোপ আচে!’ সত্যি মিথ্যা কে আর জানতে চায়। তবে সুবোধ বিশ্বাস করত।

কালোবোর্ডে সাদা চকখড়ি দাগিয়ে দাগিয়ে কক্ষপথ আঁকতেন মাস্টারমশায়। সূর্য, বুধ, শুক্র আরও কত কী! মনে হত কাল রাতেই বুঝি ঘরে লুকোনো টেলিস্কোপ দিয়ে সবটা দেখে এসেছেন। সুবোধের এখনও ইচ্ছা হয় বলে, একটিবার আপনার সেই টেলিস্কোপটা দেখাবেন মাস্টারমশাই!

লজ্জা লাগে, বলতে পারে না।

পরেরদিন রোববার ছিল। মাস্টারমশাই তাই সঙ্গে ফেরেননি। সুবোধ একাই ফিরল। হাতে বিস্কুটের ছেঁড়া প্যাকেট। ভয় ভয় একটু করছে। তবে তার চেয়েও আশ্চর্য লাগছে বেশি। ভয় কুকুরকে নয়, মৃত লাইকার আত্মাকে। রেগে আছে, গুমরে আছে। যদি কামড়ে ছিঁড়ে দেয়! মানুষের প্রতি ওর রাগ কেন? মানুষ তো আমাদের সবার ভালোর জন্যেই ওকে পাঠিয়েছিল মহাকাশে। সেটা যদি একবার ওকে বোঝানো যায়, নিশ্চয়ই ওর আর রাগ থাকবে না। ওর আত্মা মুক্তি পাবে।

তাই সাহসে ভর করে সুবোধ আজ একাই নেমে পড়ল মাঠে। আস্তে আস্তে ডাকল, লাইকা!

সুবোধের সেই ডাক কুয়াশায় ভিজে মাঠের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে মিশে গেল আকাশে।

রাস্তায় দেখা দিল পরিচিত সেই সাদাকালো কুকুর। কান খাড়া করে, জিভ বার করে দাঁড়িয়ে ।

—এই তো লাইকা, তুই এখানে? আমি যে কতক্ষণ ধরে ডাক পাড়ছি? সুবোধ আলতো করে হাত বুলিয়ে দিল ওর মাথায়। লাইকা কিছু বলল না। চোখ বুঁজে সোহাগির মতো সুড়সুড়ি খেল মাথা নিচু করে।

—রাগ করে থাকিস না লাইকা, নে বিস্কুট খা।

সুবোধ বিস্কুট দেয়। লাইকা একটু কুঁই কুঁই করে। নেড়ে চেড়ে, মুখ ঘোরায়। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও খেয়ে নেয় বিস্কুটের টুকরোটা।

সুবোধের চোখ আনন্দে চকচক করে ওঠে। সে দিকবিদিক হারিয়ে ছুট লাগায় মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। কি যেন এক মহান কাজ সে করেছে, খবরটা ওনাকে আজ না দিলেই নয়।

মাস্টারমশাই ঘরেই ছিলেন। ছেলেমেয়েদের ক্লাসটেস্টের খাতা দেখছিলেন বসে। সুবোধকে দেখেই হাঁক পাড়লেন ভেতরে, হাঁ গো শুনলে! ছাত্তর এসচে আমার। গরম জল বেশি করে নিও এক কাপ।

মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী একবাটি মুড়ি রেখে গেলেন।

—লাইকা খেয়েচে মাস্টারমশাই।

—বাঃ, এযে খুশির খবর রে?

—কিন্তু ওর এত রাগ কেন মাস্টারমশায়! আর আপনি যে বললেন ওর আত্মা, সে এখেনে ফিরে এল কী করে?

মাস্টারমশাই বললেন, রাগ নয় রে, অভিমান। বড়ো কষ্ট পেয়েছিল কিনা! সেসব কি আর ইতিহাসে লেখে? অনেক দূরদৃষ্টি রেখে সেসব জানতে হয়। ও প্রথমদিন তোরে রাস্তা আটকে কামড়াতে যায়নি, আসলে ভাব জমাতে চেয়েছিল। নে মুড়ি খা।

—হ্যাঁ খাচ্ছি, আপনে বলেন।

—সেই ১৯৫৭ সাল, বুঝলি? সেবার মস্কোর বিজ্ঞানীরা যে কাণ্ডটা করল সে তো তোদের জানা। স্পুটনিক ১ ছাড়ল মহাকাশে। ওটা সফল হবার পর ওরা নিশ্চিত হল, দ্বিতীয় পরীক্ষাটা করে দেখা যেতে পারে; অর্থাৎ কিনা জীবন্ত কোনো প্রাণী। মাত্র চার সপ্তাহে বানিয়ে ফেলল নতুন আর একটা মহাকাশযান। বলতো দিকি অত তাড়া কিসের? আচ্ছা সে নয় হল। কিন্তু কাকে পাঠাবে? ঠিক করাই ছিল একটা কুকুর। সে বেচারি নিজের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল রাস্তায়। কিচ্ছু জানতই না। ধরে বেঁধে তাকে নিয়ে গেল বিজ্ঞানীদের দল। তারপর সে কি ট্রেনিং! দেখলি না কেমন বেঁটে বেঁটে গড়ন! হবেই তো, কুড়িদিন ধরে একটা ছোট্ট খাঁচায় বন্দী করে রেখেছিল তাকে। স্পেসশিপটাও ছোটো ছিল কিনা, যাতে অভ্যেস হয়ে যায়। উফ্ কি যন্ত্রণা, ও বেচারি কিছুই বুঝছে না কেন ওকে অমন করে রাখা হচ্চে।

তবে বিজ্ঞানীদের একজন খানিকটা বুঝেছিল। ও যে আর ফিরে আসবে না, সেটা সে জানত। তাই দুদিন নিয়ে গিয়ে রেখেছিল নিজের বাড়ি। খাইয়ে দাইয়ে, খেলাধুলো করিয়ে শুতে দিয়েছিল আরাম করে। লাইকা বেঁচে থাকতে ওই দুদিনই যা একটু সুখ পেয়েছে। এখনো বুঝি রয়ে গেছে সেই অভ্যেসটা, দেখলি না কেমন করে তোর মাফলারটা সেদিন ছিনিয়ে নিল!

সুবোধ একগাল মুড়ি মুখে পুরে ঘাড় নাড়ল।

—হাঁহাঁ, ঠিক বটে ।

—তারপর আর কি, এসে গেল সেই দিন! মহাবিশ্বের প্রাণ একলা নিয়ে স্পুটনিক ২ ছাড়ল মহাকাশে। ছোট্ট একটু খাঁচার মধ্যে চেনবাঁধা লাইকা। তাতে ছিল ওর সাতদিন বেঁচে থাকবার মতো খাবার, অক্সিজেন জেনারেটার আর কার্বনডাই অক্সাইড অ্যাবসরভার, আর পেচ্ছাপ পায়খানা জমিয়ে রাখার একটা ব্যাগ। মানে কিনা, বিজ্ঞানীরা নিছক এটাই দেখতে চাইছিল মহাকাশে গিয়েও কোনো প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব কিনা, সেই মহাকাশযান এমনিই ফিরত না, কেননা ফিরে আসার প্রযুক্তি তখনো অবধি আবিষ্কার হয়নি...কিন্তু মাঝখানেই ঘটে গেল অঘটন। বেচারি লাইকা অপঘাতে মরল...

—চা যে জুড়িয়ে গেল গো! ভেতর থেকে চেঁচালেন মাস্টারমশায়ের স্ত্রী। কথা বলার টানে হাঁকপাক করছিলেন মাস্টারমশাই। সুবোধও হাঁ হয়ে শুনছিল। হঠাৎ সচকিত হয়ে ঠান্ডা চায়ের সবটাই একচুমুকে টেনে বলল, আজ যাই মাস্টারমশাই, অনেক রাত হল।

উঠে দাঁড়িয়েও লজ্জা লজ্জা মুখে হাতে হাত ঘষে সুবোধ। আমতা আমতা করে।

—ইয়ে, মানে আমার মেয়ে টুনি। ওরে প্রাইমারি ইস্কুলে দিয়েছি মাস্টারমশাই।

—হাঁ সে কি! তুই এরি মধ্যে বিয়েও করে ফেলেচিস? মেয়েও করে ফেলেচিস? বলিস কিরে?

—হে হে, লজ্জা লাগে তাই বলিনি। মেয়েটা লেখাপড়ায় ভালোই, আমার মতন নয়। খালি বলে বড়ো হলে অ্যাস্ট্রোনট হব। এট্টা দূরবীন কিনে দিয়েছি, খালি সেটা নিয়ে চারপানে কুটুর কুটুর দ্যাখে, আর অবাক

করা সব কথা বলে। আপনি তো ইস্কুলে আচেন, মেয়েটারে এট্টু দেখবেন মাস্টারমশাই। ফোর কেলাসে থার্ড বেঞ্চিতে বসে। ফর্সা হয়েচে মায়ের মতো। কোঁকড়া মতন চাউমিন চাউমিন চুল..হাঁ, ওইটেই আমার মেয়ে।

মাস্টারমশাই জ্বলজ্বলে চোখে বেশ খুশি খুশি তাকান।

—বেশ, বেশ।

সুবোধের টেলিস্কোপ দেখবার ইচ্ছেটা সেদিনও আর বলা হল না।

এখন আর ফাঁকা রাস্তায় কুকুর দেখলে ভয় করে না সুবোধের। সে জেনে গেছে লাইকা মৃত কোনো আত্মা বা ভূত নয়, আসলে জীবিত প্রাণী। মানুষের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল, মানুষের সঙ্গেই থাকতে চায়। ফেরার পথে মাঝেমধ্যেই আজকাল সুবোধ অপেক্ষা করে। মাস্টারমশাই আগে এলেও সুবোধের জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন অনেকক্ষণ। স্টেশানের গা লাগোয়া দোকান থেকে দু তিন প্যাকেট নানারকম বিস্কুট কিনে তারপর অন্যসব কথা।

মাঠের কাছে, ঠিক সময়মতো অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে লাইকা। এখন ওর অনেক সঙ্গী সাথি জুটিয়ে নিয়েছে। আগের দুটো তো ছিলই। এখন চন্ডীতলা মোড় থেকে লাল বাঘা, কানকাটা এরকম সব ডাকসাইটে কুকুরগুলোও সঙ্গ নিয়েছে। নামগুলো অবশ্য মাস্টারমশায়ের দেওয়া। উনি ইস্কুলেও ছাত্র ছাত্রীদের নানারকম নাম দিতেন। আর যাওয়া আসার পথে কুকুর দেখলেই বিস্কুট খাওয়ানো সুবোধের এখন রোজকার ব্যাপার।

সুবোধের বউ মালা মেয়ে টুনির ছোটো হয়ে যাওয়া ফ্রক কেটে সেলাই করে সুন্দর একটা জামা বানিয়ে দিয়েছে লাইকার জন্য। আগেরদিন সুবোধ সেটা জোর করে ধরে পরিয়ে দিয়েছে লাইকাকে। আজ ফেরার পথে মাস্টারমশাইকে দেখাতেই হবে কেমন সুন্দর লাগছে লাইকাকে। তবে ফেরা অবধি গায়ে থাকলে হয়। দাঁত দিয়ে যেরকম টানাটানি করে!

সেদিন মাস্টার মশাই দুঃখ করে বলেছিলেন লাইকা বড়ো কষ্ট পেয়ে মরেছিল। পরে জেনেছিল সুবোধ। হ্যাঁ, সত্যিই সেটা ছিল অপমৃত্যু। বিজ্ঞানীদের একটু ভুলে লাইকার মহাকাশযানের একটা অংশ জ্বলন্ত রকেট থেকে আলাদা হতে পারেনি। তিনঘন্টার মধ্যেই ওর খাঁচায় বেড়ে গিয়েছিল সাংঘাতিক উত্তাপ। গরমে ঝলসে ছটফট করতে করতে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তার। বেরিয়ে আসতে চাইছিল মানুষের এই অস্বস্তিকর অভিযান থেকে। যানটি সম্পূর্ণ দিকবিদিক হারানোয় সিগন্যাল আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পাঁচঘন্টা পর।

তারপরেও টানা একশো বাষট্টি দিন প্রায় ২৫৭০ বার মহাকাশ যানটি পাক খেয়ে চলেছে পৃথিবীর চারপাশে। ফিরে আসতে চাইছিল লাইকা....তার নিজের পৃথিবীতে।

মাঠের কাছে এসে আঙুল তুলল সুবোধ।

—মাস্টারমশাই দেখেছেন? কেমন সুন্দর মানিয়েছে!

মেয়ের ফ্রক দিয়ে তৈরি জামাটা দারুণ ফিট করেছে লাইকার গায়ে। ছেঁড়া তো দূর, পড়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন ল্যাজ নাড়ছে, বিস্কুটের আব্দার। লাইকাকে চারপাশে ঘিরে ওর মস্তবড়ো কুকুর গ্যাঙ। প্রত্যেকের একটাই চাহিদা, একটু খাবার। আর একটু আশ্রয়। তবে ইদানিং এলাকার বেশকিছু লোক ব্যাপারটা ভালো চোখে নিচ্ছিল না। যেতে আসতে কূট কচালি মন্তব্য ছিটকে আসছিল কানে। 'কিছু লোকের শালা কুত্তার ওপর পিরীত বেশই', 'নিজের জোটে না কুত্তাকে কাপড় পড়ায়' এসব নানারকম। গায়ে মাখে না সুবোধ। বেঁচে থাকতে লাইকার আত্মাকে কোনোরকম কষ্ট পেতে দেবে না সে।

টুনির সঙ্গে একটা ব্যাপারে ঝগড়া লাগে প্রায়। গলায় বায়ানোক্যুলার ঝুলিয়ে বারবার বলবে টেলিস্কোপ। সুবোধ যত বলে, নারে পাগলি ওটে টেলিস্কোপ না, দূরবীন, মেয়ে ততই তেরিয়া।

—বাপি, তুমি কিচ্ছু জানো না, এটা টেলিস্কোপ। মাস্টারমশাই বলেছে আমি ছোটো তাই ছোটো দূরবীন। বড়ো হলে আরও ভালো করে অঙ্ক কষতে শিখে গেলে এটাই হয়ে যাবে বড়ো দূরবীন, টেলিস্কোপ।

—কিন্তু টেলিস্কোপ দিয়ে যে আরও অনেক দূর দেখা যায় রে মা!

—না, মাস্টারমশাই বলেছে চেষ্টা করলে এটা দিয়েও আমরা অনেক দূরের জিনিস দেখতে পারি।

সুবোধ হেসে ফেলে।

—আচ্ছা রে, হার মানলাম! আচ্ছা টুনি, তোরে মাস্টারমশাই দেখিয়েচেন নাকি ওনার টেলিস্কোপটা? দেখেচিস বুঝি তুই?

—না, বড়ো হলে দেখাবে বলেছে, তুমি যাও তো বাপি! আমি এখুন পাখি দেখছি।

আজও রোজকার মতোই টুনি ওদের বারান্দা থেকে দূরে গাছগুলোর দিকে বায়ানোক্যুলার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাখি দেখছিল। অলোক পাড়ুইয়ের ছোটো ছেলেটা, টুনিরই বয়েসী, হাতে লাট্টু পাকাতে পাকাতে ছুটে এসে খবর দিল, চন্ডীতলার কাছে কুকুর আর মানুষ মারামারি করতে লেগেচে গো সুবোধ কাকা! হেব্বি ভিড়। গাঁয়ের লোকজন সব কাজ ফেলি সেদিক পানে ছুটতেচে!

সুবোধ তড়াক করে রাস্তায় নেমে এল।

—বলিস কিরে? চল তো দেখি গে।

—আমিও যাব বাপি।

টুনিও চলল সঙ্গে। গলায় ঝুলছে বায়নোক্যুলার। দেখাদেখি আরও কিছু বাচ্চা ওদের সঙ্গ নিল পঙ্গপালের মতো। মুদির দোকানের কাছে এসে হাঁক পাড়ল সুবোধ—ভ্যানের চাবিটা দে দিকি চট্ করে! পারিস তো তোর ছোটো ভাইটারে সঙ্গে পাঠা, ভ্যান নিয়ে যাবে মাস্টারমশায়ের বাড়ি। তেনাকে তুলে সোজা চন্ডীতলা যেতে বলবি, রেলগেটের কাছে...

ওদের এলাকা থেকে চন্ডীতলা মিনিট দশেক লাগে। রাস্তার মাঝামাঝি যেতে না যেতেই ভ্যানটা ওদের ধরে ফেলল। ভ্যানে বসে মাস্টারমশাই। ওনাকে অস্থির দেখাচ্ছে।

—ব্যাপারখানা কিরে সুবোধ?

—জানি না মাস্টারমশায়! কিচুই যে ঠাওর হয় না!

—আয় দিকি, ভ্যানে উঠি যা সব! আয় রে মা টুনি!

জোরসে পা চালিয়ে রিক্সাভ্যানটা চন্ডীতলা থামতে না থামতেই বড়োসড়ো একটা ভিড়ের মুখে আটকাল। রেললাইনের পাশের রাস্তা

ঘেঁষে প্রচুর দোকানপাট এদিকটায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আনাজপাতি নিয়েও বসে যায় কেউ কেউ। লোকজন, হৈ হল্লা, সাইকেল রিক্সা মিলিয়ে জায়গাটা এমনিতেই থাকে জমজমাট। আজ যেন সবদিক থেকে সবকটা মেয়ে মরদ বাচ্চা মিলে ডবল ভিড় জমিয়ে তুলেছে। চারদিক থেকে বাউন্ডারির মতো গোল করে ঘিরে রয়েছে ভিড়। মধ্যিখানে তুমুল দাপাদাপি...লাঠি বাঁশ নাবছে উঠছে দমাদ্দম! চিৎকার চেল্লামেল্লি ঘেউ ঘেউ কুঁই কুঁই মিলেমিশে বীভৎস এক আওয়াজের কোরাস তুলেছে যেন! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

অলোক পাড়ুইয়ের ছোটো ছেলেটা ফট্ করে ভ্যানের ওপর পা উঁচিয়ে দাঁড়ায়। মুখ বাড়িয়ে দেখেটেখে বলে, কুকুরগুলোরে পিটতেচে গো! আর থাকা যায় না। নেমে গিয়ে ভিড় ঠেলে ঠুলে ঢুকে পড়েন মাস্টার মশাই। পাশে সুবোধ, টুনির হাত ধরা। প্রথমটা নির্বাক সবাই। এসব কী চলছে? ভয়ানক দৃশ্য। প্রায় জনাদশেক লোক মিলে কুকুরগুলোকে অ্যাটাক করেছে। লাঠি, কঞ্চি, বাঁশ, বড়ো বড়ো লোহার ছান্তা খুন্তি যে যা পেরেছে হাতে নিয়ে একজোট হয়েছে। এন্তারসে পাগলের মতো কুকুরগুলোকে পিটিয়ে চলেছে সমানে! লাল বাঘার পিঠ ফেটে রক্ত ঝরছে। কানকাটার চোখের ওপরটা চাপ চাপ লাল। আরও দুটো তাগড়াই কুকুর মারের ঘায়ে লুটিয়ে শুয়ে পড়েছে রাস্তায়। আর ওদের পেছনে ল্যাজ গুটিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে লাইকা। পরণের ফ্রকটা ছিঁড়ে গা থেকে ঝুলছে। কানদুটো ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে, ভয়ে, চোখ বুঁজে হাঁটু মুড়ে গুটিসুটি মেরে পিছোবার চেষ্টা করছে ক্রমশ...

—এ নিধনযজ্ঞ থামা এক্ষুণি! আমি বলতেছি লাঠি নামা শিগগির!

দুহাত তুলে ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মাস্টারমশাই।

—তোরা কি জ্ঞানকাণ্ড হারিয়ে অমানুষ হয়ে গেলি?

ষণ্ডামার্কা লোকটা স্থানীয় রিক্সা ইউনিয়নের পাণ্ডা গোছের কেউ। ওর হাতে মোটা একটা বাঁশ। আঙুল তুলে বলল, আপনে পুরানো যুগের মানুষ মাস্টারমশায়। আপনারে মান্যিগণ্যি করি। এসবের মধ্যে নাক গলাতে আসবেননি। চলি যান!

আরেকজন কানাই। ওর খাবারের দোকান। পরোটা ভাজার তৈলাক্ত খুন্তি ওর হাতে। চেঁচাল, হাঁ, ল্যায্য কথা। বহুত বাড় বেড়েচে কুত্তাগুলো। হেগে মুতে ছড়িয়ে রাখতেচে চতুর্দিক! দোকানে খদ্দের আসা দায়। দেখলেই তেড়ে মেরে আসে।

লোকটাকে সায় দিল এলাকার আশপাশের কিছু লোক। হুঁ, আজ সক্কালেই তো তেড়ে গেল! কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে যেতে আসতে হয়নে নাকি আমাদের! আপনেরা কি আর বুঝবেন, ওপাড়ার লোক! আদিখ্যেতা দেখাতে এয়েচেন!

মাস্টারমশাই বোঝাতে চান, ওরে পাগল ভুল জানিস। তেড়ে গেলেই বুঝি ওরা কামড়ায়? না রে নয়, শোন কথাগুলি একবার...

রেরে করে ওঠে সবাই।

—মশায় আপনি হাটেন তো! ধাক্কা মারে কেউ। পুরনো যুগের মানুষ। পিছিয়ে যান। চশমাটা ছিটকে পড়ে মাটিতে। খুঁজতে গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়েন রাস্তায়। মনে হয় যেন চারপায়ে হাঁটছেন মানুষটা। ওদিকে আবার এলোপাথাড়ি লাঠি চলতে শুরু করেছে দপাদপ্! সপাসপ্!

সুবোধ এতক্ষণ কাঠ হয়ে দেখছিল লাইকাকে। ভিড়ের কুটকচালির মধ্যে একটু খানি ফাঁক পেয়ে লাইকা গুটি গুটি সরে পড়তে চাইছে। ঠ্যাং ভেঙে গেছে ওর। ভিড় থেকে বেরিয়ে উঁচু জমিটা পেরিয়ে ঘষটে ঘষটে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে চলে যাচ্ছে রেললাইনের দিকে।

—লাইকা চলি যাচ্ছে মাস্টারমশায়! আমি ওরে মরতে দেব না।

বিড়বিড় করতে করতেই মেয়ের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ল সুবোধ । দৌড়ল লাইকাকে লক্ষ্য করে । রেললাইনের দিকে।

যাসনি সুবোধ, দাঁড়া! লাইনে ট্রেন আচে.. সুবোধ! ট্রেন!...

সুবোধের কানে কিছু পৌঁছয় না। পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে সামনে হাত তুলে সমানে চেঁচাচ্ছে

—ফিরে আয় লাইকা! লাইনে ট্রেন আছে! যাসনি, দাঁড়িয়ে পড়! কেউ তোরে মারবে না! ফিরে আয়, লাই কা-আ...

শব্দগুলো হাওয়ায় ছিটকে ছড়িয়ে যায়। হুড়মুড় করে এসে পড়ে ট্রেন। ঝিকির ঝিকির করে পেরিয়ে যায় চোখের নিমেষে। সোজা গিয়ে সুভাষগ্রামে থামবে।

মধ্যিখানের রেললাইনটা খাঁখাঁ করছে এখন। কোথায় সুবোধ? লাইকা গেল কই? ভিড়ের মধ্যেও ঝুপ করে নেমে এসেছে নীরবতা। লাঠি সোটা ফেলে ভিড় এগিয়ে চলেছে রেললাইন লক্ষ্য করে।

বাপিকে দেখা যাচ্ছে না কেন মাস্টারমশাই? টুনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। মাস্টার মশাই উত্তর দিতে পারেন না। চোখের সামনে সব ঝাপ্সা।

—চলো মাস্টারমশাই, খুঁজবে চলো। আমার কাছে টেলিস্কোপ আছে। বাপিকে ঠিক খুঁজে আনব, চলো... টুনি হাত ধরে টানছে। মাস্টারমশাই ওর হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। রেললাইনের দুপাড় ঘেঁষে জমে গেছে সারি সারি লোক। উঁকি ঝুঁকি মেরে লাইনের খাঁজে খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের চোখ।

স্টেশানে রিলের মতো একটানা অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু হয়েছে।

চোখে বায়ানোক্যুলার ঠেঁসে আঙুল তুলে টুনি হঠাৎ বলে উঠল, ওই তো, ওই যে বাপি! দ্যাখো মাস্টারমশাই দ্যাখো!

ছোট্ট মেয়ের মন ভোলাতে মাস্টারমশাই এমনিই বায়নোক্যুলারটি নেন। নিয়ে মিছিমিছিই চোখে ঠেকাতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যান ! টুনির ছোট্ট দূরবীনটা সত্যিই কখন যেন টেলিস্কোপ হয়ে গেছে।

দেখা যাচ্ছে অনেক দূর...রেললাইন দুটো সোজা গিয়ে যে পাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে...সেখানেই মেঘের গা ফুঁড়ে আকাশের দিকে হেঁটে চলে যাচ্ছে একটা মানুষ, আর একটা কুকুর...হাঁটতে হাঁটতে ওরা মিলিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে...

STALLONE
RAMBO
YES
BEATLES
JAWS
BLACK SABBATH
JOKER

বুক সাহিত্য

তরুণ চক্রবর্তী

বুক সাহিত্য! ইংরেজির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না। নিখাদ দুটি বাংলা শব্দের যুগল। বুক এবং সাহিত্য। অণু সাহিত্যের সহোদর।

বুক। মানে বক্ষ। ইংরেজিতে যাকে আমরা চেস্ট বলে পরিচিত। এই বক্ষের ওপরে সাহিত্য। স্কুলের পাঠ্যবইয়ে ভাব সম্প্রসারণ করার স্মৃতি নিজে থেকেই প্রশ্ন তুলছে, এখানে বুক বলতে কী বোঝানো হয়েছে? জবাবে বলতে হয়, এখানে বুক বলতে, বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে, বুক ঢেকে রাখার বস্ত্র বিশেষের কথা। অর্থাৎ ভিনদেশীয় ভাষায় টিশার্ট। নারীপুরুষ নির্বিশেষে বাঙালির তারুণ্যের সঙ্গী রং-বেরঙের টিশার্টই আমাদের এই আলোচনায় বুকের প্রতিনিধি। হৃদয় ঢেকে থাকা বুকবস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই সাহিত্যের প্রয়োজন। সেখান থেকেই বুক সাহিত্য।

বুকের ওপর শোভিত অক্ষরের বিন্যাস কি আদৌ সাহিত্য? সেই প্রশ্নের জবাব খোঁজার আগে জেনে নিই, সাহিত্য কী? ভরসা সেই সবজান্তা উইকিপিডিয়া, প্রযত্নে জ্ঞানেশ্বর গুগলস। তিনি জানালেন, ‘সাহিত্য শিল্পের একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়, অথবা এমন কোনো লেখনী, যেখানে শিল্পের বা বুদ্ধিমত্তার আঁচ পাওয়া যায়, অথবা যা বিশেষ

বন্ধু চল
বলটা দে
রাখবো হাত তোর
কাঁধে

কোনো প্রকারে সাধারণ লেখনী থেকে আলাদা। মোটকথা, ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে সাহিত্য।' সাহিত্য বিষয়টি কী বিষমবস্তু সেটি নিশ্চিত হওয়া গেল নিশ্চয়।

বুক সাহিত্যে ঢোকার আগে আসুন একবার উঁকি মেরে আসি তার সহোদর 'অণু সাহিত্য'-এর দুনিয়ায়। মুঠোফোনের হাতধরে অণু বাক্যেই সাহিত্য-চর্চা বঙ্গদেশে বেশ জমজমাট। ১০০ শব্দের গল্প বা প্রবন্ধ নিয়ে ওপারে তো বই প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত। নিন্দুকেরা অসামাজিক বললেও সামাজিক গণমাধ্যমে একটি মাত্র শব্দকে ব্রহ্মজ্ঞানে গল্পও নাকি লেখা হচ্ছে! সাহিত্য তো জীবনের অনুভূতি, তাই কিছুই বলার নেই। যার যা খুশি তিনি তাই করবেন, পড়বেনও। তা বলে ইচ্ছা মতো পরবেনও?

গণতান্ত্রিক অধিকার। পড়া এবং পরা। তাই পোশাক নিয়ে কোনো কথা বলা চলবে না। শিক্ষিকা বিকিনি পরতেই পারেন, ছাত্রী শাড়ি। কপালের লিখন বিধাতার কাজ, দেওয়াল লিখন নেতাদের। কিন্তু আমার বুকে আমি কী লিখব, সে অধিকার আমার। মেনে নিলাম পড়বেন আপনি, কিন্তু পরব আমি। ইচ্ছা হলে পড়ুন, নইলে ফুটুন। দেখতে আপনাকে হবেই। নারী হলে তো কথাই নেই, আমার বুক দেখার ইচ্ছা না হলেও সাহিত্য তো দেখতেই হবে! তার জন্যইব তো খরচা আছে। মুখ ঢাকতেই পারে বিজ্ঞাপনে, বুক কিন্তু ঢাকা সাহিত্যে! আর, সাহিত্যের কী বহর!

বহুকাল আগেই তো লেখা হয়েছিল, 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা!' কিন্তু করোনাকালে, গোঁফ দেখবেন কী করে, সেটি তো অণুমুখোশে ঢাকা। মাস্কই তো বঙ্গজীবনে মাস্ট হয়ে বসে রয়েছে অষ্টপ্রহর! গোঁফের মতো ঠোঁটের দেখা নাইরে, ঠোঁটের দেখা নাই! ফলে রমণীর ঠোঁটের সৌন্দর্যায়নও এখন অযত্নে লালিত। এবং অশোভিত।

সাহিত্য তো আগেই ঠাঁই নিয়েছিল বই থেকে মুঠোফোনে। অণু থেকে পরমাণু! চলছে ঘরে ঘরে সাহিত্যচর্চা এবং ছবি তোলার পারদর্শীতার অণু-প্রতিযোগিতা। সামাজিক গণমাধ্যমে প্রতিভার বিচ্ছুরণ তো রয়েইছে, আরও অণু পরিসরে উঠে আসছে সাহিত্য। নিত্যনতুন চর্চা। এ বলে আমায় দ্যাখ, তো ও বলে আমায়। পথে-ঘাটে হরেক

ধুর মশাই
হিন্দি
কি
কেউ
?
সাধে বলে নাকি

প্রতিযোগিতা। বুকে নজর দিতেই হবে। ঙ্কদ্রদ্রদ্ধ দিন দিন জৌলুষ হারালেও বক্ষ মাঝে রাখতেই হচ্ছে সাহিত্যকে। ছেড়ে যাওয়ার রাস্তা নেই।

তাই চোখ মেললেই দেওয়াল পত্রিকার বদলে, ছেলেমেয়েদের বুকেপিঠে ফুটে উঠছে সেই সাহিত্য! বাঙালির টিশার্টের কল্যাণে ‘বুকসাহিত্য’ বেশ জমজমাট। পিঠেও আছে। এপার এবং ওপার দুই বাংলাতেই টিশার্টের সঙ্গেই ছেলে এবং মেয়েদের কাছে ‘বুক এবং পিঠ সাহিত্য’ বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গোটা দুনিয়াতেই অবশ্য বার্তা বহনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে টিশার্টের নরম জমি। রাস্তাঘাটে শোভনীয় ও অশোভনীয়, শালীন ও অশালীন, অর্থবহ এবং অর্থহীন বুক আর পিঠের বাহার চোখে পড়বেই। দৃশ্য দূষণ বা দৃষ্টিনন্দন যে শিরোনামেই নামকরণ হোক না কেন, করোনাকালেও টিশার্ট শোভিত নগর ও গ্রাম জীবনে এটাই বাস্তব ছবি।

‘খেলা হবে’ দেখতে দেখতে হঠাৎ ধর্মতলায় কেসি দাশের সামনে সেদিন চোখ গেল কুচকুচে দাড়িওয়ালা ঝোলাকাঁধে তারুণ্যে ভরপুর এক যুবকের পিঠে। জিন্সের ওপর সাদা টিশার্টে লাল তারার নীচে লেখা, ‘দম রাখো, খেলা ঘুরবে’। সেদিনই কলেজ স্ট্রিটের এক তরুণীর বুকে কালোর ওপর লালহলুদে জ্বলজ্বল করছে, ‘তবে তাই হোক’! কদিন আগে, শোভাবাজারে এক তরুণীর পিঠে লেখা, ‘আমি বাংলায় কথা কই’। আসানসোল শহরে ‘খাঁটি বাঙালি’ রয়েছেন সপ্রতিভ এক তরুণের বুক জুড়ে। আবার বর্ধমানের কিছু যুবকের, ‘চারিদিকে করোনা মাস্ক পরতে ভুলো না’ তো খবরের কাগজের শিরোনামে উঠে এসেছে। বাংলাদেশে অমর একুশের আগে দেখা যায়, ভাষা শহিদদের স্মরণে অসাধারণ কিছু বুক ও পিঠ। কারও বুকে শুধুই ‘অ-আ-ক-খ’, কারও বা পিঠে, ‘আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো’! অথবা, বাংলা নববর্ষে, ‘মনের কথা, মনেই থাক। শুভ নববর্ষ’। এমনকী, করোনাকালে দেখা মিলেছে, তরুণীর বুকে, ‘গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না’। ‘পেটুক’ বাঙালির ‘বর্ণপরিচয়’ থেকে শুরু করে ‘ধুস্ ভাল্লাগে না’, ‘আমার ব্যাপারটা একটু আলাদা’ লেখা থাকে বুকের ওপর ‘মেড ইন বাংলা’।

কলকাতার বুকে ইদানিং প্রায়ই দেখা মেলে, ‘ধোঁয়া তুলসি পাতা’। কোনো অষ্টাদশীর হার্টে গর্জে ওঠে ইংরেজিতে, ‘হার্টব্রেকার’। কেউবা, ‘আই অ্যাম অওসাম’! বুকে স্বচ্ছন্দ ঘোষণা, ‘বি অ্যাস ইউ উইশ টু বি সিন’! কারও বুকে প্রশ্ন বাংলাতেই, ‘খাবি কী’। কেউবা বলতে চান, ‘ইটস নট মি, ইটস ইউ’। হৃদয় থেকে উৎসরিত ইংরেজি বর্ণমালায় শোভিত, ‘সি ও ও এল’ অথবা ‘জি ও এ এল’। আসলে বাঙালির তরুণ বুকে আজ ‘অল আউট অফ লাভ’! ভালোখারাপ যা দেবে অঙ্গে, সবই পাওয়া যায় দুই বঙ্গে! এখনও বাংলা গণমাধ্যমে ছাপার অযোগ্যও কিছু ইংরেজি শব্দও শহরে চোখ মেললে দেখা যায় বুকেপিঠে। তরুণ প্রজন্ম বেপরোয়া; অর্থ বুঝেই হোক বা না বুঝে, ইংরেজি অর্থহীন উন্মাদনার স্মারক এখন আমাদের অমরসঙ্গী হয়ে উঠেছে। পার্টি স্ট্রিটে তরুণীর বুক বাংলাতেই জানান দেয়, ‘আসছে উইকেন্ড আবার খেলা হবে’। আবার শান্তিপুরের কলেজ পড়ুয়ার বুক বলে, ‘নো এন্ট্রি’। তবু টালিগঞ্জে মেট্রোর থেকে বেরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাওয়া তরুণীর পিঠ বলে দেয়, ‘চেয়ে থাকি’।

মুখ ঢাকা মুখোশে, তাই বুক আর পিঠই বলে চলেছে, কিছু কথা। কিছুটা জেনে, কিছুটা না জেনেই। রঙের বাহারে টিশার্ট হয়ে উঠছে কখনও কখনও মুখোশে ঢাকা মুখগুলির মুখছবি। অথবা হারিয়েও যাচ্ছে মুখ বুকে আর পিঠে। সত্যিই কি জরুরি বুক আর পিঠে এমন রচনা, প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু জবাব না দিয়েই ব্যস্ত সময় আরও বেশি করে দেওয়াল লিখন ঠিক করে নিচ্ছে। আসলে তো ‘খেলা শুরু বুক দুরুদুরু’! তাই ‘দেখবি যত,‘জ্বলবি ততো।’ ‘আমরা কারও ধার ধারি না’।

পরছি ‘বুকের এপর’, লিখছি ‘হাত রাখো’, পড়ছি ‘ভুল ভাল’! দেখছি, ‘এটাই ফ্যাশন’! ‘খেলা শেষ’! সাহিত্য মরে বুকসংখ্যার চাপে! খোদ শান্তিনিকেতনে ‘কেলো করেছে!’ ‘ফোট শালা!’ ‘বুকে রাখো হাত’। ‘কেয়া বাত’! ‘হোক কলরব’। কুচ যুগ শোভিত টিশার্ট জানান দিচ্ছে ‘দ্যাখ কেমন লাগে’!

জাহান্নামের রাস্তাটা কোন দিকে?

‘বালাই সিক্সটি!’ বাঙালি তবু থাকো ‘দুধে ভাতে’।

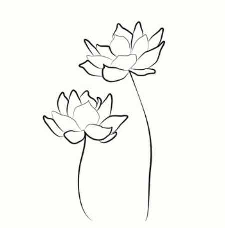

কয়েকটি কবিতা

অ্যাডেওলা ইকুওমোলা

অনুবাদ :মৌমিতা পাল

ভালোবাসা যুদ্ধ

কবরের শোকার্ত ঢেউরা মৃতের পোশাকের
প্রলম্বিত কান্না
বজ্রের ধ্বনি সমাহারের মতো খণ্ডন করেছে
বিদ্যুতের ঋজু পাঠ।

মগ্ন চাঁদের নীচে
তারাদের পুনশ্চ আবরণের মৃত রাতের আকাশে
গহন কথা বনের মতো আমার ভয়ের গুঁড়ো।

শিশিরে সূর্যলিখন, প্রতিকূল ব্যস্ত সময়ের মাঝে
খণ্ড দিন, মূল্যবান মেঘ
আমাকে ক্ষতির ক্ষত থেকে পৃথক করে দেয়।

ভয় উড়ে গেলে স্বপ্নেরা
নিবিড় নক্ষত্র
মুখোমুখি চাঁদ
ভালোবাসা শান্তিপূর্ণ যুদ্ধ
যেখানে
পরাজয়ের লাবণ্যেই জয়।

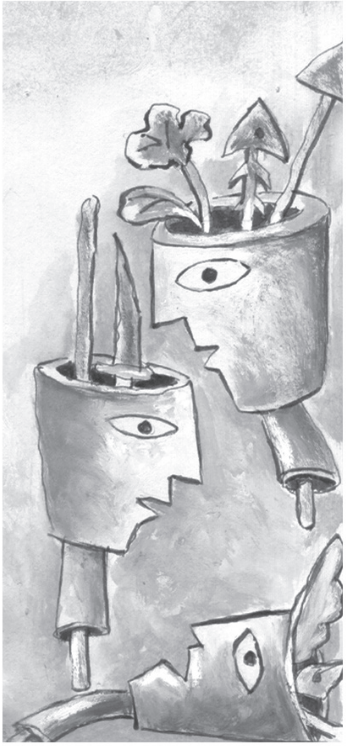

সন্তানের প্রতি

ঘড়ির কাঁটার মতো যত্ন আকাশের ঈগলের মতো
স্বাধীনতা, শ্রেষ্ঠত্বের পর্যাপ্ত শিক্ষা, যথাযথ পুষ্টি
এসবই তোমাকে দেব সন্তান
রাতের পূর্ণচাঁদের মতো ভোরের গোলাপ গন্ধের মতো।

তোমাকে সাজাবো সন্তান রংধনু দিয়ে
তোমাকে উদযাপন করব সিংহ ঈগলের সমিলে।

প্রিয় সন্তান

যেন মূর্তিমান শর্বরীর সুতীব্র চাঁদ আলো
যেন মূর্ত চোখের তারা,
তোমার জন্ম অভিভাবকত্বের ছায়াপথে হারালির দিশ;
তোমার নরম ছাপে সম্পূর্ণ জ্যোতির্ময় আমি
আমার কলম কৃপাণ।
অন্ধকার রাতের বজ্রের মতোই
তোমার আমর্ম জন্মসাধন
সমুদ্রের সঘোষ
সফেন পূর্বাহ্নে।

আমিই, শিশুকন্যা

আমি সেই শিশুকন্যা যার বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল
উড়ান নিশ্চিত আবশ্যিক অন্ধকারকে ফেলে।
আমি সেই সৃষ্টিশীল শিশুকন্যা যার আরোহণ
নিশ্চিত অপবিত্র দৈনিকতার
রাজকীয় ঘোড়ার পিঠে।
প্রাঙ্কতা-জ্ঞান-চেতনার আমিই সেই শিশুকন্যা,
একক সর্যেবীজ
ভরাবে প্রাচুর্যে
আমি সেই প্রতিশ্রুতিশীল
সোনালি চোখ।

নাইজেরিয়ান কবি অ্যাডেওলা ইকুওমোলা। এই নাইজেরিয়ান কবির কবিতার মূল বিষয় মানবিক সংবেদন। বাস্তবতা-পরাবাস্তবতার চলাচলে তাঁর কবিতার কথনভঙ্গিতে রয়েছে এক অন্য স্বর।

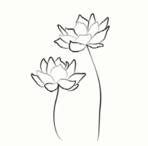

অসগোত্র

অপর্ণা মুখোপাধ্যায়

ঘরে পা দিয়েই অরিন্দম এক মুখ হেসে বলে, 'আঃ!! কতদিন পর ফিরলাম বলো তো? হোম হোম সুইট হোম, উইথ সুইট ওয়াইফ্। তাই না? কী ম্যাডাম, ঠিক বলেছি?'

অরিন্দম সাবিত্রীর দিকে ফিরে বলে, 'তাহলে শেষ পর্যন্ত যমালয় থেকে ফিরিয়ে আনলে?'

সাবিত্রী দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'বাবাঃ!! যা হয়েছিল, সে শুধু ভগবানই জানেন। শুধু তাঁর দয়ায় তুমি ভালো হয়েছো।'

—তাঁর দয়াটয়া নয়। আমি জানি, শুধু তোমার জন্য যম আমায় নিতে পারেনি। দিনরাত এক করে এ দু'হপ্তা তুমি যেভাবে সেবা করেছো, নার্সরাও তাজ্জব হয়ে গেছে। এক সাবিত্রী সত্যবানের জীবন যমের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আর আমার সাবিত্রী এ অধমের জীবন—

—ছিঃ কিসব বলছ? কার সঙ্গে কার তুলনা করছ? ভগবানের দয়া ছাড়া এ সাবিত্রী কি করতে পারত? মনে হত বুক দিয়ে তোমার সব কষ্ট আমি মুছিয়ে দিই। তা, ঠাকুর আমার মুখ রেখেছেন।

—না খেয়ে দেয়ে এভাবে দিনরাত পড়ে থাকতে, কষ্ট হত না?

—তোমার সেবা করতে কষ্ট হবে? তোমার জন্য করব না, তো কার জন্য করব? তুমি আমার শাঁখা সিঁদুর। আমার জীবনে প্রথম আর শেষ প্রেম।

—তবে ফুলশয্যের রাতে ও কথা বলেছিলে কেন? কী বলেছিলে মনে আছে?

—ওমা, তুমি কি গো? ওসব কথা এখনো মনে রেখে দিয়েছ?

—পুরুষজাতকে ঘেন্না করো, আমাদের জাতের ওপর তোমার ওই

কমপ্লিমেন্ট—

—করতামই তো। ভালোবাসা কী তাও কি জানতাম? যেখানে তোমার পায়ে থাকার যোগ্যতা ছিল না—সেখানে তুমি আমায় তোমার বুকে টেনে নিলে। তোমার ভালোবাসা দিয়ে, আমায় ভালোবাসতে তুমিই শেখালে। তোমার মতো এতবড়ো সিংহ হৃদয় স্বামী পেয়েছি, আমার মতো ভাগ্যবতী কে আছে?

সাবিত্রী অরিন্দমের বুকে মাথা রেখে বলে, তোমার এই বুকের ভালোবাসাই আমার মতন নষ্ট মেয়েকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিলো।

অরিন্দম সাবিত্রীর মাথায় স্নেহের পরশ দিয়ে বলে—'আর কখনো এভাবে কথা বলো না প্লিজ। তুম তো নষ্ট নও। কোনোদিন নষ্ট ছিলেও না।'

'আত্মীয় এরকম হয় লোকে ভাববে কী করে? এসব ভাবা কী সম্ভব? সম্পর্কে তোমার নিজের পিসতুতো দাদা। না তুমি ভেবেছিলে, না তোমার মা ভেবেছিল। জানলে পরে কী নিজের আঠেরো উনিশ বছরের ভাগ্নেকে তোমার সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়ায়? বারো তেরো বছরের একটা ছোটো মেয়ে। কতটুকু জানে সে? না জেনে তুমি শুধু মিথ্যে বিশ্বাসের শিকার হলে। এতে তোমার দোষ কোথায়?'

অরিন্দমের কথায় সাবিত্রীর দুচোখ জলে ভরে আসে। অরিন্দম আবার বলে, 'কিন্তু তুমি সত্যিকারের ভালো মেয়ে। না হলে এসব কথা তোমার মাকেও বলতে না পারতে! আর বিয়ের রাতে তোমাকে স্পর্শ করার আগে আমাকেও সত্যি গোপন করে মিথ্যে বলতে পারতে। কেউ তো এসব ঘটনার সাক্ষী নেই। তবু তুমি মিথ্যে বলোনি। কী বলেছিলে মনে আছে? বলেছিলে, আমি নষ্ট মেয়ে। আমায় ছোঁবেন না।'

'শুনে আমার কী অবস্থা। সবেধন নীলমণি একটা মাত্র বিয়ে করেছি। নো প্রেম-ট্রেম। তার ওপর এমন মিষ্টি বৌ, অত সুন্দর স্বপ্নভরা ফুলশয্যের রাত। অরিন্দম হাসতে থাকে। বলে, 'তখনই যে হার্ট অ্যাটাক হয়নি, এই যথেষ্ট। তবে এই একটা কথাতে তুমি আমার হার্টকে অ্যাটাক করে, আমায় জিতে নিয়ে ছিলে। জবালা সত্যকামের মতো তোমার নির্ভীক সত্যবাদিতা আমায় মুগ্ধ করেছিল। জহুরীর জহর চেনার মতো তোমাকে চিনতে আমার বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। নিজেকে উজাড় করে তোমায় ভালোবাসতে কোনো দ্বিধা আসেনি।'

সাবিত্রীর দুচোখে শুধু কৃতজ্ঞতা। তার জীবনের দুর্যোগের মুহূর্তগুলোকে অরিন্দম নিজের সুন্দর মন দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। অরিন্দমের ভালোবাসার উত্তাপে মোমের মতন গলে যেতে যেতে আবেগ ভরা নিবিড় কণ্ঠে সাবিত্রী বলে, 'তুমি এখনো আমায় এত ভালোবাসো?'

অরিন্দমের ক্লান্ত দুচোখে কৌতুক খেলা করে। বলে, 'ছিলে আঙুর, হয়েছ কিসমিস।'

সাবিত্রী মিষ্টি করে হাসে। বলে, 'আঙুর কিসমিস যাই বলো, আমি তোমার হাতে গড়া মানসী। আমি তোমারই মনের সৌন্দর্য তিল তিল করে গড়া তিলোত্তমা।'

'আমার যা কিছু, সে তোমারি দান
গ্রহণ করেছো যত, ঋণী তত করেছো আমায়'

অরিন্দম বসার ঘরের নরম সোফায় গা ডুবিয়ে বসতে বসতে বলে, 'বেশ টাইম মতো কবিগুরুর কথা ঝেড়েদিলে তো। থ্যাংক ইউ ফর দ্য বিউটিফুল কমপ্লিমেন্ট।'

অরিন্দম সাবিত্রীর হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে হালকা মধুর পরশে জড়িয়ে ধরে কপালে মিষ্টি করে চুমু দিয়ে বলে, 'লহ বধূ, মোর পুরস্কার।'

সাবিত্রী হেসে বলে, 'তোমার দুষ্টুমি এখনো গেল না? মনে আছে একদিন ফাঁকা বাড়িতে আমায় চ্যাংদোলা করে সারা বাড়ি ঘুরিয়েছিলে? আমি তো ভয়েই মরি। এই বুঝি পড়লাম। উঃ! কম ডানপিটে ছিলে!'

অরিন্দম সাবিত্রীর হাতটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে খেলা করতে করতে বলে, 'জানি না কেন অকারণ/মন ছুটে যেতে চায়,/অতীতের আঙিনায়—/শোনে না বারণ।'

সাবিত্রী অরিন্দমের কথাগুলো শোনে তন্ময় হয়ে। কী সুন্দর করে কথা বলে অরিন্দম। সাবিত্রী কখনো তাকে অশ্লীল অসভ্য কথা বলতে শোনেনি। এমন মানুষও হয়? সাবিত্রীর বুকের ভেতর ব্যথা করে ওঠে। জীবনে এভাবে এতখানি অসুখ অরিন্দমের কখনও করেনি। সাবিত্রী যেন একা একা মরে যাচ্ছিল। বলে, 'তুমি ঘরে ফিরলে, ঘরটা আলো হয়ে গেল। এ'কদিন কী যে গেছে তো শুধু অর্ন্তযামীই জানেন। ডাক্তার তো আশা ছেড়েই দিয়েছিল। এবার তুমি একটু বিশ্রাম করো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ঘর অন্ধকার রাখতে নেই। আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে আসি।' সাবিত্রী উঠে দাঁড়ায়। বসার ঘরের আলোটা আগে জ্বালে।

অরিন্দম বলে, 'একটা রিকোয়েস্ট করব, রাখবে?'

—'এভাবে বলছ কেন? কী রিকোয়েসট? নিশ্চয় মনে মনে কোনো প্ল্যান ভেঁজেছ?'

—'নো প্ল্যান। শুধু প্লেন রিকোয়েস্ট। আজ এতদিন পর বাড়ি ফিরলাম তার সেলিব্রেশন তোমার মিষ্টি গলায় একটা গানের মাধ্যমে হোক।'

—'বেশ স্যাংশনড্। দাঁড়াও, আগে চটপট আলোগুলো জ্বেলে এতদিনের আঁধার দূর করি। আগে অন্ধকার ভালোবাসতাম। মনে পড়ে, কতদিন অন্ধকার বারান্দায় দুজনে বসে থেকেছি। তুমি হসপিটাল যাওয়ার পর ঐ অন্ধকার যেন আমায় গিলতে আসত।'

ঘরগুলোয় আলো জ্বালিয়ে সাবিত্রী অরিন্দমের পাশে ফিরে এসে বসে। বলে, 'একটা মানুষের অভাবে আলো জ্বাললেও এ ঘর যে কতখানি অন্ধকার থেকে যায়, তাও বুঝেছি হাড়ে হাড়ে।'

অরিন্দম হাসে। বলে, 'তাহলে বলো, আমিই তোমার আলো?'

সাবিত্রী হেসে বলে, 'তুমি আমার আলো,/তাই তোমায় বেসেছি ভালো।/তুমি যখন এলে,/মুছল সকল কালো।

তাই তো বলি', বলে সাবিত্রী গেয়ে ওঠে— 'আলো আমার আলো/ ওগো, আলোয় ভুবনভরা।'

অরিন্দম বলে, 'না, না এ গানটা নয়। তুমি তো জানো আমি কোন গানটা ভালোবাসি।'

গান থামিয়ে অরিন্দমকে একটু আদর করে সাবিত্রী বলে, 'জানি মশাই জানি।' বলে, গান শুরু করে।

'দিনের শেষে, ঘুমের দেশে/ঘোমটা পরা ঐ ছায়া.../...ওরে আয়, আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিন শেষের শেষ খেয়ায়।'

গান যে কখন শেষ হয়ে গেছে, তার হুঁশ থাকে না। সাবিত্রী অরিন্দম দুজনেই গানের অন্তরীন রূপে যেন দিশেহারা।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সাবিত্রী বলে, 'যদি ডাক আসে ঐ খেয়ায় তোমার পাশে আমাকেও তুলে নিয়ো গো। আমাকে যেন একা ফেলে যেওনা। আমি তোমার খু—ব ভালোবাসি।'

—'সাবিত্রী!' অরিন্দমের কণ্ঠ আবেগে জড়িয়ে যায়।

—'হ্যাঁগো, এইটাই আমার, তোমার কাছে শেষ চাওয়া।' সাবিত্রী ধীরে ধীরে অরিন্দেমর বুকে মাথা রাখে।

সকালে ঘুম ভেঙে সাবিত্রী ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের আকাশটা চোখে পড়ে। বেশ রোদ উঠে গেছে। জানলা দিয়ে ঝরে পড়া সূর্যের এক টুকরো আলোতে ঘরটা আলোয় আলো হয়ে গেছে। কতদিন বাদে কাল রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছে, সে অরিন্দমের দিকে তাকায়। অরিন্দমের ঘুমন্ত প্রশান্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আহা! ঘুমোক। কতদিন স্বস্তি করে ঘুমোতে পারেনি বেচারা। হাসপাতালে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমানো আর বাড়িতে নিশ্চিন্তে আরামের ঘুমে কত ফারাক।

আজ থেকে সেও নিশ্চিন্ত। বাড়ি আর হাসপাতাল ছুটোছুটি করতে হবে না। ঘরের মানুষ ঘরে ফিরেছে। এখনো পুরো সুস্থ নয়। ডাক্তার একগাদা ওষুধ দিয়ে বলেছে, 'আনন্দে থাকুন। টেনশন একদম নেবেন না। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া, সময় মতো ওষুধ খাওয়া, কিছুদিনের মধ্যেই পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

ডাক্তারের কথা শুনে সাবিত্রী খুশি হয়। ডাক্তার যা যা বলেছেন সব চেষ্টা করবে সাবিত্রী। অরিন্দমকে সে আগের মতো সুস্থ করে তুলবে।

সাবিত্রী ঘুমন্ত অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে থাকে। সমস্ত মনটা একটা স্নিগ্ধ মমতায় ভরে যায়। মনটা চকিতে পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে থাকে। তখন অরিন্দমের একমাথা কোঁকড়ানো কালো চুল। আয়ত স্বপ্নালু দুটো চোখ, সুঠাম দেহ। অরিন্দম ছিল সাবিত্রীর স্বপ্নের পুরুষ। ফুলশয্যের রাতে অরিন্দম রাতারাতি বদলে দিয়েছিল সাবিত্রী নামের মেয়েটাকে।

একটা দমবন্ধ করা অভিশপ্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে সাবিত্রীর যেন নবজন্ম হয়েছিল, তেমনি তার মনে জন্ম নিয়েছিল প্রথম প্রেম আর ভালোবাসা। অরিন্দমের মাতৃহীন সংসারের সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল বিনা দ্বিধায়।

শ্বশুর প্রকাশবাবু মনের খুশি চেপে রাখতে পারেননি। অরিন্দমকে ডেকে বলেছিলেন, 'কী রকম মেয়ে তোর বৌ করে এনেছি দেখেছিস? একেবারে রূপে লক্ষ্মী, গুণে স্বরস্বতী। ভগবান তোকে শুধু স্ত্রী দেননি, দিয়েছেন স্ত্রীরত্ন। তোর মার মৃত্যুর পর বাড়িটার কী হাল হয়েছিল দেখেছিস তো, যাকে বলে একদম ছন্নছাড়া অবস্থা, আর এখন দেখ।'

শ্বশুরের কথা শুনে সাবিত্রী লজ্জা পেয়েছিল। এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছিল, 'আমায় আশীর্বাদ করুন বাবা।' শ্বশুরের প্রাণঢালা আশীর্বাদ সে পেয়েছিল, কিন্তু—সাবিত্রীর বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। চোখ পড়ে দেওয়ালে টাঙানো অজয় সুজয়ের জন্মদিনের ছবির দিকে। তখন ওদের কত বয়স হবে। অজয় দশ, আর সুজয় আট। দুজনে সাবিত্রীর দুপাশে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। সকলের পেছনে হাসিমুখে অরিন্দম।

দুজনেরই জন্ম গরমকালে, তাই ওদের স্কুলে গরমের ছুটিটায় আলাদা একটা উৎসবের মেজাজ ছিল। অ্যালবাম ভরা শুধু ছেলেদের জন্মদিনের ছবি। সেই সব ছবি থেকে বেছে অরিন্দমই এই ছবিটা এনলার্জ করিয়ে সুন্দর ফ্রেমে বাঁচিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়েছে। সাবিত্রী যেন সব দেখতে পায় চোখের সামনে।

প্রতি গরমের ছুটিতে দুভাই বাড়ি এসে সাবিত্রীকে জড়িয়ে ধরে কী কান্নাকাটি করত, 'ও মা, হোস্টেলে আর থাকব না। ওখানে খুব কষ্ট হয়। সব কাজ নিজে করতে হয়। তোমরা তো নেই, কে তোমাদের মতন আদর করবে? কে ভালোবাসবে? আর যাব না। এখানে পড়াশোনা করব। আমাদের আর ওখানে পাঠিয়ো না।'

অরিন্দম সাবিত্রী দুজনেই কত আদর করে বোঝাত, 'ওখানে তোমাদের কত বন্ধু বলত। কত খেলতে পারো, কত গল্প কর কত মজা হয়—হয় না?'

—'ছাই মজা! ছাই বন্ধু। বন্ধুরা খালি হিংসে করে। ঝগড়া করে। কেউ আদর করে কী? আমাদের বাবা-মা সবচেয়ে ভালো।'

তখন অজয় ক্লাস এইট আর সুজয় ক্লাস সিক্স। অজয় এগিয়ে এসে সাবিত্রীর হাত ধরে ঝুলে পড়ে। অজয়ের দেখাদেখি সুজয় এবার এগিয়ে অরিন্দমের হাত ধরে দুলতে দুলতে বলে, 'বাবা, আমার বাবা।' অজয় তৎক্ষণাৎ সাবিত্রীর হাত বুকে টেনে নিয়ে বলে, 'মা, আমার মা।'

সাবিত্রীর চোখে জল আসে। কচি কচি মুখে ভালোবাসার সেই সরল অভিব্যক্তিগুলো একদম ভোরে ঘাসের ওপর জমা শিশির বিন্দুর মতো সুন্দর আর পবিত্র লাগত। দিনে দিনে সেসব কোথায় যে হারিয়ে গেল, শত চেষ্টাতেও সাবিত্রী তাদের আর খুঁজে পায় না। অরিন্দমের বদলির চাকরি। তাই ওদের হোস্টেলে রেখে পড়াতে বাধ্য হয়েছিল। ছেলেদের মানুষ তো করতে হবে। প্রথম প্রথম ছেলেদের ছেড়ে থাকতে তাদেরও কী কম কষ্ট হত? সময়ে সব সয়ে গিয়েছিল। আর কান্নাকাটি করত না। বলতে গেলে সমস্ত ছাত্রজীবনই তো ওদের হোস্টেলে কেটেছে।

সাবিত্রীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ওদের দ্রুত পরিবর্তনটা সাবিত্রীর চোখে পড়েছিল। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। ছেলেদের মধ্যে কোমল বৃত্তিগুলো তাড়াতাড়ি মরে যাচ্ছিল। ওরা যেন রোবটের মতন অনুভূতিহীন হয়ে যাচ্ছিল দিনকে দিন। সাবিত্রী অরিন্দমকে বলেছিল, 'ছেলেদের মানুষ করতে গিয়ে অমানুষ করে ফেল্লাম না তো?'

—'হঠাৎ একথা কেন?'

—'তুমি দেখতে পাচ্ছ না, ওরা কী অদ্ভুতরকম বদলে যাচ্ছে। এখন বাড়িতে এসে থাকতেই চায় না। কলেজ খোলার আগেই হোস্টেলে চলে যায়।' সাবিত্রীর রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'তখন কত বারণ করেছি, ওগো বাচ্চাদের কাছছাড়া করতে নেই। ছোটো থেকে স্নেহের উত্তাপ না

পেলে ওরা বাবা-মাকে চিনবে কী করে? ভালোবাসবে কী করে? আমাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী ওরা কোনোদিন হবে না।’

অরিন্দম বলেছিল, ‘কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না। দেখো হোস্টেলের ডিসিপ্লিনে মানুষ হয়ে ওরা লেখাপড়ায় কত ভালো হয়েছে। আত্মনির্ভরশীল হয়েছে। এটা কী কম কথা! আমরা ওদের নাই বা পেলুম, ওরা তো নিজেদের জীবনটাকে চিনে নিতে পারছে। আমার বদলির চাকরি। ওদের হোস্টেলে না দিলে লেখাপড়া এভাবে হত না। আজ এ স্কুল, কাল ও স্কুল করে ঘুরে বেড়ালে ভাবতে পারো ওদের ভবিষ্যৎ কী হত?’

সাবিত্রীর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, ‘তুমি ছেলেদের ব্যবহারে খুশি হলেও আমি নই। এখনই এত পরিবর্তন, পরে কী হবে? মা বলে দুদণ্ড কাছে বসারও সময় নেই। কেমন আছি, একবার জিজ্ঞেসও করে না। সুজয়কে বলতে ও কী বলল জানো? শরীর খারাপ হলে তো নিজেই বলতে। তাছাড়া ভালো আছো তো দেখতেই পাচ্ছি। তাহলেই বোঝো? পরে আরো বড়ো হয়ে চাকরি করবে, সংসার করবে তখন আর কী কী বলবে কে জানে!’ সাবিত্রী সন্তর্পনে উঠে দাঁড়ায়। অরিন্দমের এখন আরো একটু ঘুমানো দরকার। এ-কদিন শরীরের ওপর দিয়ে যা ধকল গেছে!

সাবিত্রী ঘুম থেকে উঠে আগে কলিংবেলের সুইচটা অন করে আর রাতে অফ করে শোয়। এটা সাবিত্রীর নিত্য কাজ। আজ আর অন করে না। ঘড়িতে আট-টা বাজে। এক্ষুনি দুধওলা আসবে। কলিংবেলের ঝনঝন শব্দে ওকে আর ঘুমোতে হবে না। ভাবতে ভাবতেই খোলা জানলা দিয়ে দুধওয়ালাকে দেখতে পেয়ে সাবিত্রী খুশি হয়। ইশারায় ডেকে দরজা খুলে দুধ নিয়ে নেয়। এক প্যাকেট দুধ ডেচকিতে ঢেলে গ্যাসে বসিয়ে দেয়। ডাক্তার ছানা খেতে বলেছেন। ছানা খেতে অরিন্দম বরাবর ভালোবাসে। পথ্যকে পথ্য, ওষুধকে ওষুধ।

সাবিত্রীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ছেলেদের উচ্চশিক্ষার খরচের ধাক্কা সামলাতে তখন দুধ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ছানা তো দূরের কথা, পাতে এতটুকু দুধভাত না খেলে যে মানুষটার খাওয়া সম্পূর্ণ হত না সে নির্দ্বিধায় দুধ বন্ধ করে দিয়েছিল। কথাটা সাবিত্রী একদিন সুজয়কে বলতে সুজয় বলেছিল, ‘কটা দিন আর কষ্ট করো মা। দাদা বা আমি যে কেউ দাঁড়িয়ে গেলে আমাদের আর কোনো কষ্ট থাকবে না।’

কিন্তু যতদিন যাচ্ছিল সব যেন দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। কলেজে পড়ার সময় ছুটিতে বাড়ি এলে দুই ভাইয়ে নিজেরা তাদের কান বাঁচিয়ে গুজগুজ, ফিসফিস করে কী সব আলোচনা করত। সাবিত্রী বা অরিন্দমকে দেখলে দুজনেরই মুখে চাবি। একদম চুপ হয়ে যেত। এক-একদিন সাবিত্রী সহ্য করতে পারত না। বলে বসত, ‘কীরে, বাবা-মার সামনে কথা বলতে লজ্জা করে?’

—দেখো মা, আজেবাজে বোকো না। আমরা বড়ো হচ্ছি, ভুলে যেও না। আমাদেরও একটা প্রাইভেসি আছে, নিজেদের জগৎ আছে। সেখানে তোমরা হাত দিতে এসো না।

—এইটুকু বাচ্ছা, তোদের আবার প্রাইভেসি? অবাক করলি?

—আমরা এইটুকু বাচ্চা? অজয় হেসেছিল। ‘আমি কুড়ি আর সুজয় আঠারো। দুজনেই অ্যাডাল্ট, বুঝেছ?’

অরিন্দম পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। শান্ত কণ্ঠে বলেছিল, ওরা দু’চারদিনের জন্যে আসে। বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে যাও কেন? এমন কথা বোলো না যে ওরা মনে কষ্ট পায়। অরিন্দম হেসে বলেছিল, ‘ওরা কে? তোমারই তো নাড়ী ছেঁড়া ধন। ফেলবে কোথায়? যা ফেলতে পারা যায় না, তা মানিয়ে নিতে হয়।’

অজয় বলেছিল, ‘বাবাকে দেখে শেখো, বুঝলে? তুমি তো বাইরের জগৎ দেখো না, বাবা দেখে। তাই বাবা এত বোঝে। আর তুমি এক নম্বরের আড়বুঝো। ছেলেরা বড়ো হচ্ছে, তাদেরও একটা জীবন আছে। এটা ভোলা কি উচিত?’

অরিন্দম ছেলেদের ইশারা করতেই দুভাই দুপাশ থেকে সাবিত্রীকে জড়িয়ে ধরে আদর করতেই সাবিত্রী হেসে ফেলে। চোখের জল মুছে বলে, ‘তোরা যত বড়োই হ মায়ের কাছে তোরা চিরকালের শিশু, এটা তোরাও ভুল করিস না। একমাত্র তোদের বাবাই আমাকে বোঝে। তোরা বুঝলে, আমার এত কষ্ট!! তোর বাবাকে কিছু বলতে হয় না বুঝলি? মুখ দেখেই সব বুঝে নেয়।’ সাবিত্রী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অরিন্দমের দিকে তাকায়।

অজয় হেসে বলেছিল, ‘ইহারই নাম প্রকৃত প্রেম; নিখাদ ভালোবাসা, তাই নারে সুজয়।’

সবাই সেদিন হেসেছিল। ঐ হাসিটাই যদি সারাজীবন ফ্রেমে পাকাপাকি বাঁধিয়ে রাখতে পারত! সাবত্রীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

এরকম কত শত টুকরো টুকরো ঘটনা, কত স্মৃতি ছড়িয়ে আছে সারা জীবন জুড়ে। হাত বাড়ালেই তাদের যেন ছুঁতে পারে সাবিত্রী। সাবিত্রী নিজের মনেই চমকে ওঠে। ঘুমের ঘোরে অস্ফুট স্বরে অরিন্দম সুজয়ের নাম বলল না? হ্যাঁ, ঐ তো অজয় সুজয়। ঘুমের ঘোরে জড়ানো কণ্ঠস্বর। হয়তো স্বপ্ন দেখছে। সাবিত্রীর দুচোখ জলে ভরে আসে। হায়রে! বাপের মন!!! ছেলেরা কোনোদিন বুঝল না। কোনোদিনও চিনল না! হাসপাতালেও জ্ঞান ফেরার পরই অরিন্দম বারবার ছেলেদের দেখতে চেয়েছে। সাবিত্রী কী করে ঐ নিষ্ঠুর সত্যিগুলো অরিন্দমকে বলবে। তাই বাধ্য হয়ে মিথ্যেটাই বলেছে। বলেছে ওর দুজনেই অফিসের কাজে বাইরে গেছে ফিরে নিশ্চয় আসবে। অরিন্দম বিশ্বাস করেছিল। আর সাবিত্রী মনে মনে শিউরে উঠেছিল। ঐ ভয়ংকর সত্যটা অরিন্দম কতটা সহ্য করতে পারবে। তা সে জানে না কিন্তু সত্য তো একদিন প্রকাশ পাবেই। কতদিন তাকে আঁচল চাপা দেবে সাবিত্রী? আসলে অজয়, সুজয়ের বিয়েটাই তাদের জীবনে কালবৈশাখীর ঝড়ের মত এসে সব তছনছ করে দিয়ে গেল। ছিন্নভিন্ন করে দিল ওদের অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা, অনেক আকাঙ্খায় ভরা জীবনটাকে।

সেদিন ছিল রোববার। দুজনেই নিশ্চয় আগে থেকে প্ল্যান করে রেখে ছিল। সকালে জলখাবারের টেবিলে দুভাই একসঙ্গে এসে আচমকা কথাগুলো বলে সাবিত্রীকে ভীষণ চমকে দিয়েছিল।

—‘মা, আমরা বিয়ে করব।’

অজয় সুজয়ের এইভাবে একসঙ্গে বলার ভঙ্গিতে সাবিত্রী কথা বলতেই ভুলে গেছিল। কথাগুলো বোধগম্য হতে সময় লেগেছিল। বলেছিল,

‘বিয়ে তো করতেই হবে—মত যখন দিয়েছিস, এবার তাহলে পাত্রী দেখা আরম্ভ করি।’

—‘ওসব পাট চুকে গেছে। তোমাদের আর খুঁজতে হবে না। বৌ ইজ রেডি। খালি একটা দিন দেখে ঘরে তুলে ফেলো।’

সবিত্রী এরকম অপ্রত্যাশিত কথায় বেসামাল নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে বলে, ‘তাহলে সব কাজই তো এগিয়ে রেখেছিস। শুধু আমাদের একবার দেখিয়ে ওদের বাবা-মার সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা কর।’

—‘তোমরা দেখবে কেন? তোমাদের দেখার আবার কী দরকার?’

—‘ওমা!! এ আবার কী কথা? বিয়ে দেব, ছেলের বৌ দেখব না? ওদের বাপ-মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে না?’

অজয় এবার বিরক্ত মুখে বলে, ‘সেই থেকে এক কথা ভ্যানভ্যান করছ। বিয়ে কী তোমরা করবে? বিয়ে করব আমরা, ঘর করব আমরা। ফাইন্যাল তো হয়েই গেছে। এখন তোমরা দেখলেই বা কী না দেখলেই বা কী?’

অজয়ের কথা শুনতে শুনতে সাবিত্রী যেন অতলস্পর্শী এক খাদে তলিয়ে যাচ্ছিল।

সুজয়ের কথাটা মনে পড়ছিল, ‘আর কটা দিন কষ্ট করো মা—আমরা দুজনের মধ্যে একজনও দাঁড়িয়ে গেলে আর কোনো কষ্ট থাকবে না।’ সাবিত্রীর মনে হচ্ছিল বলে ‘এবার তো তোরা দু ভাই-ই দাঁড়িয়ে গেছিস। সুজয়, তুই তো এখন বিদেশি কোম্পানির ম্যানেজার। মাস গেলে সত্তর হাজার টাকা মাইনে পাস। বাবা-মার হাতে কটা পয়সা তুলে দিয়েছিস? এখন তো আবার মাইনে গুছিয়ে নেওবার লোকও নিয়ে আসছিস। তোদের পছন্দ করা বৌ নিশ্চয় বাবা-মার হাতে তোদের মাইনের টাকা তুলে দেবে না। তোরাই দিলি না, তো ওরা। আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকব।’ সাবিত্রীর চোখে জল আসে।

—‘তুমি কাঁদছ? ভাবছ বিয়ে হলে ছেলে পর হয়ে যাবে?’

—‘অজয়! অমনি কথা বলতে নেই বাবা।’

—‘তাহলে তুমি কী জন্যে কাঁদলে বলো?’

—‘তোরা কত দূরে সরে গেছিস। আরো সরে যাচ্ছিস।’

—‘আমরা দূরে সরে গেছি?’

—‘যাসনি? আমাদের ছেলের বৌ আসবে, আমরা একবার দেখব না? তোর বাবা না হয় ভোলানাথ, আমি তো নই। আমারও তো সখ-আহ্লাদ বলে কিছু আছে। কে বৌ হয়ে আসছে দেখব না!’

—‘কী আশ্চর্য! বিয়ের সময় দেখা কী দেখা নয়? না আগেই দেখতে হবে? আগে দেখলে কটা হাত-পা গজাবে!’

ছেলের নির্মম কথায় সাবিত্রীর মুখে কোনো কথাই জোগায় না। সব শুনে অরিন্দম শুধু হেসেছিল।

—‘হাসছ যে?’

—‘জানতাম। এরকমটাই আশা করছিলাম।’

—‘আশা করছিলে, মানে?’

—‘পশ্চিমী শিক্ষায় ওরা বড়ো হয়েছে। ছাদনা তলায় গিয়ে সাতপাকে বেঁধে বিয়ে করবে—এরকম ভাবাটাই বোকামি। আফটার অল বিয়েই তো করছে। গার্লফ্রেন্ড করে বা রক্ষিতা করে তো রাখেনি। কাউকে নষ্ট করে ছুঁড়ে তো ফেলেনি। বিয়ে করে সংসার পাতছে। এটা খুব ভালো কথা। যেভাবে চাইছে করুক। আমাদের মতে করছে না বলেই, আমাদের দুঃখ। তুমি আমার মতন হও সাবিত্রী। জীবনটাকে সহজ করে নিতে শেখো। দেখবে কোনো দুঃখই গায়ে লাগছে না। বর্তমান যুগটা ‘হিজ হিজ, হুজ হুজ’ এই কথার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে, বুঝলে?’

অরিন্দমের কথায় সাবিত্রী গুম হয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর সাবিত্রী রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, ‘তাহলে ওদের বিয়েতে আমাদের থাকার কোনো প্রয়োজনই নেই। থাকি বা না থাকি বিয়ে তো বন্ধ হচ্ছে না।’

অরিন্দম ধীর কণ্ঠে বলে, ‘আমার কথা শোনো, এভাবে বিচলিত হয়ো না। এ বিয়েতে যেটুকু ওরা চাইবে—সেটুকুই আমাদের করণীয়।’

—‘ওরা জানিয়ে দিয়েছে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হবে আর বিয়ের পর একটা হোটেলে পার্টি দেবে। ব্যস, বিয়ে শেষ। বৌদের জন্য গয়নাগাঁটি কাপড়-চোপড় আমাদে কিনতে বারণ করেছে। ওরা টাকাটা চেয়েছে। ভাবী বৌদের সঙ্গে নিয়ে ওরাই কিনে নেবে। এ একরকম ভালোই হল। আমাদের কোনো দায়িত্বই রইল না।’

অরিন্দমের কথায় সাবিত্রী গালে হাত দেয়। অবাক হয়ে বলে, ‘তুমি তো ধন্যি মানুষ। আমি ভেবেছি, তুমি কিছু জানো না। সব জেনে শুনে বোবা-কালা হয়ে বসে আছো? যা হচ্ছে, তা আমরা কখনও ভেবেছি?’

অরিন্দম ম্লান হাসে। বলে, ‘মানুষ অনেক কিছু ভাবে না, কিন্তু যা ঘটার ঘটে যায়। আমি দেখছি তুমি সেই আগের মতন বাচ্চা রয়ে গেছ। মনে রাখবে, সত্যি কথা কেউ শুনতেও চায় না। সত্যি কথা সব সময় চলেও না। লেট দেম বী হ্যাপি। ওরা সুখী হোক। আর কী? এবার একটু হাসো তো। সেই থেকে তোমার গোমড়া মুখ দেখে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছে। হাসো-হাসো—অরিন্দমের কথা বলার ভঙ্গিতে সাবিত্রীর মনে অভিমানের মেঘ সরে যায়। ঠোঁটের কোণে এবার হাসি ফোটে। ‘তুমি ঠিকই বলেছ। ওদের যাতে সুখ, তাই করুক। আমার জন্যে তুমি তো আছো।’ সাবিত্রী অরিন্দমের বুকে মাথা রাখো।

—‘এইবার ঠিক বুঝেছ, আর নো কান্না। তাকাও, তাকাও আমার দিকে।’

সাবিত্রী অরিন্দমের দিকে তাকায়। অরিন্দম ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরল। সাবিত্রী উঠে জানলাটা ভেজিয়ে দেয়। ঘরে সূর্যের আলো সোজাসুজি ঢুকছে। এক্ষুনি ঘুম ভেঙে যাবে। সাবিত্রী এবার বাথরুমে ঢুকে অরিন্দমের জন্য দাঁত মাজার ব্রাশ জলে ভিজিয়ে রাখে। পাশে মাজন আর ফ্রেশ টাওয়েল রেখে গিজার চালিয়ে দেয়। ঘুম থেকে উঠে যেন সব হাতে হাতে রেডি পেয়ে যায়। রাতে কখন খেয়েছে, উঠলেই তো খিদে পেয়ে যাবে। ছানাটা কাটানো হয়ে গেছে। সাবিত্রী রান্না ঘরে ঢুকে চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলে। অরিন্দম উঠলেই চায়ের জল চাপিয়ে দেবে। ওর বাথরুম হতে হতে চা হয়ে যাবে। চা, বিস্কুট আর ছানা—সকালে একদম হাল্কা ব্যবস্থা। ডাক্তার বলে দিয়েছেন।

চা খাওয়াতে অরিন্দমের একটু সৌখিনতা আছে। চায়ের স্পেশাল ব্র্যান্ড, কীভাবে তার লিকার করতে হবে, যাতে চায়ের সুগন্ধ নষ্ট হবে না, অথচ সোনালি লিকারটা বেরুবে অরিন্দম সাবিত্রীকে সব শিখিয়ে

দিয়েছে। সুন্দর কাপ ডিসে চা খাওয়াটাও অরিন্দমের শখ। দামি সৌখিন ট্রেতে ধূমায়িত চা নিয়ে সাবিত্রীকে আসতে দেখলেই অরিন্দম একগাল হাসবে। আর বিখ্যাত গানের কলিটা গাইবে, ‘সোনার হাতে, সোনার কাঁকন, কে কার অলঙ্কার।’

—‘মানে? এখানে সোনার হাত আর সোনার কাঁকন কোথায় পেলে মশাই?’

—‘মশাই ভুল বলে না।’ অরিন্দম চওড়া করে হাসবে। ‘তোমার অঙ্গ সোনার বরণ, তাই সোনার বরণ হাত। দুনম্বর, সেই হাতে সোনার বরণ চা। কোনটাকে বেশি সুন্দর বলি? দুটোই সুন্দর। আমার বৌটা যেমন সুন্দর তার হাতের তৈরি চা-টাও তেমনি সুন্দর।’

অরিন্দম চায়ের কাপে মিষ্টি মিষ্টি মুখে করে একটা চুমুক দিয়েই বলবে, ‘আঃ!! এই না হলে চা। কী বানিয়েছ গিন্নি। এই চায়ের জন্যেই তোমার সঙ্গে নতুন করে প্রেমে পড়ে গেছি।’

সাবিত্রী ভাবে, কত তফাৎ। দেবার গুণেও জিনিস যেমন সুন্দর হয়ে ওঠে, গ্রহণ করার গুণেও সেটা আরো বেশি সুন্দর হয়ে যায়।

সুজয় অফিসের কাজে বাইরে গেছে। যাবার আগে বৌকে বাপের বাড়িতে রেখে গেছে। বাড়িতে শুধু অজয় আর মিতালী। সকালে চায়ের ট্রে হাতে অজয়ের ঘরে যেতে গিয়ে ঠেক খেয়েছিল সাবিত্রী। ওদের স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা, অজয়ের সঙ্গে মিতালীর আলোচনা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। এখন কী করবে সাবিত্রী? আড়িপাতা সে ঘেন্না করে। ফিরে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সাবিত্রী। দুটো পা অসাড় হয়ে হয়ে গেছে। চলার শক্তি যেন হারিয়ে গেছে।

—তোমার মা-না একটা জিনিস। নিজেকে খুব চালাক ভাবে—’

মিতালীর চাপা কণ্ঠস্বর আধ ভেজানো দরজা ঠেলে সাবিত্রীর কানে এসে ছিটকে পড়ে।

—দেখছ না, তোমার বাবাকে কেমন বগলে পুরেছে। আর তোমার বাবাটাও তেমনি, এক নম্বর বউ ভেড়ো। বউ যা বলছে তাই। উঠতে বললে উঠছে। বসতে বললে বসছে। দেখলে গা জ্বলে যায়!

—আমিও তো বাপকা ব্যাটা। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিয়াছে।

—তুমি আর তোমার বাবা এক? না, আমি আর তোমার মা এক—

মিতালী ঝলসে ওঠে—‘তোমার মা একটি ধড়িবাজ। তাকিয়ে দেখো, সংসারের খুঁটির দড়ি রেখেছে নিজের হাতে। ভেবেছে বুঝতে পারব না। আমি গরু নই। এমনি এমনি এম.এ. পাশ করিনি। এক সংসারে থাকার লেকচার দেয়। আসলে তোমরা এখন সব মোটা মোটা মাইনে পাও। সব নিজের ট্যাঁকে গোঁজার ধান্ধা।’

সাবিত্রীর মাথাটা টলে ওঠে। আর একটু হলেই চায়ের ট্রেটা মাটিতে পড়ত। কোনোমতে নিজেকে সামলে নেয় সাবিত্রী।

—‘তুমি ফ্ল্যাট দেখছো কী না বলো। না হলে, মা বলেছিল আমাদের বাড়ির কাছে খুব সুন্দর সুন্দর ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে। একবার দেখে নাও।’

—‘দেখব। আমি কটা দেখেছি। তোমাকেও সেগুলো দেখাব।’

—‘মোট কথা, যা করবার তাড়াতাড়ি করো। আমি এখানে থাকছি না। এটা আমার শেষ কথা। থাকলে তুমি তোমার মায়ের আঁচল ধরে একা থেকো।’

—‘ছোটোবেলায় মায়ের আঁচল খারাপ লাগে না। কিন্তু যাই বল, বৌয়ের আঁচল ইজ বৌয়ের আঁচল। ওর গন্ধই আলাদা। বাবাকে দেখছ না, এই বয়েসেও কেমন চালিয়ে যাচ্ছে। বাপ কা ব্যাটার তাহলে কী করা উচিত? কাছে এসো—যা করা উচিত তা করে দেখাই।’

—এই কী করছ? দরজা খোলা। এখুনি হয়তো ম্যাডাম সি.আই.ডি এসে পড়বেন। ছাড়ো, ছাড়ো। নিজের বাড়িতে গিয়ে যা খুশি, যখন খুশি কোরো। আমি তো তোমারই।

—বলছো? ওকে ম্যাডাম। তথাস্তু। তাহলে এখনকার মতন অধিবেশন এখানেই সমাপ্ত হোক।

দুজনের মিলিত হাসির উচ্ছ্বাস ভেসে আসতেই সাবিত্রীর চমক ভাঙে। একহাতে চোখের জল মুছে চায়ের ট্রে হাতে ঘরে ঢোকে। অজয় আর মিতালীর মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মুখ নীচু করে চায়ের ট্রেটা সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে নিম্নস্বরে বলে, ‘চা টা রইল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ো। ঠান্ডা হয়ে যাবে।’

দুচোখের উদ্গত অশ্রু কোনোমতে সামলে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসেছিল সাবিত্রী। নিজের ঘরে এসে বাজপড়া গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের ভেতরটা তার ঝলসে গেছে। এই তার অজয় আর তার বৌয়ের মনের আসল রূপ! ওরা কেউ তাকে ভালোবাসে না। বৌ না হয় পরের মেয়ে, কিন্তু নিজের পেটের ছেলে? সেও তো কোনো প্রতিবাদ করল না! বুকটায় খুব কষ্ট হচ্ছে। এসব কথা অরিন্দমকে সে বলবে না। তাহলে ও খুব কষ্ট পাবে। আর একবার নিজেই চেষ্টা করে দেখবে। গাছের গোড়া যে কে তা সে বুঝে নিয়েছে। এবার সে গাছের গোড়াতেই জল দিয়ে দেখবে। হে ভগবান! ছেলেটাকে এভাবে সরিয়ে নিও না ঠাকুর! কত আশা, কত স্বপ্ন ওদের নিয়ে দেখেছি। তা তুমি এভাবে ভেঙে দিও না।

অজয় অফিস বেরিয়ে যেতেই সাবিত্রী মিতালীর ঘরে আসে, ‘বড়ো বৌমা’ মিতালী জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল। সাবিত্রীর ডাকে ফিরে বলে, ‘আপনি?’

—‘একটা কথা বলব বলে এলাম, বলো রাখবে?’

মিতালীর ভ্রূ কুঁচকে ওঠে, ‘কথা? আমার সঙ্গে কী কথা? না শুনে কোনো কথা দিতে পারব না।’ মিতালীর কণ্ঠে উষ্মা ফোটে।

সাবিত্রী মরিয়া হয়ে ওঠে। একটু ইতস্তত করে বলে ফেলে, ‘আমাদের ছেড়ে যেও না বৌমা। তোমরা ছাড়া আমাদের আর কে আছে? তোমরা আছো, বাড়িটা আলো হয়ে আছে। শুনলে না সেদিন বুড়ির মা কী বলল, ‘মা তোমার সংসারে চাঁদের হাট বসেছে।’

সাবিত্রীর কথায় মিতালীর আর বুঝতে বাকি থাকে না, চা দিতে এসে শাশুড়ি তাদের ঘরে আড়ি পেতে সব শুনেছে। তার মুখটা প্রান্ত বিরক্তিতে কুঁচকে ওঠে। বলে, ‘বুঝো বুঝেছি। আপনি আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলেন। ছিঃ ছিঃ, ছিঃ লজা করে না ছেলে বৌয়ের কথা আড়ি পেতে এভাবে শুনতে?’

আর্তনাদ করে ওঠে সাবিত্রী, ‘বৌমা! তুমি একি বলছা? আমি, আঙ্ম মি—’ সাবিত্রীর মুখের কথার খেই হারিয়ে যায়। মিতালী ঝলসে ওঠে, ‘ন্যাকামো করছেন কেন? বয়স তো যথেষ্ট হয়েছে। এসব করে

ভেবেছেন ছেলেকে ধরে রাখবেন? ঘরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী দুটো কথা বলার জো নেই। আশ্চর্য! এই আমার শ্বশুরবাড়ি? এখানে কোনো মানুষ থাকতে পারে? আর একটা কথা, ঝি-ঝিই। কোনো পীর ঠাকুর নয়। ওর কথায় আপনার নাচতে ইচ্ছে করে নাচুন। আমি নাচি না।’

সাবিত্রীর গালে ঠাস ঠাস করে কটা চড় এসে পড়ে। তবুও মান-সম্মান খুইয়ে পরিবেশটা সহজ করার জন্য শুকনো গলায় কোনোরকমে বলে, ‘মার সঙ্গে অমনি করে কী কথা বলতে আছে? আমার কী কোনো মেয়ে আছে? তোমরা দুজনে আমার দুটো মেয়ে। ছেলে দিয়ে মেয়ে পেয়েছি। সবাই মিলে আনন্দ করে একসঙ্গে থাকব অনেক অনেক স্বপ্ন দেখেছি এতদিন।’ সাবিত্রী হাত জোড় করে ‘আমি হাত জোড় করে বলছি বৌমা অজয়কে একটু বুঝিয়ো।’ সাবিত্রীর দুচোখে জল। মিতালী গুম হয়ে তাকিয়ে থাকে। কোনো কথার জবাব দেয় না।

অজয় রাতে ফেরার পর কোনো কেলেঙ্কারি হল না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাবিত্রী। মিতালী তাহলে নিশ্চয় কিছু বলেনি। ভাবে এই রবিবার সে নিজেই অজয়ের কাছে তার অনুরোধটা রাখবে। বলবে—জীবনের শেষ কটা দিন আমাদের ছেড়ে যাস না। আমরা তোদের কোনো বিষয়ে থাকব না। শুধু একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে খাওয়া, গল্প গুজব—এ একটা আলাদা জীবন। সুন্দর মাধুর্যে ভরা জীবন। এটা তোরা কেড়ে নিস না। তেমন হলে ছেলের হাত ধরে ভিক্ষে চেয়ে নেবে। ওরা যে তার নাড়ি ছেঁড়াধন। ওদের কাছে সাবিত্রীর মান-অপমান কী?

রবিবার বাড়ির সামনে বিরাট লরিটা দাঁড়াতে দেখে সাবিত্রী অবাক হয়। এ লরিটা তাদের বাড়ির দোরগোড়ায় কেন? কিছুক্ষণের মধ্যেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। লরির লোকগুলো বাড়ির ভেতরে এসে অজয়ের ঘর থেকে মালপত্তর নিয়ে লরিতে তুলতে থাকে। অজয় আর মিতালী ঐ মাল তোলার তত্ত্বাবধান করছে। বাইরে যাবার পোশাক পরে ওরা তৈরি। সাবিত্রীর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে। অজয়রা চলে যাচ্ছে? কৈ তাদের তো কিছু জানায়নি? না জানিয়ে এভাবে হঠাৎ... সাবিত্রী বজ্রাহত কণ্ঠে বলে, একী? তোরা—

—চলে যাচ্ছি।

—মানে?

—তোমাদের মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি। এক ঢিলে দুপাখি। তুমিও নিশ্চিন্ত। আমরাও নিশ্চিন্ত।

—বাবাকে বলেছিস? মানুষটা বাড়িতে থাকতে, না বলে এভাবে যাওয়াটা কি তোদের—

—কিছু ভুল করছি না। শাশুড়ি বৌয়ে নিত্য অশান্তি অসহ্য।

—আমি অশান্তি করেছি? বৌমার সঙ্গে আমার ঝগড়া কোথায়? ওর সঙ্গে কোনো ঝগড়া তো হয়নি।

—‘তাহলে ওকি মিথ্যে বলছে? সব জানি। সব জানি মা। আমি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছি, তোমার পছন্দ-মতো বৌ আসেনি বলে, তুমি ওকে সহ্য করতে পারো না। আফটার অল ওর প্রতি আমার একটা দায়িত্ব আছে। রোজ রোজ খেয়োখেয়ির চেয়ে চলে যাওয়া ভালো।’ অজয় একটু থেমে বলে, ‘খবরের কাগজের ঘটনার মতন বৌকে যে পুড়িয়ে মারবে না, বা বিষ খাওয়াবে না, তারই বা গ্যারিন্টি কী?’

সাবিত্রী আর্তনাদ করে দুহাতে কান চাপা দেয়। বলে, ‘তুই এতবড়ো কথা বলতে পারলি?’

—‘যা সত্যি তাই বলেছি। এবার ঘরে গিয়ে সব দেখে নাও। আমি শুধু আমার নিজের কেনা, আর বিয়েতে পাওয়া জিনিসগুলোই নিয়েছি। তোমাদের কিছু নিইনি।’

একদলা রুদ্ধ কান্না সাবিত্রীর গলা চেপে ধরে। নাহলে সাবিত্রী বলতে পারত, তুই আমাদের কিছু নিয়ে যাচ্ছিস না? তোর ঐ দেহটা ওটা কী আমাদের দেওয়া নয়? তোর শরীরে যে রক্তটা বইছে, ওটা কী আমাদের নয়? যে বিদ্যার জোরে এতবড়ো চাকরি করে খাচ্ছিস সেটা আমাদের দেওয়া নয়? তোর জন্ম থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত—সব কিছুই তো আমাদেরই, সেটা কী নিয়ে যাচ্ছিস না? কিন্তু সাবিত্রীর গলা দিয়ে কোনো আওয়াজই বোরোয় না। উদ্গত কান্না চেপে পাগলের মতো অরিন্দমের কাছে এসে বলে, ‘ওগো শুনছো ওরা চলে যাচ্ছে, অরিন্দম বিছানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল, খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলে, ‘জানি’।

—জানো? তবু তুমি কিছু বলবে না!

—না। ওরা যেখানে গেলে সুখী হয়, যেতে দাও।

অরিন্দম খবরের কাগজ থেকে মুখ তোলে। সামনেই অজয় আর মিতালী।

—আমরা যাচ্ছি বাবা।

—ভালো থাকিস, সুখে থাকিস। মাঝে মাঝে একটু আসিস। মা-বাপের প্রাণ তো। ভুল বুঝিস না। পারলে ঠিকানা ফোন নম্বর দিয় যাস। অরিন্দম খবরের কাগজটা ভাঁজ করে বিছানায় নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়, চল তোদের ‘সী অফ’ করে দিয়ে আসি। মিতালীর দিকে ফিরে বলে, তুমি শিক্ষিতা, আমার স্ত্রী যদি কোনো ভুল কথা বলে থাকে, ক্ষমা করে নিয়ো মা।

ওদের গাড়ি চলে যেতেই সদর বন্ধ করে অরিন্দম সাবিত্রীর হাত ধরে। বলে, ‘আমি তো আছি।’

সাবিত্রী তার জলভরা দুচোখ তুলে অরিন্দমের মুখের দিকে তাকায়। এক দুঃসহ অবরুদ্ধ কান্নায় সবিত্রী অরিন্দমের বুকে ভেঙে পড়ে।

অজয়রা চলে গেছে। ওদের খালি ঘরটা সাবিত্রীকে যেন গিলে খেতে চাইছে। জমজমাট হাসিখুশি ভরা সুন্দর সংসারে স্রোত যেন অন্যখাতে বইতে শুরু করেছে। সেই স্রোতে অজয় আর মিতালী হারিয়ে গেল। ওরা চলে গেছে আজ তিনদিন হল। কিন্তু তিনদনি নয় যেন তিনটে বছর।

সাবিত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আজই সুজয়ের ফেরার কথা। ওর বৌ আঙ্খ কাংখা এখন বাপের বাড়িতে। সাবিত্রীই বলেছিল, ‘এটা তুই খুব ভালো করলি। তুই থাকবি না। ও বেচারা একা একা আমাদের কাছে কী করত। শুধু শুধু বোর হোতো। কটা দিন মায়ের কাছে থাকলে মনটা ভালো থাকবে।’

যাবার সময় আকাংখা খুশি খুশি মুখে সাবিত্রীকে প্রণাম করে বলেছিল, ‘আসছি মা।’

সাবিত্রী ভাবে একটু পরেই হয়তো সুজয়ের সঙ্গে আকাংখা ফিরবে। এসে অজয় আর মিতালীকে না দেখে চমকে যাবে। কিন্তু সাবিত্রী এবার আর কোনো ভুল করবে না। আকাংখা এলেই ওর হাত ধরে ভিক্ষে চেয়ে নেবে। বলবে, ‘ভিক্ষে দাও বৌমা। তোমাদের কাছে আমি জোড় হাতে ভিক্ষে চাইছি। আমাদের ছেড়ে, এ বাড়ি ছেড়ে তোমরা যেও না। কোনো কথা বলব না। শুধু চোখের দেখা দেখতে পেলেই খুশি। আর কিছু চাই না।’ সাবিত্রীর দুচোখে জল ভরে আসে।

তাদের বাড়ির সামনে একটা বড়ো গাড়ি থামার শব্দ হল না? তাহলে নিশ্চয় সুজয় ফিরল আকাংখাকে নিয়ে। সাবিত্রী দ্রুত পায়ে দরজা খুলে ভীষণ চমকে ওঠে। কিছু লোকজনের সঙ্গে সুজয়কে দেখে বলে, ‘তুই? আকাংখা আসেনি? এরা, এরা কারা?’

সুজয় ম্লান হাসে। ‘আকাংখা আসেনি। কিছু মনে করো না। বড়ো বৌদির সব বলেছে। তাই তৈরি হয়েই এসেছি। আমাদেরও এখানে থাকা হবে না। আমি চাই না বড়ো বৌদির সঙ্গে তোমার যা হয়েছে তা আকাংখার সঙ্গে হোক। এসব অংকুরেই বিনাশ হয়ে যাওয়া ভালো।’

—সুজয়। তুই বিশ্বাস কর। ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি। সব ভুল, সব মিথ্যে। আর তোর মাকে চেনার জন্য তোর বৌদির সার্টিফিকেট লাগবে?

—থাক, থাক আর দিব্যি করতে হবে না। দাদা-বৌদির ঘরে রোজ আড়ি পাড়তে তোমার লজ্জা করল না? তুমি যে এত নীচ জানতাম না। নোংরামি আর বাড়াতে চাই না মা। বাবাকে বলে দিও, আমি মালপত্তর নিয়ে চলে যাচ্ছি।

অরিন্দম নিজেই উঠে এসেছে। বলে, ‘আসবি তো, না আর আসবি না?’

—তোমরা চাইলে নিশ্চয় আসব। না চাইলে আসব না।

সাবিত্রী রুদ্ধকণ্ঠে বলে, ‘মা-ই তো যত দোষী! মায়ের জন্যেই তোরা চলে যাচ্ছিস। মা মরলে আসিস।’ সাবিত্রী দুহাতে মুখ ঢেকে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। সাবিত্রী নিজের ঘরে বসে লরি ছেড়ে চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পায়। সুজয় একবার প্রণাম করতেও এল না। ক’দিন বাদে ফিরে, এক গ্রাস জল পর্যন্ত খেল না। অরিন্দমের পায়ের শব্দে সাবিত্রী মুখ তোলে। অরিন্দম কাছে এসে সাবিত্রীর মাথায় সস্নেহ হাত রাখে। বলে, ‘যারা যাবার তারা গেছে। যে তোমার কাছে আসার সে তোমার কাছে এসেছে। ওঠো সাবিত্রী। এভাবে কেঁদে নিজেকে দুর্বল করো না। কেউ না থাক আমি তো আছি।’

অরিন্দমের কণ্ঠস্বরে সাবিত্রী চমকে ওঠে, একমুখ হেসে বলে, ওমা, তুমি উঠে পড়েছ? কখন উঠলে?

—‘এই তো, এইমাত্র। উঠেই দেখলাম তোমার চোখের দৃষ্টি তোমার মনের সঙ্গে কোন সুদূর নীহারিকা পুঞ্জে যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তোমার চোখের সামনে হাত নাড়লাম। তাতে তোমার ধ্যান ভাঙল না।’ শেষে অরিন্দম চুপ করে দুষ্টুমিভরা চোখে তাকিয়ে থাকে।

—ওমা, কী দেখছো এমন করে?

—যা বলে ডাকলাম।

—মানে?

—আমার মিষ্টি বৌ। ব্যাস, দেখি তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছো।

সাবিত্রী এবার হেসে ফেলে। বলে, ‘তোমার মিষ্টি বৌ এবার বলছে তোমায় মিষ্টি মিষ্টি মুখ করে বাথরুমে চলে যেতে।’

—ওকে!! গিন্নির ইচ্ছেয় কর্ম্ম।

বাথরুমে ঢুকে অরিন্দম খুশি খুশি গলায় চেঁচিয়ে বলে, ‘কী করেছো! সব রেডি। চানের জল থেকে এভরিথিং। থ্যাংঙ্ক ইউ, থ্যাংঙ্ক ইউ সো মাচ।’

—হয়েছে মশাই। আর থ্যাঙ্ক ইউ দিতে হবে না। এখন তাড়াতাড়ি এসো। জলখাবার রেডি। এখন খেতে দেরি হলে দুপুরে খেতে পারবে না।

সাবিত্রী অরিন্দমের বিছানা গুছিয়ে রাখতে রাখতে ভাবে আজ কুড়িদিন পর আবার সে অরিন্দমের বিছানা গোছাচ্ছে। যা গেল ঝড় ভাবতে ভয়ে বুক কাঁপে। আশ্চর্য!! বাপের এতবড়া অসুখ গেল, না অজয় না সুজয়—কেউ কেউ একদিনের জন্যে একবার দেখতেও এল না। আসবে কেন? বাবা-মা এখন পর। শ্বশুরবাড়ি এখন আপন। সাবিত্রীর হয়েছে চোরের মায়ের কান্না। কাকে বলবে আর কেই বা শুনবে। অজয়ের সেদিনের কথাগুলো গলন্ত সীসের মতন কানের ভেতর দিয়ে গিয়ে বুকটা যেন পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল।

ম্যাসিভ স্ট্রোকে অরিন্দম তখন অজ্ঞান। ডাক্তার এসে বললেন, ‘এক্ষুনি আই.সি.ইউতে ট্রান্সফার করতে হবে। এছাড়া কোনো পথ নেই।’

কোনো বড়ো নার্সিংহোম বা হাসপাতাল ছাড়া আই.সি.ইউ পাওয়া যাবে না। সাবিত্রী ডাক্তার নির্দেশিত ‘ড্রিম ভিউ’ নার্সিংহোমে ফোন করে। ফোনে কোনো সুরাহা হয় না। ওদের চারটে অ্যাম্বুলেন্সই জরুরি কলে বাইরে। প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্সের ফোন নং সাবিত্রীর জানা নেই। এখন কী উপায়? কী করবে সাবিত্রী? অরিন্দমকে এখুনি ভর্তি করতে না পারলে——হঠাৎ মনে পড়ে, অজয় খুব সুন্দর একটা গাড়ি কিনেছে। গাড়িটা দেখাতে এনেছিল। ভদ্রতা করে মুখে অবশ্য বলেছিল, একদিন তোমাদের ঘুরিয়ে আনব। সে ঘোরানো আজও হয়ে ওঠেনি। সাবিত্রী জানে কোনোদিন হয়েও উঠবে না। কারণ গাড়ির আসল মালিক অজয় নয় মিতালী। গাড়িটা মিতালীর নামেই কেনা। কিন্তু এখন অত ভাববার সময় নেই। সাবিত্রী দ্রুত টেলিফোন তুলে অজয়কে ওর মোবাইলে রিং করে। অজয়কে পাবে কিনা ভগবান জানে। একটা অনিশ্চিতের দোলায় দুলতে দুলতে ফোনের অপর প্রান্তে অজয়ের গলা পেয়ে সাবিত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

—কে অজয়। আমি তোর মা বলছি।

—‘কি হল?’ অজয়ের নিস্পৃহ নিরাসক্ত গলা আছড়ে পড়ে।

সাবিত্রী একদমে কথাগুলো বলে, ‘তোর বাবার ম্যাসিভ স্ট্রোক হয়েছে। ডাক্তার ড্রিম ভিউ নার্সিংহোমের আই.সি.ইউ-তে ভর্তির জন্য লিখে দিয়েছে। ওদের সবকটা অ্যাম্বুলেন্স কলে বেরিয়েছে। তুই তোর গাড়িটা নিয়ে এখুনি চলে আয়। তোর বাবাকে এক্ষুনি নার্সিংহোমে শিফট করা দরকার—।’ কথাগুলো বলতে পেরে সাবিত্রী যেন বেঁচে যায়।

কিন্তু ফোনের অপর প্রান্তে অজয়ের কোনো সাড়া না পেয়ে সাবিত্রী

অবাার বলে, 'হ্যালো অজয়! তুই আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?'

অজয়ের নিস্পৃহ কণ্ঠ ভেসে আসে। 'শুনে কী করব? তুমি গাড়ি চাইছ। কিন্তু জানো তো গাড়ি আমার নয়। যার গাড়ি, সে নিয়ে তার বাবার কাছে গেছে।'

—'সে কী রে? তাহলে কী করব?' সাবিত্রী দুচোখে যেন অন্ধকার নেমে এসেছিল।

—কী আর করবে? কাউকে ধরে পাকড়ে অন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে নাও।

মরিয়া হয়ে সাবিত্রী বলে, 'মিতার বাপের বাড়ি তো দূর না। ওকে ফোনে ডেকে নিতে পারিস না?'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মা? এক একটা এমন অবাস্তব কথা বলো না। আজ ওর ভাইয়ের জন্মদিনের পার্টি। আমি ওকে ডিসটার্ব করতে পারব না।'

'তাহলে তুই অন্তত চলে আয়।'

'আমি এখন রাস্তায়। বোর্ডের জরুরি মিটিংএ যাচ্ছি। আমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব।'

'তোর বাবা মরতে বসেছে। আর তুই মিটিং এর কথা বলছিস?'

'দেখো, আজেবাজে কথা বলে আমার মাথা খারাপ করে দিও না। বাবার বয়স হয়েছে। বাবা মরে গেলে কারোর কোনো ক্ষতি হবে না। শুধু তোমার মাছ খাওয়াটা বন্ধ হবে। আর আমার চাকরি গেলে, আমার বৌ-বাচ্চা উপোস করে মরবে। বুঝলে?'

'অজয়!! তুই এতবড়ো কথা, মুখে আনতে পারলি? যে লোকটা তোদের জন্য—' রুদ্ধ কান্নায় সাবিত্রীর কণ্ঠ রোধ হয়ে যায়।

'এসব ন্যাকামি কান্না আমার দেখার বা শোনার সময় নেই। যদি টাকা-ফাকা কিছু দরকার হয় তো জানিয়ো—তবে কতটা পারব জানি না। গাড়ি বাড়ি কিনে অনেক লোন হয়ে গেছে। মাসে মাসে অনেক টাকা কেটে নিচ্ছে। তুমি বরং সুজয়কে একবার—'

বাকি কথা শোনার জন্য সাবিত্রী আর অপেক্ষা করেনি। পাড়ার লোকেদের সাহায্যে সেদিন কীভাবে যে ঐ মরণাপন্ন রোগীকে নিয়ে ড্রিম ভিউতে পৌঁছে ছিল তা শুধু ভগবানই জানেন। জলের মতন অর্থ ব্যয় হয়েছে। দিনরাত এক করে কীভাবে সময়টা কেটেছে তা সাবিত্রী এখন ভাবতেও পারে না। আর আশ্চর্য! সুজয়কে ফোন করে ঠিক যেন অজয়ের উত্তরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিল। মনে হয়েছিল সুজয়ের গলায় অজয়ই কথা বলছে। সাবিত্রীর সারা মুখে দুঃশ্চিন্তার ছায়া। একটু সুস্থ হতেই অরিন্দম ছেলেদের দেখবার জন্যে পীড়াপিড়ি করাতে সাবিত্রীকে বাধ্য হয়ে সব মিথ্যে বলতে হয়েছিল। আজ পর্যন্ত যা কখনো করেনি তাই করেছে সাবিত্রী। মিথ্যে কথা বানিয়ে বলেছে, 'ওরা দুজনেই অফিসের জরুরি কাজে বাইরে গেছে।' এখন পর্যন্ত ঐ মিথ্যেটাই বহাল আছে। সাবিত্রী জানে না এবার অরিন্দম ওদের কথা জানতে চাইলে বা ও নিজেই যদি ছেলেদের ফোন করতে চায় তাহলে কী জবাব দেবে বা কী করবে সাবিত্রী!

দুপুরবেলা খেতে বসে অরিন্দম হেসে ফেলে, বলে, 'এসে দেখছি জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ খাওয়াতে বসেছ। আমি কালই যে হাসপাতাল থেকে ফিরছি সেটা কী ভুলে গেলে গিন্নি?'

—'কিছু ভুলিনি মশাই। আগেই ডাক্তারকে সব জিজ্ঞেস করে নিয়েছি। তেল-মশলা ছিটেফোঁটা দিয়েই রেঁধেছি। তবে হ্যাঁ, চাপ করে খাবে না। যেটুকু ভালো লাগে হালকা করে খেয়ো। পেসাদ রেখো, ঐটেই আমারও খাওয়া।'

—'তাই! তাই বলো!! পাতে যা দিয়েছ এতো দুজনেরই খাবার। তাহলে এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় কেন? এসো, বসে পড়ো আমার সাথে।'

—'তুমি আমার এঁটো খাবে? বৌয়ের এঁটো স্বামীদের খেতে নেই।'

—'তাই নাকি?' অরিন্দম দুষ্টু করে হাসে। বলে, 'তুমি আমার মুখ কোনোদিন এঁটো করোনি বুঝি?'

সাবিত্রী লজ্জায় লাল হয়। বলে, 'ছিঃ, খালি অসভ্যতা। অরিন্দম সাবিত্রীর হাত ধরে টেনে বসায়। বলে, 'বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা।'

—মানে?

'মানে এই, বলে অরিন্দম এক গ্রাস তরকারি মাখা ভাত তুলে সাবিত্রীর মুখে দিয়ে বলে, 'লেডিস ফার্স্ট।'

সাবিত্রী অরিন্দমের কাছ থেকে হঠাৎ এ জাতীয় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এখন তার মুখ ভর্তি, তাই কোনো কথা বলতে পারে না। অরিন্দম হো হো করে হেসে ওঠে বলে, 'কেমন জব্দ!!' অরিন্দম এবার একগ্রাস নিজের মুখে তুলে বলে, 'কী রেঁধেছো মাইরি। সলিড!! এ রান্না ছাড়া, আই মিন এ রান্নার মালিক তোমাকে ছেড়ে আমি আগে মরে যাব? ফুঃ!! অত কাঁচা বেহিসাবী মানুষ অরিন্দম নয়। দেখছ না, যম ব্যাটা কম টানাটানি করল, কিছু নিতে পারল? শুধু তোমার জন্য আমায় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল।'

সন্ধ্যে হয়ে আসছে দেখে সাবিত্রী অরিন্দমের পাশ থেকে উঠে সব ঘরে আলোগুলো জ্বেলে দেয়। হাসিমুখে বলে, 'তুমি এসেছ চব্বিশ ঘন্টা পার হয়ে গেছে। সময়টা যেন ঝড়ের মতন কেটে গেল, না গো?'

—সে তোমার কল্যাণে সখী।

সাবিত্রী বলে, 'শুনছ, এবার কিন্তু ডাক্তারকে রিপোর্ট দিতে হবে। ডাক্তার সন্ধেবেলা ফোন করতে বলেছিলেন। কী বলব বলোতো? তোমার শরীরটা কেমন লাগছে? স্পেসিফিক কোনো প্রবলেম নেই তো?'

—একটা কষ্ট হচ্ছে—!

—কষ্ট হচ্ছে?' সাবিত্রীর মুখ শুনিয়ে যায়। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, 'কোথায়, কী হচ্ছে? কই এতক্ষণ কিছু বলোনি তো? খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'খু-ব।' অরিন্দমের মুখে চটুল হাসি। বলে, 'বলে কী হবে? তুমি কী শুনবে? খালি উঠছ আর উঠছ। একটু সুস্থির হয়ে পাশে দুদণ্ড বসতেও পারো না। আর তুমি উঠলেই, অরিন্দম নিজের বুকে হাত দিয়ে বলে, 'এইখানে কষ্ট হচ্ছে।'

'ওমা! কী মানুষ তুমি! এভাবে কেউ বলে? কী ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।' সাবিত্রী অরিন্দমের কাছে এসে অরিন্দমের মাথাটা নিজের বুকে টেনে স্নেহের পরশ দিয়ে বলে, 'আমার কী তোমার কাছ থেকে

উঠতে ইচ্ছে করে? কিন্তু আমাকে সাহায্য করার কে আছে বল? তুমি অসুস্থ। সংসার মানেই কাজ আর কাজ। ভেবেছিলাম ছেলের বৌরা এলে মিলেমিশে সব কাজ করব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। আসলে ওসব সুখ আমার ভাগ্যে নেই, পাব কী করে বলো?'

অরিন্দম বলে, 'যাক্ গে, ওসব কথা, ছাড়ো। সংসারে তুমি আমার, আর আমি তোমার। এইটেই আমাদের প্রথম এবং শেষ কথা।'

সাবিত্রী অরিন্দমের মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বলে, 'ডাক্তারকে ফোনটা করে নিই, কেমন? রিপোর্টটা না দিলে ওষুধ ঠিকমতো দেবে কী করে?'

সাবিত্রী ফোন করতে ড্রইংরুমে ঢোকে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে সাবিত্রী অরিন্দমের কাছে ফিরে আসে। বলে, আমাকে আধঘণ্টার জন্যে একবার বেরুতে হবে গো। ডাক্তার বললেন, ফোনে হবে না। আমাকে যেতে হবে। উনি প্রেসক্রিপশন চেঞ্জ করবেন। আমি চাবি দিয়ে যাব আর আসব। তুমি যেন ওঠাউঠি কোরো না। আমি তোমার মোবাইলটা নিয়ে যাচ্ছি। যদি কিছু বলার থাকে তো—'

সাবিত্রীর কথায় অরিন্দম হাসে। হাসতে হাসতে বলে, 'তো? তো কি করতে হবে?' অরিন্দমের কথায় সাবিত্রী হাসে। বলে, 'তুমি একবারে ছেলেমানুষ। দেখছো, একটা দরকারি কাজ করতে যাচ্ছি।'

অরিন্দম হাসি মুখেই বলে, 'আসলে আজ তোমায় ছাড়তে মন চাইছে না। আজ বরং গিয়ে কাজ নেই। আমার কাছে বোসো। কাল সকালে যেও।'

'এমন করতে নেই লদীটি। যাব আর আসব। ওষুধটা না খেলে কী করে চলবে। কত বড়ো অসুখ থেকে উঠলে। কেউ আনার থাকলে আমি কি যেতাম? প্লিজ আসছি কেমন।' সাবিত্রী দরজার বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যায়।

ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই সাবিত্রী দুচোখে অন্ধকার দেখে। মাথাটা ঘুরে যায়। অরিন্দম মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। ফোনের রিসিভারটা টেবিল থেকে মাটিতে ঝুলছে। তবে কী? তবে কী? সাবিত্রী একরকম ছুটে অরিন্দমকে ধরে অনেক কষ্টে সোফায় তুলে শোওয়ায়। কলার আইডি ফোন। সুইচ টিপে পরপর অজয় সুজয়ের ফোন নং দেখে সাবিত্রীর বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে না। ডাক্তারকে ফোন করতে গিয়ে সাবিত্রী কেঁদে ফেলে। বলে, 'ডাক্তারবাবু আপনি শিঘ্রী আসুন। ও অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

'হোয়াট?' ডাক্তার বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে বলেন, 'আই অ্যাম জাস্ট কামিং।' দ্রুত ফোন রেখে সাবিত্রী ছুটে গিয়ে অরিন্দমের চোখে মুখে অল্প অল্প জল ছিটিয়ে দিতেই অরিন্দম ধীরে ধীরে চোখ খুলে সাবিত্রীর দিকে একবার তাকায়। সাবিত্রীর মনে হল অরিন্দমের দুচোখের দৃষ্টিতে নীরব ভৎর্সনা ঝরে পড়ছে। যেন বলছে, 'ছিঃ ছিঃ তুমি আমাকে এতদিন সব মিথ্যে বলেছ? ঠকিয়েছ?' অরিন্দমের মুখে কোনো কথা ফোটে না। শুধু চোখ দুটো ধীরে ধীরে বুঁজে যায়। ঘাড়টা হঠাৎ একদিকে এলিয়ে পড়ে।

'অরিন্দম! অরিন্দম!!' সাবিত্রীর বুক ফাটা কান্না বন্ধ ঘরের চার দেওয়ালে ব্যর্থ হাহাকার ভরা প্রতিধ্বনি তোলে। মস্ত বড়ো ভুল হয়ে গেছে। ছেলেদের সম্বন্ধে সত্যি কথাগুলো ওকে বলে দেওয়া তার খুব উচিত ছিল। হঠাৎ ধাক্কাটা বিনা মেঘে বাজ পড়ার মতোনই তাই ওর ওপর নেমে এসেছে। কলিং বেলটা বেজে উঠতেই সাবিত্রী পাগলের মতো ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। সামনে ডাক্তারকে দেখে সাবিত্রী আছড়ে কেঁদে ওঠে, 'শিগগীর দেখুন ডাক্তারবাবু, ও কেমন করছে।'

ডাক্তার বিভিন্নভাবে অরিন্দমকে পরীক্ষা করে হতাশ মুখে উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'হি ইজ ডেড। ম্যাসিভ অ্যাটাক। স্ট্রেঞ্জ!! আপনার কাছ থেকে এত ভালো রিপোর্ট পেলাম অথচ উইদিন হাফ অ্যান্ড আওয়ার হি ইজ ডেড? চিকিৎসা করার কোনো টাইম দিলেন না।' ডাক্তারবাবুর চোখ দুটো বিষাদে ভরে ওঠে। বিষাদ ভরা কণ্ঠে বলেন, 'আই অ্যাম সো সরি। একদিন যমে মানুষে যুদ্ধ করে সুস্থ করে বাড়ি পাঠালাম। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই যে এভাবে ওঁকে হঠাৎ হারাতে হবে, ভাবতেও পারছি না। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কি কোনো—আইমিন, কোনো কথা কাটাকাটি বা অশান্তি—কিছু মনে করবেন না, হঠাৎ কোনো মেন্টাল শক্ থেকে এরকম হওয়া সম্ভব। তাই, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, অ্যাজ এ ডক্টর আমি—'

সাবিত্রী জলভরা দুচোখে শুধু ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। অজয়-সুজয়ের নাম গলায় দলা পাকিয়ে আটকে থাকে, মুখে ফোটে না। তার অসহায় দুচোখে শুধু সব হারানোর আকুতি ঝরে পড়ে। সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার সহানুভূতি মাখা কণ্ঠে বলেন, 'বুঝেছি। আপনার মত সফট নেচার আর পতিবৎসল মহিলার থেকে ওঁর কোনো মানসিক আঘাত পাওয়া, আমি অন্তত বিশ্বাস করতে পারব না। এনিওয়ে কী হয়েছে তা আর কোনোদিন জানা সম্ভব হবে না আমার ফরম্যালিটিগুলো আমায় সারতে হবে। কারণ উনি আমারই চিকিৎসাধীন ছিলেন।'

ডাক্তার তাঁর প্যাডে খসখস করে অরিন্দমের ডেথ সার্টিফিকেট লিখে সাবিত্রীর হাতে দিয়ে বলেন, 'এটা সামলে রাখুন। শ্মশানে এটার দরকার সবচেয়ে আগে হবে।' সাবিত্রী ডেথ সার্টিফিকেটটা ডাক্তারের হাত থেকে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরে, এক অবরুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার দুচোখের সামনে শুধু নিকষ কালো অন্ধকার। কোথাও কোনো আলোর আভাসের চিহ্ন মাত্র নেই। যন্ত্রচালিতের মতো কোনোমতে আলমারি খুলে টাকা বের করে ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে ধরে। রুদ্ধ ভাঙা কণ্ঠস্বর তার গলা থেকে উঠে আসে।

ডাক্তারবাবু, আপনার ফিসটা—

'ছিঃ ছিঃ, আমি ডাক্তার—কসাই নই। এত অমানুষ এখনো হতে পারিনি। ওটা রাখুন। অনেক দায়িত্ব, অনেক খরচ এখন আপনার সামনে। এই বিপদের দিনে আপনার কাছে কাউকে দেখছি না। আই মীন—আপনার ছেলেমেয়ে? ওদের কাউকে তো দেখছি না। তাছাড়া, আর কোনো আত্মীয়-স্বজন? কাকে কাকে খবর দিতে হবে বলুন। আমি দিয়ে দিচ্ছি। ফোন নম্বর বলুন—।'

সাবিত্রী কী বলবে, ডাক্তারের কথার কী উত্তর দেবে? এর উত্তর তো তার জানা নেই। যে ফোন নাম্বার তার জানা ছিল, তাদেরকে ফোন করতে গিয়েই যে মানুষটা অকালে চলে গেল—কী করে বলবে ডাক্তারকে? ছেলেদের মনের তিক্ত গরলের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে যে লোকটা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল, সেই ফোন

নাম্বারগুলোই কি সে ডাক্তারকে দেবে? পরোক্ষভাবে তাদের ছেলেরাই যে তাদের বাবাকে এ পৃথিবীর মায়া কাটাতে বাধ্য করেছে, তার মাথার সিঁদুর মুছিয়ে দিয়েছে, তেল থাকতেও যে প্রদীপটা অকালে নিভে গেল তার কারণ যে তার ছেলেরাই—এ কথা সে ডাক্তারকে কী করে বলবে? কী করে বলবে অরিন্দম নামের সদা হাস্যময় আনন্দময় পুরুষটা সংসার মন্থন করে অমৃত আনতে গিয়ে বাসুকির বিষের জ্বালায় নিজেই জ্বলে পুড়ে এ ভাবে শেষ হয়ে গেল? সাবিত্রী কি পাথর হয়ে গেছে? ডাক্তারের কথাগুলো সে কি শুনতে পাচ্ছে? তবে তার মুখে দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না কেন? কত কথাই তো এক সঙ্গে ভিড় করে তার মনের দরজায় এসে ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু সাবিত্রী কেন সাড়া দিতে পারছে না?

‘কী হল বলুন?’ ডাক্তারের অবাক বিহ্বল কণ্ঠস্বরে সাবিত্রী যেন পাষাণলোক থেকে কঠোর বাস্তবে ফিরে আসে। ধীরে ধীরে অশ্রু মাখা মুখ তুলে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, ‘আপনার এ সহানুভূতির জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। কাউকে খবর দিতে হবে না।’

‘দেখুন, আপনি বললেও আমি মানতে পারছি না। সবটাই যদিও আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবুও ডাক্তার হিসাবে, একজন মানুষ হিসাবে, আমারও একটা মরাল ডিউটি আছে। আফটার অল আমরা সামাজিক জীব। তাই আপনি না চাইলেও, আমি এ পাড়ার ছেলেদের বা প্রতিবেশী কাউকে খবর দিয়ে যাচ্ছি। আপনার মানসিক ভারসাম্য, খুবই স্বাভাবিক ভাবে, এখন যে অবস্থায় আছে—আপনাকে এভাবে রেখে যেতে আমারই খারাপ লাগছে। কিন্তু আমারও কিছু আরজেন্ট পেশেন্ট দেখতে যেতে হবে। আমি আবার খবর নেব। চলি ম্যাডাম, প্লিজ টেক কেয়ার অফ্ ইওরসেলফ। নিজের প্রতি একটু খেয়াল রাখুন। বাস্তব বড্ড কঠোর, নিষ্ঠুর। তবুও চলতে হবে। কারণ চলাই জীবনের সবচেয়ে বড়ো ধর্ম।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে যান। দরজাটা খোলাই পড়ে থাকে। কাছে গিয়ে দরজা বন্ধ করার মতো চলার শক্তি বা মানসিকতা, কোনোটাই এখন সাবিত্রী নেই। একবার শুধু সেইদিকে তাকিয়ে সাবিত্রী ধীর পায়ে অরিন্দমের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে একদৃষ্টে অরিন্দমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী আশ্চর্য প্রশান্ত মুখে অরিন্দম শুয়ে আছে। যেন গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে। বাসুকির বিষের জ্বালার কোনো ছায়া নেই এই মুখে। যে বেদনা নিয়ে, যে জ্বালা নিয়ে, যে ব্যথা ভরা হতাশা আর অপমান বুকে নিয়ে লোকটা চলে গেল, তার কোনো রেশ নেই কেন মুখে? মানুষ তখন চলে যায়, তখন পার্থিব সবকিছু, মার বুকের বেদনা পর্যন্ত, বোধহয় এই ভাবেই ফেলে চলে যায়।

চিরঘুমে ঘুমন্ত অরিন্দমের মুখের দিকে নির্মিশেষে তাকিয়ে দেখতে দেখতে এক অপরিসীম সহানুভূতিতে সাবিত্রীর মনটা ভিজে ওঠে। একটু আনন্দ, একটু খুশি, একটু অপত্যস্নেহের পরশ পেতে গিয়ে, এক বুক গরল নিয়ে মানুষটা এভাবে চলে গেল।

সাবিত্রী অরিন্দমের বুকে তার স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিতে থাকে। যেন সেই প্রেমের পরশ মাখা অনুভূতি এ পৃথিবীর গণ্ডি পেরিয়ে সেই অমৃতলোকে অরিন্দমের কাছে যেন পৌঁছে যাচ্ছে। সাবিত্রীর ঠোঁট দুটো অরিন্দমের কপাল আর কপোলে তার প্রেমের চুম্বনে ভরিয়ে দেয়। পাগলের মতো চুমু খেতে খেতে হঠাৎ বাঁধভাঙা এক রুদ্ধ কান্নায় অরিন্দমের বুকে মাথা ঘষতে থাকে। অরিন্দমের সাদা সার্টের বুকের কাছটা লাল সিঁদুরের রঙে রেঙে ওঠে, ‘সব মুছে দেব, সবমুছে দেব। তোমার বুকেই সব মুছে দেব।’

সাবিত্রী নিজের মনেই বিড়বিড় করে বকে। ‘তুমিই পরিয়েছিলে—তোমার বুকের ভালোবাসার রঙে রাঙিয়েছিলে। কথা দিয়েছিলে আমায় ছেড়ে কখনো যাবে না। যখন কথা রাখলে না, চলে গেলে— তখন নিয়ে যাও, যা তুমি দিয়েছিলে। যা দিয়ে আমার জীবন নূতন করে সাজিয়েছিলে, সব নিয়ে যাও, সব নিয়ে যাও। কিছু চাই না আমি, কিচ্ছু চাই না।’ সাবিত্রী অরিন্দমের বুকে এবার পাগলের মতো মাথা ঘষতে থাকে। প্রচণ্ড কান্নার আবেগে তার শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। অরিন্দমের বুক থেকে মুখ না তুলেই সাবিত্রী রুদ্ধকণ্ঠে হিস হিস করে বলে, ‘পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ওগো তোমায় আমি বলিনি, বলতে পারিনি। অজয়-সুজয় আমাকে তোমার আগে অনেক আগে মেরে রেখে গেছে। আজ এই সাবিত্রী শুধু পোড়া তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে, শুধু তোমার মুখ চেয়ে। প্রাণটুকু টিকে আছে শুধু তোমার মুখ চেয়ে। সেই তুমিই তাকে এভাবে ফেলে চলে গেলে? আমি জানতাম, কঠোর বাস্তব বুঝিয়ে দিয়েছিল, আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই। তাই সব সহ্য করে শুধু তোমার জন্যেই বেঁচেছিলাম। যখন তুমি বুঝতে পারলে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, তখন এভাবে—’ কান্নার দুরন্ত আবেগে সাবিত্রীর মুখের কথা হারিয়ে যায়। অরিন্দমকে জড়িয়ে থাকা তার দেহটা শুধু বার বার কেঁপে উঠতে থাকে।

‘মাসিমা!’ আচমকা অপরিচিত কণ্ঠের ডাকে সাবিত্রী, অরিন্দমের বুক থেকে মুখ তুলে সামনে তাকায়।

আট-দশজন যুবক দাঁড়িয়ে। দরজা খোলা থাকায় আসতে অসুবিধে হয়নি। প্রত্যেকের চোখেমুখে অকৃত্রিম সহানুভূতি ঝরে পড়ছে

‘আমরা মাসিমা, এ পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা। ডাক্তারবাবু এই মাত্র খবর দিলেন। আপনি আমাদের আগে বলেননি কেন? চিনতে পারছেন না? আমি পল্টু। ভুলে গেলেন? মেসোমশাইকে আমরাই গাড়ি ডেকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেছিলাম। আপনার এতবড়ো বিপদ, আমাদের বললেন না? মেসোমশাই তো বেশ ভালো ছিলেন, হঠাৎ এরকম হল?’

সাবিত্রী কান্না অবরুদ্ধ আরক্ত ফোলা ফোলা চোখে, শুধু বোবার মতো তাকিয়ে থাকে। কিছু বলতে পারে না।

‘অজয়দা, সুজয়দারা আসেননি? বৌদিরা—কেউ আসেননি? ওদেরকে বলেননি? অজয়দা-সুজয়দা ছাড়া মুখাগ্নি কী করে হবে? নাম্বারটা বলুন—ওদের ফোন করে ডেকে নিই।

‘ফোন করে কিছু হবে না বাবা।’ সাবিত্রীর থমথমে গলায় ঝড়ের পূর্বাভাস।

‘কেন?’ পল্টুর কণ্ঠে অকপট বিস্ময়, ‘ওরা না হলে কী করে সব হবে?’

‘ওরা কেউ বেঁচে নেই বাবা।’ সাবিত্রীর কণ্ঠস্বরে যেন বিদ্যুত ঝলসালো। বাজ পড়ল ঘরের মধ্যে।

‘বেঁচে নেই?’ পল্টুর মুখটা হাঁ হয়ে যায়। ‘কী বলছেন? দুজনেই—মানে অজয়দা, সুজয়দা—’। পল্টুর মুখের কথা হারিয়ে যায়। ‘কবে?—মানে’ পল্টু তোতলাতে থাকে।

‘আজই’

সাবিত্রীর গলার স্বরটা গোঙানির মতো ভেসে আসে। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ। পেটের মধ্যে নূতন করে প্রসব যন্ত্রণা অনুভব করে যেন। তবে অজয় কি এখনো তার গর্ভে। যন্ত্রণার সঙ্গে নাড়িতে কেন টান ধরছে? মনে পড়ে, দুদিন ধরে যম যন্ত্রণার পর জন্ম হয়েছিল অজয়ের। ছেলের মুখ দেখে সব ভুলে গেছিল সাবিত্রী। সুজয়ের সময় সিজারিয়ান করতে হয়েছিল। পৃথিবীর আলো দেখাতে গিয়ে দু’ছেলের জন্যেই সাবিত্রীকে কম কষ্ট করতে হয়নি। কিন্তু সেই যন্ত্রণা কষ্টের মধ্যেও লুকিয়েছিল আগামীদিনের আলোভরা স্বপ্ন মাখানো সোনালি দিনের অনেক ছবি। সেই ছবিগুলোকে ছিঁড়ে দুপায়ে দলে পিষে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ওদের বাধেনি। সেই সোনালি স্বপ্নভরা ভবিষ্যৎ আজ মৃত অতীত। আর মৃত অতীতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আজকের মৃত বর্তমান। নীচ স্বার্থপরতার এক কালবৈশাখীর ঝড়ে বিধ্বস্ত বর্তমানের কাচঘরে তার অজয়-সুজয়ের কফিন শোয়ানো রয়েছে। অকাল মৃত্যু হয়েছে ওদের। সাবিত্রী হাজার ডাকলেও, আর ওদের সাড়া পাবে না।

—‘ওহ, গড!! আনবিলিভেবল! বিশ্বাস হয় না। এও সম্ভব!!’ পল্টুও যেন গোঙানির স্বরে বলে, ‘বুঝতে পেরেছি। মেশোমশাই অসুখ থেকে উঠে, এতবড়ো আঘাত সহ্য করতে পারেননি। আমাদেরই মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে। ‘পল্টু একটু থেমে বলে, কিছু ভাববেন না। ওরা নেই, আমরা তো আছি। আমরাও তো ছেলের মতোই। যা করার আমরাই করব।’

সাবিত্রী আঙুল তুলে স্টিল আলমারিটা দেখিয়ে বলে, ‘টাকাপয়সা ওতে আছে। যা দরকার নিয়ে যাও বাবা।’

‘ওসব নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না তো।’ পল্টুর দুচোখে জল। বলে, ‘মুখাগ্নি আমিই করব। আপনাকে কোনো কষ্ট করতে দেব না। আপনি একটু স্থির হন মাসিমা। মনে রাখবেন দুজন গেছে—এখনো দশজন আছে। আমরা সবাই আপনার—’ পল্টুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, ‘আধঘন্টার মধ্যেই সব গুছিয়ে নিয়ে আসছি।’

পল্টুর কথায় সাবিত্রী চমকে উঠে। পল্টু আর সব ছেলেদের চোখে জল। সাবিত্রী দেখে, এইসব ছেলেদের মধ্যে তার অজয়-সুজয় সেই সোনালি স্বপ্ন ভরা দিনগুলো গায়ে মেখে এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সাবিত্রী তার দগ্ধ মন দিয়ে এদের মধ্যে অজয়-সুজয়কে আবার নূতন করে, নূতন মন দিয়ে, ওদের শরীরের গন্ধ নিতে পারছে।

ছেলেদের দল বেরিয়ে যেতেই সাবিত্রী শূন্য দৃষ্টিতে খোলা দরজার দিকে একবার তাকিয়ে অরিন্দমকে বলে, ‘তুমি শুনতে পেয়েছ? পল্টুরা কী বলে গেল শুনতে পেয়েছ?’ সাবিত্রী অরিন্দমের নিষ্প্রাণ দেহে আলতো করে ঝাঁকুনি দিয়ে অরিন্দমের মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে বলে, ‘আজ তুমি সব শোনার বাইরে। না হলে বুঝতে পারতে আমার অজয়-সুজয় আবার নূতন করে ফিরে এসেছে। আর যদি একটু আগে এদের কথা শুনতে পেতে তোমায় তাহলে এভাবে অকালে চলে যেতে হত না। হ্যাঁ গো, আমি, আমিই ভুল করলাম। ভুলের ওপর ভুল। তুমি আমায় আজ ডাক্তারের কাছে যেতে বারণ করেছিলে। আমি শুনিনি। তোমার কাছে বসতে বলেছিলে—বসিনি। তাই তুমি আমায় এভাবে শাস্তি দিলে? অজয়-সুজয় বারবার আঘাত দিয়েছে। তুমি পাশে ছুটে এসেছ, বলেছ ‘আমি তো আছি।’ কৈ, কোথায় তুমি? কোথায় আমার পাশে তুমি আছে? কোথায়—কোথায়? বল, আমায় বল? এই যে তুমি আমার পাশে শুয়ে রয়েছ, এতে তুমি কোথায়? কে আমায় এখন পথ দেখাবে? কে আমার হাত ধরে বলবে—‘আমি তো আছি!’ সাবিত্রী অরিন্দমের বুকে মাথা রেখে চমকে ওঠে। ঐ তো, ঐ তো, তার গাওয়া গানটা অবিরাম সুরে বেজে চলেছে অরিন্দমের বুকের ভেতর থেকে!! সাবিত্রী তার কান চেপে ধরে অরিন্দমের বুকের সঙ্গে। বুকের ভেতর থেকে কবিগুরুর লেখা গানটা পরিস্কার ভেসে আসছে ‘দিনের শেষে, ঘুমের দেশে.../আমায় নিয়ে যাবি কে রে, দিনের শেষের শেষ খেয়ায়...’

সাবিত্রীর দুচোখে জল, মুখে ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের মুমূর্ষু পাণ্ডুর হাসি। বাঁদিকের বুকে ছুঁচ ফোঁটার তীব্র যন্ত্রণাটা সারা শরীরে চাবুকের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। কুল কুল করে ঘাম ছোটে—ঘামের স্রোত বয়ে যায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত। চোখ দুটো আপনা থেকেই বুঁজে আসছে। অরিন্দমের বুকের ভেতর গানের শেষ মুর্চ্ছনা বেজে চলেছে সেই একইভাবে একই লয়ে। দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। সাবিত্রীর বুকে এবার বড়ো হাঁফ ধরে। অরিন্দমের বুকের ওপর থেকে মাথা তুলে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে তার একান্ত নিজের মানুষটার মুখের দিকে। বুকে হাঁপরের মতো টান উথাল পাতাল করছে। তাকাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। তবুও সাবিত্রী তাকিয়ে থাকে।

‘আহা! ঘুমুচ্ছে, বড়ো শান্তির ঘুম। ঘুমোও, ঘুমোও। এতদিনে তবুও একটু শান্তিতে ঘুমুতে পেলে। আমারো ঘুম পাচ্ছে। কতদিন ভালো করে ঘুমুতে পারিনি। এবার ঘুমোবো—আঃ! কি শান্তি। তোমার বুকের শান্তির পরশ আমাকেও একটু দাও না গো।’ সাবিত্রী নিজের মনেই বিড় বিড় করে ‘কিন্তু একটা কথা তোমাকে যে বলা হয়নি। আর যে বলার সময় পাবো না। শুধু একটা কথা তোমায় লুকিয়েছি—হ্যাঁগো, শুধু একটা কথা। বুক ধরে তোমায় বলতে পারিনি। আমাদের অজয় সুজয়—’ সাবিত্রীর দমে টান পড়ে। অরিন্দমের বুকের ওপর দিয়েই নিজের বুকটা এক হাতে চেপে ধরে দম নেবার চেষ্টা করে, ‘হ্যাঁগো ওদের কথাই বলছি। তুমি জানতে ওরা তোমার দেওয়া আমার—আমার পেটের ছেলে। এটুকু তুমি ঠিক জানতে। কিন্তু তুমি জানতে না ওরা আমাদের কেউ নয়!—শুধু, এটুকু তোমায় বলতে পারিনি। গোপন করেছি। যাবার আগে তাই শেষবারের মতো বলে যাই ওরা তোমার ঔরসজাত, আমার গর্ভের সন্তান। তবুও, ওরা আমাদের ছেলে নয়। ...আ-মা-দের ছে-লে ন—য়।’

সাবিত্রীর কণ্ঠে জড়িয়ে থাকা তার শেষ কথাগুলো, অরিন্দমের বুকের ভেতর নীরবে বয়ে চলা শেষ খেয়া পারাবারের গানের সুরে মিশে বয়ে চলে এক অজানা ঠিকানার খোঁজে, কোনো এক অমৃতলোকের সন্ধানে।

ভোগ

ধৃতিরূপা দাস

১
মণীন গুপ্তর অনিলে ভেসে আছে তোমার টুকরোরা, তোমার
বৃন্তেরা। তোমার পশু-ডাক, কী যে ভীতু চলন অমোঘ আলো জুড়ে!
মায়ায় টলছি।

২
কবির মাথাটুকু, কবির ঢালু নিয়ে
ছবির চাষা দেখি, ছবির চাষানিটি
দুধে কাপড় নেই, দুপুর মেখে নিলো
দুহাতে পোষা হাঁস রাঁধতে,বাড়তে

৩
চাষী ও মাংসের মধ্যমণি হয়ে
মধ্য-পুকুরের জলে না-দেহ নাড়ি।
পূর্বজন্মেরা... ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের
কাঁকড়া ভাঙলেই দুধ ঝরে

৪
হতাশ করেছিলে। হতাশ করছোও।
হতাশ হচ্ছিও কেননা জল কম
কেননা আমাদের লাঙলে জান্তব
কাদার ওম নেই, ক্ষ্যাপা হাঁসেরা নেই

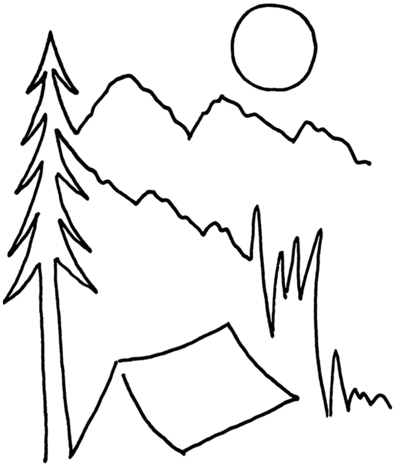

৫
পা ডেবে গেছিলো না থাকা জমিটিতে, ক্যানালে, অশরীরে। এখন
তার মেঘ, ফড়িং ধরে আছি, যদিও ছেড়ে দেব, মাঝে কিছুক্ষণ
পলিতে ভুগছি

৬
এ মায়া কৃষকের। কৃষক নেমে এলে
স্লোগান মুছে যায় রাস্তা মুছে যায়
যখন মুছে যায় অঘ্রাণ কুয়াশায়
অঙ্গ পুড়ে যায় অন্নের ধুলোতে

৭
রাস্তা মুছে গেলে স্লোগান মুছে গেলে
এ মাছে হাত রাখি ও মাছে হাত রাখি
রেঁধে ও বেড়ে খাই রেশনের অন্ন
মায়া ও ইহলোক ধানের জন্য

৮
হে মাছ কথা বলো! হে রং তোমাকেই
ভীষণ মানিয়েছে যতটা রাগ হয়
যতটা মুগ্ধতা এ মাসে জমবেই...
জমলে আলো-কোশে আহা খিদের তাপ!

৯
নেশাটা ফুরুলেই... নেশাটা ফুরুলেই
ছায়াটা কাঁপে-থামে, পাতাটা কাঁপে-থামে,
ছেলেটা ফল ছিঁড়ে লাঙল লাল করে,
রাজাকে ভাগ দিই সে জড় ব্রহ্মেরও

১০
রাজাকে ভাগ দিয়ে এ শীতে গুড় আনি, সে গুড়ে রং
আনি। রঙের মাঞ্জায় প্রাণীটি নাড়া খায়। রাজাকে ভাগ
দিয়ে প্রাণী-সম্বন্ধে আলোটা নাড়া খায়

১১
যে মথে ফেঁসেছিএটুকু ভিটেতে প্রেমিকা হাঁটছে পিঁপড়ে
হাঁটছে। কবির আগাছা পোড়াতে পোড়াতে, পরিত্যক্ত,
এখানে আনল

১২
জংগল-অভাবে যে পাশ ফিরে শুই
যে পাশে ধান বেশি, নিরপরাধ শিলা
যেটুকু স্রোতাঘাত, বিষ্ণু-ক্ষত দাগ
লুকোতে পারছে না, দুঃখ ভোগ করি

অন্তহীন

সর্বাণী বড়াল

হঠাৎ ভোরবেলের আওয়াজে ঘুম ভাঙলো রাই-এর। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখে সামনে এক রাশ অন্ধকার, কই সঞ্জয় তো নেই। ভালো করে ঘুম চোখ কচলে দেখলো। ভুল হচ্ছে তার। তাই সঞ্জয়কে না দেখতে পেয়ে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখলো। কারণ সে জানে তার ভালোবাসার মানুষটি খুনসুটি না করলে পেটের ভাত হজম হয় না। কিন্তু কই এবার তো সে এদিক ওদিক থেকে বেরিয়ে এসে তার গালদুটো ধরে আদর করলো না। খানিক উদাস মনে দরজা বন্ধ করে শোফায় ফিরে এল রাইকিশোরী। খানিক অন্যমনস্ক হয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে ডায়াল করলো সঞ্জয়ের নাম্বার। ঘন্টাতিনেক আগের মতোই যান্ত্রিক কণ্ঠে ভেসে এল, ‘আপনি যার নম্বর ডায়াল করছেন তাঁর সঙ্গে এই মুহূর্তে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না’। ঘড়িতে দেখল রাত বারোটা বাজে। সঞ্জয়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে কখন যে সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল তা বুঝতেই পারেনি।

টেবিলে সাজিয়ে রাখা খাবারগুলো ফ্রিজে তুলে ডাইনিংএর আলো নিভিয়ে শোয়ার ঘরে বিছানায় মাথা রাখল। এর আগে অনেক বার হয়েছে, প্লেন ল্যান্ড করার পর বৃষ্টির কারণে ওপরে উঠতে পারেনি সঞ্জয়। কিন্তু একটা ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে সে, কারণ সে জানে তার রাই দুশ্চিন্তা করলে হাইপার টেনশন হয়। নিজেকে স্বান্ত্বনা দিতেই রাই ভাবার চেষ্টা করল গত সাত বছরে বার চারেক এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সঞ্জয়। পরের দিন সকাল সকাল ফিরেও এসেছে, তাই খানিক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনোর চেষ্টা করতে লাগল রাই, ঠিকমতো ঘুম না হলে যদি মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়ে তাহলে সকালে ফিরে এসে খুব রাগ করবে সঞ্জয়।

প্রায় দুমাস পরে বাড়ি ফিরছে সঞ্জয়, তাই নতুন করে আর কোনো টেনশন তাকে দিতে চায় না রাই। ঘুমের চেষ্টা করেও কেন যে ঘুম আসছে না তার! শুধু মনে হচ্ছে একটা ফোন কেন করল না সঞ্জয়, যে একবেলা তার রাই-এর সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারে না, কী করে গোটা একদিন কথা না বলে থাকল সে। বিভিন্ন চিন্তা, দুশ্চিন্তার মধ্যেই যে কখন দু’চোখের পাতা এক হয়ে গেছে তা বুঝতেই পারেনি রাইসুন্দরী।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চা জলখাবার খেয়ে স্কুলে যায় রাই, কিন্তু আজ অজানা কোনো কারণে মনটা ভার হয়ে আছে, একেবারেই স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে না তার। কিন্তু উপায় নেই ছুটি নেওয়ার, সামনে পুজোর ছুটি আসছে, সিলেবাস শেষ করার চাপ আছে। অনিচ্ছা সত্বেও তৈরি হয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ল রাই। কিন্তু মন পড়ে আছে সঞ্জয়ের কাছে। স্কুলের সঙ্গে লাগোয়া কোয়ার্টারেই দুজনের সুখের সংসার। অন্যদিন পায়ে হেঁটে বাড়ি থেকে স্কুলে আসতে খুব বেশি হলে যে রাস্তা ৫ মিনিট লাগে আজ যেন মনে হচ্ছে পথ আর ফুরোচ্ছে না। প্রায় জোর করে শরীরটাকে টেনে টেনে অফিস পর্যন্ত এনে সব জোর যেন শেষ হয়ে গেল। কোনো রকমে তিন পিরিয়ড পর্যন্ত স্কুলে থেকে প্রায় দৌড়ে বাড়ি ফিরে দেখে তার আশঙ্কাই ঠিক, বাড়ি ফেরেনি সঞ্জয়। অন্যবার যখন এরকম দেরি হয়েছে তখন দুপুর বারোটার মধ্যেই চান খাওয়া শেষ করে অন্তত ১৮ বার মেসেজ করে সে পাগল করে দেয় তার আদরের রাইকে, কিন্তু এবার যেন একটা মানুষ কর্পূরের মতো উবে গেল। কোথায় গেল, কেন গেল কিছুই মাথায় আসছে না তার।

এবার বেশ ভয় পেয়ে স্কুলের কলিগদের জানাল রাই। শোনামাত্রই বেশ কয়েকজন এসে সব শুনে রাইকে বুদ্ধি দিল পুলিশকে জানাতে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাই তখন কলিগদের বুদ্ধি নিয়ে এক মুহূর্ত দেরি না করে থানায় ফোন করলো। হেডদিদিমনি হিসেবে স্থানীয় মানুষ রাইকে বেশ সম্মান করত। শোনা মাত্রই অফিসার এসে রাই-এর মুখ থেকে সব কথা শুনে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিলেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হল, শেষে রাত। এরমধ্যে এক এক করে জানা গেল সঞ্জয় ঠিক সময়ে নিউজার্সি থেকে রওনা হয়ে কলকাতায় পৌঁছয়, সেখান থেকে সে রাইকে ফোন করে জানায় কিছুক্ষণের মধ্যেই বাগডোগরার প্লেন ধরার কথা। তার পর থেকেই তার ফোন সুইচ অফ, আর অজ্ঞাত কারণে বাগডোগরার ফ্লাইট ধরেনি সে। পুলিশের কাছ থেকে এই তথ্য পেয়ে যেন নিজে কানে বিশ্বাস করতে পারছিল না রাই।

এক রাশ চিন্তা যেন কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল তাকে। হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ক্যানভাসে পরিষ্কার ছবির মতো ফুটে উঠছিল স্মৃতিমাখা এক একটি চিত্র। সদ্য কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট করে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় পাশ করে শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছে ডক্টর দম্পতির এক মাত্র আদুরে কন্যা রাইকিশোরী। হঠাৎই এক অনুষ্ঠানে দেখা সঞ্জয়ের সঙ্গে। সুপুরুষ, স্বল্পভাষী সঞ্জয় প্রথম দর্শনেই জয় করে নেয় বুদ্ধিদৃপ্ত, স্বল্পভাষী অপরূপ সুন্দরী রাইকিশোরীর মন। চার হাত এক হতেও বেশি সময় লাগল না, ১০ বছর রাই আর সঞ্জয়ের দুনিয়ায় এসেছে কত সুখ দুঃখ, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথ চলেছে ওরা। বিয়ের ৩ বছরের মাথায় সেদিন ছিল ওদের বিবাহবার্ষিকী, আনন্দ করে সকলে বেরিয়েছিল লং ড্রাইভে, হঠাৎ এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ওরা হারিয়েছে নিজেদের বাবা-মাকে, হারিয়েছে ৬ মাসের সন্তান, সঞ্জয়ের ডান পা আর রাই-এর চিরকালের জন্য মা হওয়ার স্বপ্ন। জীবনের এত বড়ো আঘাতও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনি জীবনী শক্তিকে। পরস্পরের হাত ধরে সুখেই কাটছিল ওদের দিন। এর মাঝেই শহর থেকে অনেক দূরে পাহাড়ে এক নামী স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে চলে আসে রাই। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয়ও চলে আসে রাই এর সঙ্গে। কাজের প্রয়োজনে বিদেশ সফর ছাড়া আর কোনো সময়ই সে চোখের আড়াল হতে দিত না তার রাইসুন্দরীকে। প্রতিবারের মতো এবারও তাড়াতাড়ি ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে সে, বিবাহবার্ষিকীতে এক সঙ্গে ডিনার করবে। গত ১০ বছর এটাই ছিল তাদের অভ্যেস বা পরস্পরের প্রতি কমিটমেন্ট। অভ্যাসবশত এ বছরও রাই সযত্নে টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল তার প্রিয়তমের।

রাই অনুভব করছিল চোখের জলে জীবনের চিত্রপটগুলো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, একটু একটু করে ভাবনার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে সে। প্রাণপণে সঞ্জয়ের হাতটা শক্ত করে ধরার চেষ্টা করছে কিন্তু বার বার স্লিপ করে আরও গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে সে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার অনভূতিতে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে তার। চোখ মেলে রাই দেখল অভিরূপ বসে আছে গম্ভীর মুখে। চোখ মেলতেই উদগ্রীব গলায় প্রায় ধমকের সুরেই অভিরূপ তাকে জানায় টানা দেড়দিন এই ভাবে অচৈতন্য হয়ে আছে সে। ডাক্তার বলেছে অতিরিক্ত স্ট্রেস থেকেই তার এই অবস্থা। ধীরে ধীরে বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসল রাই, অভিরূপকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল, সঞ্জয়ের হারিয়ে যাওয়ার কথা বলতে গিয়ে দুশ্চিন্তা আর অভিমানে গলা বন্ধ হয়ে এল, একটা দলা পাকানো কষ্ট যেন তার সমস্ত বাকশক্তি রোধ করে দিয়েছে।

যেদিন থেকে বোধবুদ্ধি হয়েছে সেদিন থেকেই অভিরূপ আর রাইসুন্দরীর বন্ধুত্ব। জীবনের নানা ওঠাপড়াতেও এতটুকু চিড় ধরেনি তাতে। যেদিন রাই সঞ্জয়ের হাত ধরে নতুন সংসার জীবনে প্রবেশ করেছিল, সেই দিন চোখের জল চেপে হাসিমুখে সব দায়িত্ব পালন করতে যে কী কষ্ট হয়েছিল তা শুধু অভিরূপই জানে, ভেতর ভেতর ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া মনের খবর আজও সে বুঝতে দেয়নি তার প্রিয়তমাকে, জীবনের প্রথম এবং শেষ ভালোবাসা তার রাইসুন্দরীকে। রাই যখন উঠে বসে তার বুকে মাথা রেখে অঝোরে কেঁদে চলেছে তখন দাপুটে চিকিৎসক অভিরূপের ভিতরটাও ভেঙে খান খান হচ্ছিল। ধীরে ধীরে রাইকে শান্ত করে ওর মনোবল ফেরানোর চেষ্টা করতে থাকে সে, কিন্তু রাই শিশুর মতো তাকে আঁকড়ে ধরে যেন কী যেন একটা খুজঁছিল, হয়তো আশ্রয়, হয়তো ভালোবাসা।

অনেক অনুনয় বিনয় সত্বেও অভির সঙ্গে ফেরেনি রাই। বচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আর সবার অলক্ষ্যে সঞ্জয়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতেই জীবনের ২০ টা বছর পার হয়ে গেল তার। না বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও গেছে সে, না কারুর সঙ্গে গল্পগুজব করেছে এই এতগুলো বছরে। শুধুমাত্র স্কুল আর বাড়ি, কেবল এক যন্ত্র চালিত রোবটের মতো শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। শুধুমাত্র অভি এলেই যা

একটু হাসি গল্প করত সে, সময়ের সঙ্গে সে অনুভব করছিল কাজ আর অভির জন্য অপেক্ষা কোথায় যেন সঞ্জয়ের চলে যাওয়ার কষ্টকে অনেকটাই লাঘব করেছে। আজ ২০ বছর পর রাইসুন্দরী বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, অভিরূপের ডাককে আজ আর সে অস্বীকার করতে পারেনি। হালকা ক্রিম রঙের শাড়ি, ছোট্টো একটা কালো টিপ আর অগোছালো হাত খোঁপায় আজ যেন স্বপ্নসুন্দরীর চেহারা নিয়েছে রাই। বহু বছর কোনো জনসমাগমে না যাওয়াতে একটা অস্বস্তি তো ছিলই মনে, কিন্তু অভির উষ্ণ আমন্ত্রণকেও উপেক্ষা করতে পারেনি সে। অভির বাড়িতে এসে খানিক অবাক না হয়ে পারল না রাই। বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুবই কম। বেশ বিস্ময় নিয়ে বাড়িতে ঢুকে শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল রাইয়ের।

সামনে এ কাকে দেখছে সে, এ তো ৩০ বছর আগের সঞ্জয় দাঁড়িয়ে তার সামনে। কী বলবে, কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না রাই, খালি অনুভব করছিল চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। রাইকে কোনো রকমে শান্ত করে একটা সোফাতে বসাল অভিরূপ। এর পর সে রাইকে শান্ত গলায় তার সব কথা শোনার জন্য অনুরোধ করল, রাইয়ের সামনে এ আজ এক অন্য অভি। প্রথমে সে আলাপ করাল রোহনের সঙ্গে। রোহন রায়চৌধুরি, প্রয়াত সঞ্জয় রায়চৌধুরির এক মাত্র সন্তান। যে সঞ্জয় ২৭ বছর আগে সেই ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী দুর্ঘটনায় চিরকালের মতো রাইকে ছেড়ে চলে গেছিল সেই রোহন ফিরে এসেছে, তা কী হয়। একরাশ জিজ্ঞাসা নিয়ে সে যখন অভির দিকে তাকাল তখন অভি সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জানাল রোহন সঞ্জয় আর অনন্যার সন্তান। ২৫ বছর আগে অনন্যার সঙ্গে কর্মসূত্রে আলাপ হয় সঞ্জয়ের, কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই সম্পর্ক ভালোবাসায় পরিণত হয়। ভালোবাসার স্বীকৃতি হিসেবে মন্দিরে বিয়ে করে তারা। ৯ সেপ্টেম্বর বাগডোগরার প্লেন মিস করে ওরা, রাইকে দেওয়া কথা রাখার জন্য ওই দিন রাত্তিরে একটা গাড়ি ভাড়া করে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির উদ্দ্যেশ্যে রওয়ানা হয় তারা, সঙ্গে এক মাসের রোহন। ফেরার তাড়ার জন্য গাড়ির গতি ছিল নিয়ন্ত্রণহীন, তার উপর অসময়ে বৃষ্টি। বর্ধমানের কাছে একটা ট্রাক এসে মুখোমুখি ধাক্কা মারে তাদের গাড়িতে। ভয়ংকর ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাড়িটি, গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে যখন এক এক করে সকলকে বার করে আনা হচ্ছিল তখনই বের হল অনন্যার নিথর দেহ, গাড়ির ডানদিকটা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ড্রাইভারকেও বাঁচানো যায়নি, সঞ্জয়কে যখন উদ্ধার করা হয় তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর। এত ধবংসের মাঝে ছোট্ট রোহন হাত পা ছুঁড়ে খেলছিল। কোনো রকমে সঞ্জয় অভিরূপকে খবর দিতে বলে জ্ঞান হারায়। মধ্য রাতেই অভি একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে দৌড়োয় বর্ধমানের উদ্দ্যেশ্যে, পৌছে দেখে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে সঞ্জয়, অভির দুচোখ তখন রাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সঞ্জয়ের মৃত স্ত্রী-এর জায়গায় অনন্যাকে দেখে সব গুলিয়ে গেল তার। তখন তার কোলে ছোট্ট রোহন। জ্ঞান আসতে অনেক কষ্ট করে সঞ্জয় জানালো তার দ্বিতীয় বিবাহের কথা, পাশাপাশি সে বলল রাইকে সে খুব ভালোবাসে কিন্তু অনন্যার আকর্ষণও সে অস্বীকার করতে পারেনি। তার বড়ো ভুল হয়ে গেছে, রাইয়ের কাছে সে ক্ষমাপ্রার্থী। বারবার অনুরোধ করতে লাগল তার এই ভুলের খবর যেন রাই না জানতে পারে, তাহলে সে তার ভালোবাসাকে ভুল বুঝবে। আর নিরপরাধ, অসহায় রোহনের জীবন ভিক্ষা চাইল তার কাছে। এর অল্প সময়ের মধ্যেই সকলকে ছেড়ে চিরকালের মতো চলে গেল সঞ্জয়। মৃত্যুর সময় বন্ধুকে দেওয়া কথা আর রোহনের নিস্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে অভি রাইকে একটা কথাও জানতে পারেনি। আর এক বার সত্যি না বলতে পারার যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছে। আজ অভি বৃদ্ধ হয়েছে, রোহনকে রাই-এর স্বপ্নমতো ডাক্তার করেছে, আজ মা ছেলেকে মিলিয়ে দিতে পারলেই তার ছুটি।

এতক্ষণ পাথরের মতো বসে সব কথা শুনে ধীরে ধীরে অভির দিকে এগিয়ে গেল রাই। ওর বুকে মাথা রেখে চোখের জলে ভাসিয়ে দিল জমানো সব অভিমান। অভি বুঝতে পারল না এই এত অভিমানী কান্নার কারণ, সব হারিয়ে ফেলার কষ্ট না নতুন করে ফিরে পাওয়ার আনন্দ। খুব ধীরে দৃঢ় গলায় রাই বলল, আর তো তুমি ছুটি পাবে না, এতদিন শুধু দিয়ে গেছ এবার তোমার পাওয়ার পালা। সংসার পরিবার নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করো অভি। ভুল যেমন সঞ্জয় করেছিল তার চরম শাস্তিও তো সে পেয়েছে; ভগবান একবার সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু ও পারেনি সেই সুযোগকে সততার সঙ্গে গ্রহণ করতে, ভালোবাসাতে তো কোনো অন্যায় নেই, কিন্তু মিথ্যার আশ্রয়ে ভিত গড়ে তৈরি ভালোবাসার শাস্তি সে পেয়েছে। ওদের শাস্তির দায় আমার সন্তানের নয়, তাই ও কেন বাবা মায়ের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে, ওর প্রাপ্য ভালোবাসা ওকে ফিরিয়ে দাও। এরপর রোহনকে বুকে জড়িয়ে আদরে আদরে ভরিয়ে দিল রাই। মনে মনে সঞ্জয়কে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, তুমি যদি আমাকে ধোঁকা না দিতে তাহলে এই জীবনে আজ্ঞ মার আর মা হয়ে ওঠা হত না, তাই আমি তোমায় ক্ষমা করলাম, আজ তুমি রাইসুন্দরীর কাছ থেকে মুক্তি পেলে। আজও ৯ সেপ্টেম্বর, নতুন করে শুরু হল এক অন্তহীন অপেক্ষায় থাকা পরিবারের নতুন করে পথ চলা। আজ সত্যি ভালোবাসা পেল তার দিশা, আর সন্তান পেল তার মা।

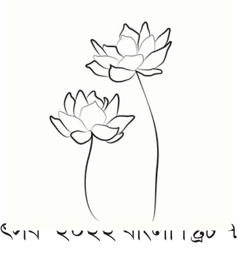

একটি সাংঘাতিক ভ্রমণ কাহিনি

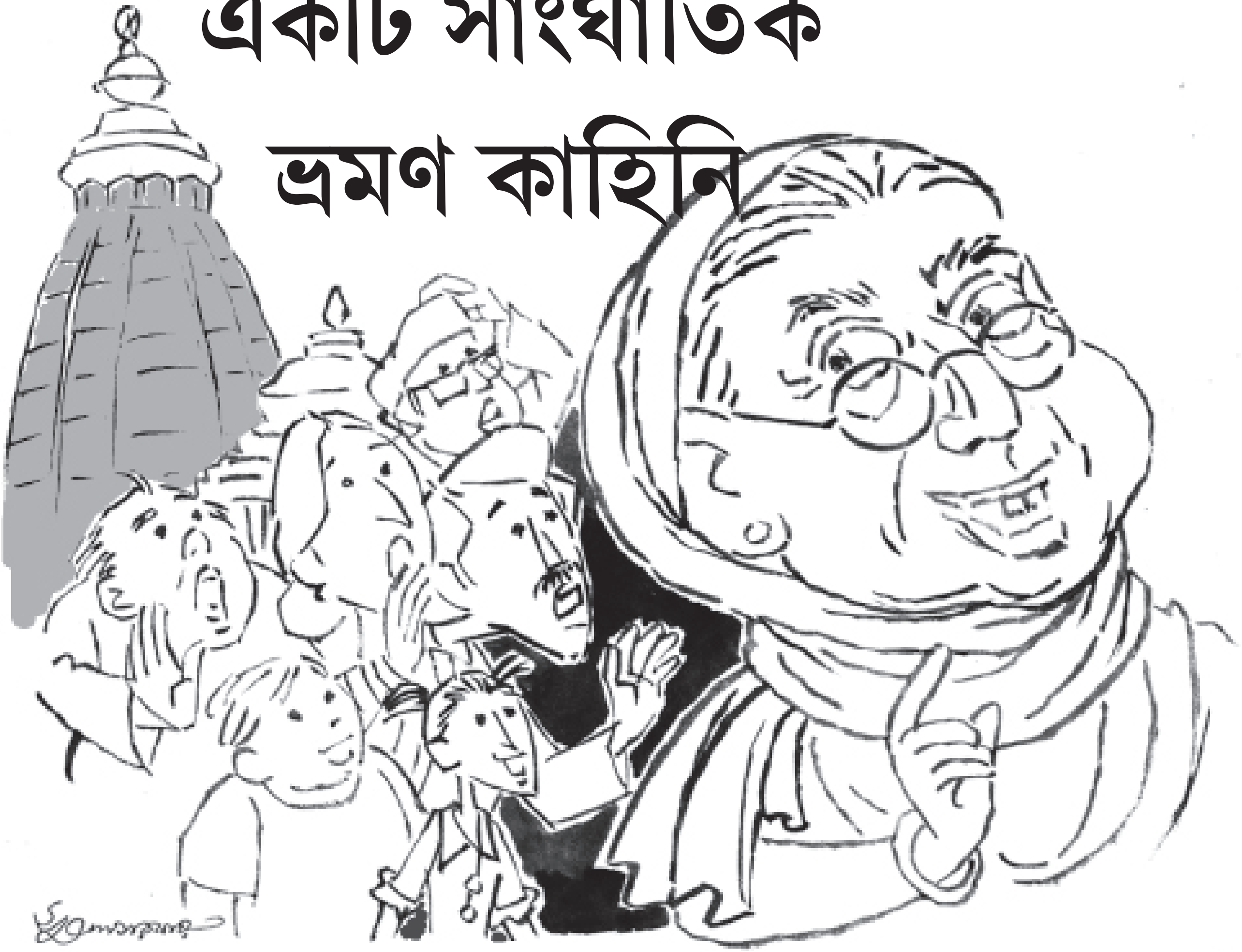

কেকা বসুদেব

আমার শাশুড়ি মা এক আজব মানুষ। ভদ্রমহিলা—সারা কর্মজীবন বাংলার দুর্গম সব এলাকা চষে বেড়িয়ে, যখন অবসর নিলেন—ফুটবল মাঠের মত পেল্লায় এক তক্তপোশে বসে ঘোষণা করলেন—'অনেক হইসে! বাকি জীবন আর নড়ুম না!'

এদিকে, ছোটোছেলের সাধ—মাকে তীর্থ করায়। ক্রমাগত—কাকুতি মিনতি, ধমক ধামক... অবশেষে তিনি নিমরাজী হন। শর্ত একটাই—যেখানে বলবেন, নিয়ে যেতে হবে—সেখানেই! তথাস্তু! ছেলে তাঁর সামনে অপশন মেলে ধরে—মরুতীর্থ হিংলাজ, জ্বালামুখী থেকে সোমনাথ, রামেশ্বরম।

ওমা! তিনি বলেন—তারাপীঠ! আর, ক্যাঁও ম্যাও করলে নাকি সেখানেও যাবেন না! অগত্যা! আর পুরো ট্যুরে যা কান্ড করেছিলেন—কখনো সুযোগ পেলে বলবো অখন!

তারপর দশ বছর অতিক্রান্ত—শাশুড়ির বয়স বেড়েছে, হাঁটাচলাও তিনি ব্যস্তানুপাতে কমিয়ে এনেছেন—শুধু বাথরুম অব্দি দৌড়! ডায়াপার ধরেছেন; আজকাল কোথাও যেতে হলে পাড়ার ক্লাবের অ্যাম্বুলেন্স

ভাড়া করেন কারণ গাড়িতে নাকি যুত করে শোয়া যায় না! বিশ্বাস করুন, জগন্নাথের দিব্যি!

এহেন মানুষ পুরী যেতে রাজি হলেন কি করে? কি করে আবার—দুকান কাটা ছোট পুত্রবধূর উৎপাত সহ্য করতে না পেরে!

শর্তের পর শর্ত লোকলস্কর বেশি হওয়া চাই, হাওড়া দিয়া যামু না, স্টেশনে হাঁটুম না, হোটেলের সিঁড়ি দিয়া উঠুম না, ঘর থিকা বাইর হমু না, হোটেলের বাথরুমে যামু না... ইত্যাদি প্রভৃতি।

ভাসুর রেগেমেগে বলেন—'সিধে কথায় যাব না বলতে কষ্ট হচ্ছে? তোমাকে একা রেখে মানাদি (তাঁর সর্বক্ষণের সহচরী) সমেত চলে যাব!'
সব পন্ড হয় দেখে মরিয়া হয়ে বলি—'সব শর্তে রাজি!'

অবশেষে, নিজস্ব জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করে—লকডাউনের ঠিক আগের দোসরা বৈশাখ শাশুড়ি তিন ছেলেমেয়ে, জামাই, পুত্রবধূ, নাতি নাতনী সমেত পুরীতে যেতে আধ রাজী হলেন।

হাওড়া অব্দি যেতে যেতে দূষণে মরে যাবেন তাই শিয়ালদার দুরন্ত এক্সপ্রেস; ঘর থেকে বের হবেন না—তাই পুরী হোটেলের দেবতাদের অনেক ভজনা করে ছয় তলার পশ্চিমের কোনার ঘরের ব্যবস্থা হল, যেখান থেকে খাটে বসেই সারা পুরী বীচ অবাধে দেখা যায়; সব আয়োজন গোপনে, কারণ সমস্যার টপাটপ সমাধান হচ্ছে জানতে পারলে নতুন সমস্যা খাড়া করার অসীম প্রতিভা আছে ভদ্রমহিলার।

নাতনীর তম্বিতে শিয়ালদা অব্দি গাড়ি চড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে নিজের খান দশেক লটবহর নিয়ে নাকি কুলিদের ট্রলিতে চড়ে বসেছিলেন। সেই অনুপম দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়নি, কারণ আমি আর বড়ো জা বাড়ি, মানুষ, কুকুর ইত্যাদির ব্যবস্থা করে রওনা দিতে এত দেরী করেছিলাম যে, কোনো মতে চলন্ত ট্রেন ধরেছিলাম!

ট্রেনটির নাম দুরন্ত শুনে শাশুড়ি ঠকরুন মহা উৎসাহে চেকারদাদা আর দুই ছেলের সঙ্গে বেশ করে কামরাটি সার্ভে করলেন, মনোযোগ দিয়ে ডিনার সারলেন, আমাদের কারো সে খাবার ভালো লাগেনি শুনে অবাক হলেন তাঁর নাকি চমৎকার লেগেছে! তারপর, ছোটোছেলের যত্ন করে পেতে দেওয়া বিছানায় শুয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে এক ঘুমে সোজা পুরী!

স্টেশনে নেমে হুইল চেয়ার পেয়ে বেজায় উত্তেজিত! অনেক দিনের শখ একটি হুইল চেয়ার কেনেন, কিন্তু বড়ো দুই ছেলেমেয়ে তাতে ক্রমাগত বাদ সেধে যাচ্ছে! শত্রু! শত্রু! এত আনন্দ পেলেন যে—আমাকে একটা হুইল চেয়ারে বসা ছবি তুলে নিতে হুকুম দিলেন।

হোটেলে পৌঁছে আর এক দফা হুইল চেয়ার; বলেন, 'দ্যাখতে চাই ক্যামন কইরা আমারে ছয় তলায় তোলোস!'
বলি—'চুপ করে দেখে যাও!'
পোর্টার হুইল চেয়ার সুদ্ধু লিফটে ঢুকিয়ে দিলে বাঘিনী কিঞ্চিৎ হতাশ!
ছোটছেলে বলে—'মা গো, কি দুঃখ না! ট্যানট্রাম করতে পারলে না!'
তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে এমন একটা লুক দিলেন যার মানে এক মাঘে শীত যায় না!

ঘরে ঢুকে প্রথম ট্যানট্রাম—'বেডকাভার নোংরা ক্যান?'
রুম সার্ভিস—'একদম ক্লিন মাসিমা!'
চশমার ফাঁক দিয়ে রক্ত জল করা লুক 'হুঃ! এই ক্লিন চাদর বাড়ি নিয়া গিয়া বউরে দিও পাততে, কি কয় দেখবা!'
সুর সুর করে আনকোরা চাদর হাজির হল!

দ্বিতীয় ট্যানট্রাম ছ-তলার ওপর দুদিক খোলা ঘরে তখন উথাল-পাথাল হওয়া; শাশুড়ির মন্তব্য 'আমারে মারতে আনছে! এই হাওয়ায় নিমুনিয়া হইবে!'

আট জন হতভম্ব মানুষের সামনে বেয়ারার প্রতি আদেশ হল 'সব জানলা বন্ধ কর!'
এক্সট্রা প্রোটেকশনের জন্য একটি সুতির মাফলারও কান গলায় বাঁধলেন। শেষে, প্রিয় খাদ্য মশলা ধোসা খেয়ে পরমানন্দে নিদ্রা গেলেন।

বিকেল থেকে শুরু হল বিছানায় বসেই কেনাকাটা! ননদ আর জা দুজনেই মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ; তাঁদের বাজারে পাঠিয়ে ফরমায়েশি জিনিসের ছবি তোলানো হল প্রথমে তারপর বাছাই পর্ব, কেনাকাটা চললো তিনদিন ধরে। এমন কেনা কিনেছিলেন যে তরুণ অধ্যাপক নাতি বলে—অন্য ট্যুরিস্টরা দোকানে কিছু না পেয়ে দিদাকে নাকি অভিশাপ দিচ্ছে!

ছোটোছেলে, ছেলেবৌকে ঘরে বসিয়ে রাখলেন 'আশি বচ্ছরের বুড়িরে যেমন আনছো, তেমন বইয়া পাহারা দাও!'
তাই দিলুম চারদিন কত্তাগিন্নীতে! আড়ে আড়ে তাকান আর বলেন, 'শখ মিটসে?'
বলি 'না, আসছে বছর আবার আনবো!'

এরপর জগন্নাথ দর্শন পর্ব—শাশুড়ি বলেন, 'হোটেল থিকাই প্রণাম করলাম!'
ছোটোছেলে বলে, 'চলবে না! দরকার হলে কাঁধে করে নিয়ে যাব!'

পান্ডা দুজন মাসলম্যান ঠিক করে আনে; তেনাকে কাঁধে চড়িয়ে নীলমাধব দর্শন করাবে।
শাশুড়ি ইন্টারভিউ নেন 'আমার ওজন নব্বইয়ের ওপর, তোমাগো ওজন কত?'

পাঁচটার সময় নিচে নেমে জানা যায়, পান্ডায় পান্ডায় কি অশান্তি হয়েছে—আমাদের পান্ডা তাই ভ্যানিশ! শাশুড়ি মহানন্দে বলেন, 'রুমে চল, বাঁচা গেছে!'

কিন্তু সব সময় যে তিনিই জিতবেন, তাতো হয় না! ম্যানেজার সাহেব এক ভীষণ সোবার পান্ডাদাদাকে কোত্থেকে হাজির করেন।
রেগেমেগে শাশুড়ি বলেন, 'অটোতে উঠতে পারুমনা!'
অটোদাদা আর পান্ডাদাদা মিলে পাঁজাকোলা করে তুলে দেন। বাঘিনী ছোটোছেলেকে শাসিয়ে বলেন, 'কাজটা ভালো হইতাসে না!'

মন্দিরের বাইরে আমরা দুই জা রইলাম লটবহর পাহারায়, ভাসুর দিদি জামাইবাবু, ছেলেপুলে নিয়ে চললেন আগে আগে। পঁয়ষট্টি কেজির পান্ডাদাদা আর আটষট্টি কেজির ছোটোছেলে—'জয় জগন্নাথ!' বলে পঁচানব্বই কেজির মাকে কাঁধে তুলে নেয় ! উচুঁ উচুঁ পাথরের ভিজে সিঁড়ি ভেঙে গোটা দলটা মন্দিরে ঢুকে যায়। পাশে দাঁড়ানো মাদ্রাজি গিন্নী বলেন, òyour mother in law is very lucky!'

Mother in law লাকি—না ছেলে লাকি? কজন সন্তানের ভাগ্যে এমন দুর্লভ পুণ্য জোটে? স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি পৎপতিয়ে উড়ে চলা পতাকার দিকে নিতান্ত সাধারণ একটি পরিবার, অনেক দোষ দুই জা তা নিয়ে গঞ্জনা দিতেও ছাড়ি না; কিন্তু মায়ের প্রতি মমতা ভালোবাসার এমন দৃশ্য দেখে একজন সন্তান হিসেবে পরিবারটির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়! সেবারের পুরী ভ্রমনে এটাই আমার পুণ্যলাভ!

শেষে ফুটনোট
১. শাশুড়ি দিব্যি গটগট করে দর্শন শেষে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। ভাসুর যেই বললেন, 'তবে ওঠার সময় আমার ভাইকে নাজেহাল করলে কেন?' উত্তর এলো ভেতরে নাকি স্বয়ং জগন্নাথ পায়ে বল জুগিয়েছেন!
২. জগন্নাথ এহেন ট্যানট্রামের শোধ তুলেছিলেন ফেরার ট্রেন পাঁচ ঘণ্টা লেট করিয়ে!
৩. সারা ট্যুর আমায় গঞ্জনা দেবার পর, বাড়ি ফিরে চুপিচুপি একটি রুপোর ফিলিগ্রীর জগন্নাথ বলরাম আর সুভদ্রার মূর্তি দিয়েছেন। কাউকে না জানিয়ে, হোটেলের ঘরে বসে কিভাবে কিনেছিলেন—সেটা আজও রহস্য! চেষ্টা করে দেখুন তো সমাধান করতে পারেন কি না!

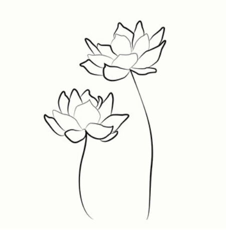

কয়েকটি কবিতা

শুভদীপ সেনশর্মা

হিরামন

একশত বছরের নিঃসঙ্গতায়
পুরোনো ভাড়া বাড়ি।
পুরোনো প্রেমিকা। পুরোনো স্কুল।
পুরোনো সাইকেল। পুরোনো কবিতার মতো মনে
পড়ে।

কবিতা লিখি। কবিতার ভেতর
এখন সব অলীক। মায়া। মোহ। উদ্ভাস।
গোলাপের শ্বাসকষ্ট হলে মহাকাল জেগে ওঠে।

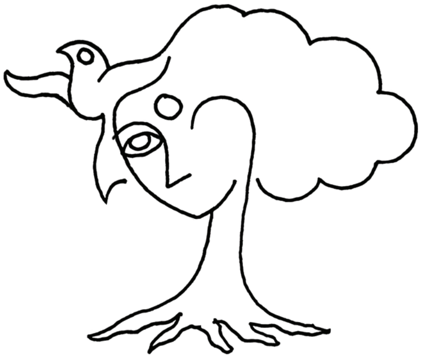

শ্রীরব

শীর্ণকায় শরীর
বিজন বাতাস
মেঘেরা মাতাল
তোমাকে রাত্রির সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে
অকালে মরতে হবে—এই ভাবতে ভাবতে
মৃত্যুর চেয়েও কঠিন মনে হয় নিজেকে

নিজেকে নগ্ন করে দেখি
আমার ভেতরে কপট বলে কেউ নেই

ঘূর্ণি

সিঁড়ি উঠে যায়
সিঁড়ি নেমে যায়

বহুদূর স্বপ্নের মতো
চলে যায় রাস্তা

ওপারেই তৃণভূমি
ওপারেই চাঁদ

সিঁড়ির শরীর ঘেঁষে
পূর্ণিমা রাত

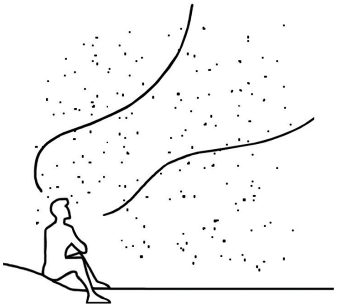

তোমাকে

একবার সাহস করে বলেছিলাম,
‘আমার প্রচুর সাহস’
তারপর
প্রতি রাতে আমার আর
ঘুম
আসে না

দেশ

মুখের আদলে কোথাও
দ্বেষ লুকিয়ে নেই

বিষণ্ণ একটি নাক
বুঝিয়ে দেয়

প্রকৃত অর্থে
কাকে বলে
দেশভাগ

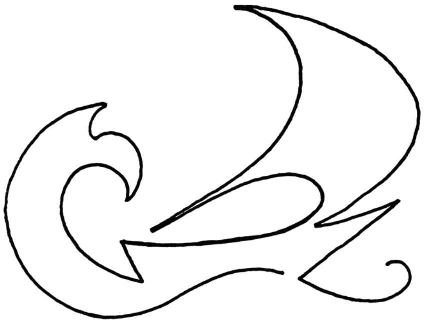

চক্রব্যূহ

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

প্রথম চক্র

মেঘ জমেছে

নর্থ ব্লকের একটা সিকিওর কনফারেন্স ঘরে সিক্রেট বৈঠক বসেছে। বৈঠক ডেকেছেন ব্রিগেডিয়ার পরমজ্যোৎ সিং। একটা অনামী সংস্থার কর্ণধার। রিপোর্ট করেন শুধু পি.এমকে। জনা দশেক এসেছেন মিটিংয়ে। এন.আই.এ, সি.বি.আই, র’, ফোর সি ইত্যাদি। শুধু কর্ণধাররাই এসেছেন। কোনো অ্যাসিস্টেন্ট নেই।

বৈঠক বসার আগেই টেকনিশিয়ানরা এসে ঘরটাকে ‘স্যুইপ’ করে গেছে—সাধারণ ভাষায় কোনো লুকোনো মাইক্রোফোন ইত্যাদি আছে কিনা দেখেছে। এয়ার কন্ডিশনারের গ্রিলেও জ্যামার লাগিয়ে গেছে। প্রত্যেকের সামনে একটা করে প্যাড। এঘরে কোনো মোবাইল বা কোনো কিছু আনার নিয়ম নেই। কাগজ তো নয়ই। প্যাডের কাগজ, মিটিং শেষ হবার পর মেশিনে কুচি কুচি করা হবে, আর সেটা করবে ব্রিগেডিয়ারের বিশ্বস্ত, ‘সিকিউরিটি ক্লিয়ারদ’ লোক।

সবাই আসার পর ব্রিগেডিয়ার শুরু করলেন।

—‘থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং, জেন্টলমেন। আমি শুরু করার আগে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনাদের সম্বোধন করবেন।’

রিমোটের বোতাম টিপলেন ব্রিগেডিয়ার। একপাশের দেয়ালে লাগানো একটা বড়ো স্ক্রিন অন হল। স্ক্রিনে হোম মিনিস্টার।

'স্বাগতম্। আজ আপনারা যা আলোচনা করবেন তার বিষয়বস্তু আমি কিছু জানি। এটাই যথেষ্ট। এই ব্যাপারে আপনাদের সবার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়। আর আমাদের শত্রু তো সর্বত্র। সুতরাং সাবধানে এগোনো দরকার। অবশ্য এটা আপনাদের বলাই বাহুল্য; তবু বলছি, কারণ এই বিষয়টা এখন পর্যন্ত শুধু পি.এম এবং আমার—আর অবশ্যই ব্রিগেডিয়ার সিং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। আজ আপনারা জানবেন। করণীয় কী, তা আপনারা ঠিক করুন।

আপনারা সবাই আমার মিনিস্ট্রির আওতায় পড়েন, সুতরাং এটাই আমার 'মার্চিং অর্ডার' বলে ধরে নিতে পারেন। আলাদা কোনো অর্ডার ইস্যু হবে না। ব্রিগেডিয়ারকে যা অর্ডার দেবার, পি.এম অলরেডি দিয়েছেন। আজ থেকে এই অপারেশনের নাম হবে

'অপারেশন স্কাই'। নাম এই জন্যে দিলাম যে, এই বিষয়ে স্কাই ইজ দ্য লিমিট। যতদূর যেতে হয়, যাবেন। নো হোল্ডস বাররড্। আর এই অপারেশন কো-অর্ডিনেট করবেন ব্রিগেডিয়ার সিং। এটা পি.এম আর আমার সিদ্ধান্ত। এই নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না। ইয়ে হামারে রাষ্ট্র কা সুরক্ষা কা মামলা হ্যায়, আউর হামারে পাস সময় হ্যায় নহী। গুড্ লাক।'

স্ক্রিনটা কালো হয়ে গেল। ব্রিগেডিয়ার রিমোট অফ্ করে দিলেন।

'আপনারা হয়ত ভাবছেন এটার কী দরকার ছিল। ন্যাশনাল সিকিওরিটির কাজ তো আমরা সর্বক্ষণই করি। এটা আর নতুন কথা কী। দরকার ছিল দুটো কারণে। প্রথম, আমরা সাধারণত নিজেদের ইউনিট নিয়ে এগোই, দরকার মতো অন্যদের সাহায্য নিই। কিন্তু এই ব্যাপারটায় আমাদের সব রকম ইনপুট সব সময় শেয়ার করতে হবে, কোনটা কখন কার কাজে লেগে যায়, কে জানে। আইডিয়াও সবসময় শেয়ার করতে হবে। আমরা আজ যারা এখানে আছি, আমরা 'কোর গ্রুপ'। প্রতি দশ দিন অন্তর আমরা মীট্ করব। এই কো-অর্ডিনেশনে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্য এই ভূমিকাটা দরকার ছিল। দ্বিতীয়, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের ব্ল্যাঙ্ক চেক্ দেওয়া হয়েছে। পলিটিকাল বা মিডিয়া ফল আউট যা-ই হোক, মন্ত্রী সামলাবেন, আমরা নিজেদের কাজ করব। তবে দুটো কথা—বডি কাউন্ট যেন খুব বেশি না হয় (অর্থাৎ, খুব বেশী লোককে শুট করার দরকার নেই) এবং একটা করে ন্যারেটিভ যেন সব সময় তৈরি থাকে। এতটা পাওয়ার আমাদের দেবার মানে একটাই, সেটা বোধহয় বুঝিয়ে বলতে হবে না। এক বছর পর ইলেকশন। সেদিক দিয়ে হিসাব করলে আমাদের হাতে চার মাসের বেশি সময় নেই।'

এন.আই.এ-র কর্ণধার, ডায়রেক্টর জেনারেল দুবে হাত তুললেন।

'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

ব্রিগেডিয়ার বোধহয় একটু বিরক্ত হলেন, কিন্তু কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না।

'আমরা কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি যে স্মারফিং (Smurfing) „রে অনেক টাকা কালো থেকে সাদা করা হচ্ছে।'

সি আর পি এফ-এর ডিজি হাত তুলতেই ব্রিগেডিয়ার থামিয়ে বললেন, 'জানি, জানি, আপনাদের সবাই মানি লন্ডারিং সম্বন্ধে জানেন না। আমি পরে একটা প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করব। তবে মানি লন্ডারিং এখানে ইম্পর্টেন্ট হলেও, মুখ্য নয়।'

সামনে রাখা গেলাস থেকে একটু জল খেলেন ব্রিগেডিয়ার। তারপর বলে চললেন, 'মোদ্দা কথা হচ্ছে, ভালো পরিমাণে কালো টাকা সাদা করা হচ্ছে। অবশ্য এটা চিরকালই হত, কিন্তু ইদানীং বেড়েছে। এটা একনম্বর পয়েন্ট। দু'নম্বর হল, দেশে বিভিন্ন প্রদেশে যে অযথা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে, অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়াই, তাতে আমাদের সন্দেহ হয়েছে যে এর পিছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে। এই সম্ভাবনাকে নিছক কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

ব্রিগেডিয়ার একটু থামতেই র'-এর ডায়রেক্টর হাত তুললেন, 'আমি এই ধারণাকে সমর্থন করছি। বিভিন্ন সূত্র থেকে আমাদের কাছে খবর আসছে, ইন্টারনেটে নানা রকম কোডেড মেসেজ চালাচালি হচ্ছে, এটা আমরাও লক্ষ্য করেছি। যে সব বিদেশিদের উপর আমরা নজর রাখি, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গত চার মাসে নিখোঁজ।'

র'-এর ডায়রেক্টর থামতে ব্রিগেডিয়ার আবার খেই ধরলেন, 'তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, ভারতের প্রতি সহানুভূতি ভাবাপন্ন কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় লোকের রহস্যজনক মৃত্যু। এর মধ্যে আছেন একজন ভারত সমর্থক ব্রিটিশ এম.পি, দুবাইয়ের একজন ভারত সমর্থক শেখ—যিনি ভারতে অন্তত এক বিলিয়ন ডলার পুঁজি বিনিয়োগ করতে যাচ্ছিলেন, এবং ফ্রান্স এবং জার্মানির দুটো বড়ো কোম্পানির নতুন মনোনীত ইন্ডিয়া অপারেশন্-এর হেড।

র'-এর ডায়রেক্টর আবার মুখ খুললেন, 'এগুলো আমাদের চোখ এড়ায়নি। তবে আপাতত কোনো চেনা টেররিস্ট গ্রুপ বা এস.এফ.জে অথবা খালিস্তানি গ্রুপের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমরা এখনো পাইনি। তবে তলে তলে সম্পর্ক থাকা অসম্ভব কিছু নয়। মনে হয় ষড়যন্ত্রটা নতুন কোনো গ্রুপের।'

রির্জাভ ব্যাংকের পদ্মনাভন এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। মুখ খুললেন এবার, 'বড়ো রকমের মানি লন্ডারিং আমরাও সন্দেহ করছি। এদেশি একটা প্রাইভেট ব্যাংক, আর একটা ফাইনান্সিং এজেন্সির ওপর—নাম এখনই বলছি না, কেননা আরো তদন্ত দরকার—আমাদের নজর আছে। এরা আবার একটা প্রাইভেট স্যুইস ব্যাংক, নাইরুর একটা প্রাইভেট ব্যাংক এবং জার্মানির একটা ফাইনান্সিং এজেন্সির সঙ্গে কাজ-কারবার করে। ইদানিং ট্রানজাকশন অনেক বেড়েছে এবং সেজন্যই আমাদের নজরে পড়েছে। তবে ঠিক কি ভাবে হচ্ছে কখনো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।'

'এসব তো বুঝলাম। কিন্তু যা বুঝেছি তার থেকে দুটো ব্যাপার পরিষ্কার হয়নি এখনও।' এন.আই.এ-র দুবে কমেন্ট, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও, ছুঁড়ে দিলেন, 'এক, আমি মানছি যথেষ্ট ক্লু রয়েছে এবং এটা চিন্তার বিষয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সব এজেন্সি তো নিজেদের মতো কাজ করছেই, ইমার্জেন্সি কোথায়? আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা তো আমাদের দেশে লেগেই থাকে; কারা ঘটায়, সেও আমরা জানি। নতুনত্ব কোথায়? আর আমার

দ্বিতীয় প্রশ্ন—এই মুহূর্তে তো অনেকটাই ভাসা-ভাসা। এর ওপর ভিত্তি করে তো কোনো ফরোয়ার্ড প্ল্যানিং সম্ভব নয়। অতএব, আমরা সবাই একজোট হয়ে কোন দিকে এগোব?'

আরও একটু জল খেলেন ব্রিগেডিয়ার।

'ঠিক বলেছেন মিস্টার দুবে। তবে আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি।' হাসলেন একটু, 'শেষের দিকে নিয়ে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার প্রথম উত্তর হল, এটা ইমার্জেন্সি এই জন্য যে দাঙ্গার সংখ্যা প্রতি মাসে প্রায় চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলেছে। যারা করছে তারা সাধারণত কোনো পলিটিক্যাল পার্টির সমর্থক নয়। তাহলে এরা কারা? কেন এ কাজ করছে? একটা কথা আমাদের সবার মনে রাখা উচিৎ। লুম্পেনদের কন্ট্রোল করার কোনো ভালো উপায় আজ পর্যন্ত বার করা যায়নি। আমরা পুলিশি কায়দায় সব ঘটনাগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখছি। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে? যে হারে দাঙ্গা বাড়ছে, তাতে কোনোদিন এটা এমন জায়গায় না পৌঁছয় যখন কন্ট্রোলের বাইরে হয়ে যাবে। বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করা হচ্ছে। ফল ধরতে কতদিন? পি.এম আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও সেজন্য চিন্তায় আছেন। আমার কথা কি পরিষ্কার হল?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন দুবে।

'এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন। এটাও আপনি ঠিক বলেছেন যে সব কিছুই ভাসা-ভাসা। ছবি যদি পরিষ্কার হত আমাদের এতজনের মাথা লাগাবার কী দরকার ছিল? আমাদের তো কাজই এই সবকিছুকে এক সূত্রে গাঁথতে হবে। আমি একটা প্রিলিমিনারি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছি। হোম মিনিস্টার আর পি.এম-এর অ্যাপ্রুভাল আছে। টপ্ সিক্রেট ফাইলে এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে সব ডিটেলে দেওয়া আছে। আপনারা এখান থেকে বেরোবার আগে পাবেন।'

এবার সবার দিকে তাকালেন ব্রিগেডিয়ার। 'একটা প্রশ্ন', সিবিআই-এর ডায়রেক্টর মিস্টার সিং বললেন, 'ধরুন ওর্য়াস্ট কেস সিনারিও। চতুর্দিকে আগুন লেগে গেছে। এক্ষেত্রে সরকারের, এবং আমাদের, কী করণীয়, সেটা নিয়ে কি ভাবা হয়েছে?'

—'হয়েছে।' উত্তর দিলেন ব্রিগেডিয়ার। 'তিনটে অপশন আছে। এক, সারাদেশে ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করা এবং দরকার হলে মার্শাল ল। সবাই বলবে একনায়কত্বের প্রথম সোপান, এবং পৃথিবীর বাজারে ভারতের দাম কমে যাবে। সেটা কাম্য নয়, যদিও করতে হলে করতে হবে। দুই, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকএবং একটা কমন রাস্তা বের করা। মনে হয় না সফল হবে। এ ওকে দোষারোপ করতেই ব্যস্ত থাকবে। তিন, কোনোমতে দেশের পরিস্থিতির উপরে সংসদে একটা পলিসি বা স্টেটমেন্ট পাশ করানো, এবং তারপর জরুরি অবস্থা জারি করা। সময় লাগবে, এবং সেই ফাঁকে দাঙ্গা বাড়বে। এতদিন ইট-পাটকেল চলছিল, এবার গুলি চলবে।'

নিশ্চয়ই আমরা তৈরি থাকব।' বি.এস.এফ এর বড় কর্তা কী যেন লিখলেন কাগজে, আবার সেটা ঘাটলেন।

'আজকের মিটিং এখানেই শেষ। পরের মিটিংয়ের খবর সময়মতো দেব।' ব্রিগেডিয়ার উঠে দাঁড়ালেন। বাকিরাও।

ঘর থেকে বেরোবার সময় সবাই গম্ভীর। দেশের আকাশে যে মেঘ করেছে তারই প্রতিফলন।

দ্বিতীয় চক্র

এরা কারা?

১

আব্দুল। বেঁটে খাটো। মুখে চোখে বয়সের ছাপ। খাকি রঙের উর্দি। প্রায় তিরিশ বছর ধরে হোম মিনিস্ট্রিতে চাকরি করছে।

এই তিরিশ বছরে আব্দুলের একটাই উন্নতি হয়েছে। আগে সেকশালে ছিল, স্টাফদের চা সাপ্লাই করত। এক সিনিয়র অফিসারের নেকনজরে পড়ে সিকিউরিটি ক্লিয়েরেন্স পেয়ে এখন বড়ো সায়েবদের মিটিংয়ে ফাইল আর চা সাপ্লাই করার অনুমতি মিলেছে।

সবই ঠিক চলছিল। তারপর বড়ো ছেলেটা জেদ ধরল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে। আরো দুটো ছেলে আছে, আর একটা মেয়ে। হিমসিম খাচ্ছিল আব্দুল।

তারপর এল রোশন। কী করে আলাপ হয়েছিল আব্দুল এখন ভুলে গেছে। মাসে পঁচিশ হাজার টাকা পায়। কাজ কিছুই না। বড়ো কোনো মিটিং হলে ওয়েস্ট বাস্কেট আর টেবিলে পড়ে থাকা কাগজ রোশনকে এনে দিতে হয়।

আজ দশ বছর ধরে এই চলছে।

আজ একটা বড়ো মিটিং ছিল। হোম সেক্রেটারির পি.এ বললেন কনফারেন্স রুম থেকে ওয়েস্ট বাস্কেট নিয়ে আসতে। কাগজ নিজেই স্প্রেডিং মেশিনে দেবেন। আনার সময় আব্দুলের মনে হল দু-একটায় কিছু লেখা আছে। চট করে পকেটে পুরল।

রোশন একটা নম্বর দিয়ে রেখেছে আব্দুলকে। ওপাশ থেকে যে ফোন ধরে তাকে শুধু বলা, 'প্যায়সে মিল গয়ে।' তারপরের কাজ কাগজ সব একটা খামে ভরে সন্ধেবেলা বাজারে বেরোনো। কোন সময়ে আব্দুলের পকেটমার হয়ে যায়। ও জানতেও পারে না।

আজও তাই হল। কে নিল, কোথায় গেল খামটা, এ নিয়ে আব্দুলের মাথাব্যথা নেই। ও শুধু জানে কাজের কিছু থাকলে একটা বোনাস পাওয়া যাবে।

খামটা সে রাত্রেই মোরাদাবাদ। এক ট্রাক ড্রাইভারের পকেটে করে। সেটা নিয়ে একটা লোক পৌঁছল শহরের ভিতর জিএমডি রোডের থেকে একটা রাস্তায় ঘুরে, যেখানে বড়ো বাংলোগুলো আছে, সেখানেই একটা বাড়িতে। ড্রইং রুমে সাদা পায়জামা কুর্তা পরা একজন মোটা লোক। গলায় একটা ভারী সোনার চেন। কালো চুল ব্যাক ব্রাশ করা। বড়ো গোঁফ। হাতে হুইস্কির গ্লাস। আশে-পাশে জনা দুয়েক মোসায়েব গোছের। রাজা দাদা। হিস্ট্রি শিটার। গোটা তিরিশেক কেস ঝুলছে ওর নামে।

'নমস্তে দাদা', সাধারন পোশাক পরা লোকটা ঘরে ঢুকে খামটা বাড়িয়ে

দিল।
‘ঠিক হ্যায়। তু যা’, হাত নাড়ল রাজাদাদা।
খামটা খুলে একটু ভুরু কোঁচকাল। ইশারায় মোসায়েবদের যেতে বলল। ওরা উঠে গেলে পর দেরাজ থেকে একটা ফোন বার করল।
স্যাটেলাইট ফোন।
‘রাজা। মিলনা জরুরি হ্যায়।’
‘কল্।’
ফোন কেটে গেল।

এক্স-ইন্সপেক্টর শহীদ সিং ফোনটা রেখে দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের চারদিকে তাকাল একবার। পাশে রাখা হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিল। গত তিন বছরে শহীদ সিং অনেক, হিন্দিতে যাকে বলে ‘তরক্কী’, করেছে। থাকত দিল্লির পুলিশ লাইনসে কোয়ার্টারে। তারপর একদিন মনে হল এইভাবে বাঁচার কোনো মানে হয় না। বিয়ে হয়েছিল, বৌ মারা গেছে বছর পাঁচেক। ছেলেপিলে নেই, একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট। তা সত্ত্বেও কিছুই করা হল না—দেশ-বিদেশ ঘোরা, নিজের একটা বাড়ি, গাড়ি। আর এসব না করতে পারলে তো আর-একটা ভালো বিয়েও করা যাবে না। অগত্যা চাকরি ছাড়তে হল।
আন্ডারওয়ার্ল্ডে নিজের কানেকশন লাগিয়ে কিছু কাজ জোগাড় হয়েছিল। তারপরে হঠাৎই ভাগ্য ফিরল। এই কানেকশনটা নিজে থেকেই এল। এখানে নিজেকে কিছুই করতে হয় না—শুধু প্ল্যান মাফিক বোড়ে খুঁজে বার করা, আর যাকে বলে কো-অর্ডিনেশন। দিল্লির রাজৌরি গার্ডেনে একটা বড়ো মতো ফ্ল্যাট হয়েছে গত দু’বছরে, একটা মাঝারি সাইজের গাড়িও।
মনটা ফিরে গেল রাজার ব্যাপারে। বসকে এখনই বলা উচিৎ? না বলাই ভালো। পুরো খবরটা জেনেই কথা বলা ভালো। তবে ব্যাপারটা যদি আর্জেন্ট হয়?
ফোন করল রাজাদাদাকে।
মামলা আর্জেন্ট হ্যায় ক্যা?
সমঝ মে নহী আ রহা। হো ভি সকতা হ্যায়।
অ্যাসা করো, কল্ সুবহ ছতরপুর মে এম এল এ সবকা ফার্ম হাউস পহুঁছো। হম্ পেহলে হি পহুঁচ যায়েঙ্গে। সাথ ব্রেকফাস্ট করেঙ্গে।
ঠিক হ্যায় সাব্। সুবহ্ সাড়ে আট। কল্। ফোন কাটল শহীদ।

২

ছতরপুরে বিশাল ফার্মহাউস এম এল এ কানহাইয়ালালের। প্রতিমাসে লেফাফা যায় ওর কাছে, কাজেই ফার্ম হাউসে শহীদ সিংয়ের অবারিত দ্বার।
আটটা নাগাদ পৌঁছে শহীদ সিং খানসামাকে চা অর্ডার দিয়ে বারান্দায় এসে বসল। যদিও শীত পড়েনি, তবু এই সকালে হাওয়াটা বেশ আরামদায়ক।
রাজাদাদা এল আটটা চল্লিশে। শহীদের সামনের চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়ল।

নমস্তে সারজী। পানি পিলাইয়ে।
বেল বাজিয়ে খাসসামাকে জল আনতে বলল।
বাত বাদ মে করেঙ্গে। পহলে বোলো ক্যায়া খাওগে।
হাসল রাজাদাদা। ওর অনেক রকম হাসি আছে। কাউকে দুনিয়া থেকে সরাবার আগেও হাসে। তবে এখানকার হাসিটা নরম—সহকর্মীদের জন্য।
—আপ্ তো জানতেই হ্যাঁয়। শাম তক্ হম্ শাকাহারী রহতে হ্যাঁয়। গোবী পরাঁঠা আউর দহী।
খানসামা জল আনতে ওকে দুজনের জন্যই পরোটা আর দই অর্ডার দিয়ে রাজার দিকে ঘুরে বসল শহীদ।
অব্ বোলো ক্যায়া বাত্ হ্যায়।
পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের খাম বার করল রাজা। ভিতরে একটা কাগজের টুকরো। মনে হয় নোটপ্যাড থেকে ছেঁড়া।
কহাঁ মিলা?
কল্ নর্থ ব্লক মে হাই সিকিউরিটি মিটিং থা। ওয়েস্ট বাস্কেট মে।
কাগজটা ভাঁজ করা ছিল। খুলে পড়ল শহীদ—
হুম্। অপনা আদমি লায়া?
হাঁ সাব্।
ঠিক হ্যায়। বস্‌সে বাত করতে হ্যাঁয়। য়হিঁ বৈঠো।
উঠে ভিতরে গেল শহীদ। একটা বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।
পকেট থেকে ফোন বার করল।
ইয়েস? গম্ভীর গলা ওপাশ থেকে।
সিক্স।
ওকে। বোলো।
ছোটা কাগজ হ্যায়। ভিজওয়াঁয়?

জরুরি?

লগতা হ্যায়। এক নাম হ্যায়—ব্রিগেডিয়ার সিং।

তব তো জরুরি হোগা। কঁহা মিলা?

নর্থ ব্লক।

ঠিক হ্যায়। অভি কহাঁ হো?

ফার্ম হাউস।

বন্দা ভেজ রহা হুঁ। সিল করকে দে দেনা। দো ঘন্টে বাদ ফোন করো।

রাইট স্যার।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে ডান দিকে একটা ছোটো অফিস ঘর। সেখানে গিয়ে খাম জোগাড় করে চিরকুট তাতে ভরে খামটা বন্ধ করল। ফিরে গেল নিজের চেয়ারে।

বাত হুই? রাজাদাদা একটু উৎসুক।

হাঁ। কী কথা হয়েছে সেটা বলল শহীদ। লুকোবার কিছু নেই।

ঠিক হ্যাঁয়, ইন্তজার করতে হ্যাঁয়।

পনেরো মিনিটের মধ্যে একটা লোক এল মোটর সাইকেল করে। শহীদের কাছ থেকে খামটা নিল, আর একটা খাম দিয়ে গেল। শহীদ খামটা খুলে দেখল ভিতরে একটা টাইপ করা কাগজ। আজকাল টাইপ আর কেউ করে না, তবে হ্যাকারদের আর সাইবার পুলিশের হাত থেকে বাঁচার এই একটাই উপায়। তবে টাইপরাইটার কিছুদিন পরেই বদলাতে হয়। সাবধানীরা তাই-ই করে।

কাগজে লেখা—

Brigadier Paramjyot Singh
366B, Pandara Road
Head of small cell dealing with
Extreme cases. North Block
Keep watch

রাজাদাদার দিকে তাকাল শহীদ।

তোমার একটা ঝাড়ুদারদের সেল আছে না?

মাথা নাড়ল রাজা।

দু-একজনকে লাগাও এই বাড়িটার ওপর নজর রাখতে। ‘ঠিকানাটা দিল শহীদ।’ আর নর্থ ব্লকে তোমার যে লোক আছে তাকে বলো ব্রিগেডিয়ারের গতিবিধির ওপর চোখ রাখতে। দরকার মতো বোনাস দেবে। তিন ঘন্টা পর আমাকে ফোন কোরো।

৩

সেইদিনই সকালে নর্থব্লকে ব্রিগেডিয়ারের ঘরে আলোচনা হচ্ছিল আগের দিনের মিটিং নিয়ে। ব্রিগেডিয়ার আর তাঁর ‘কোর টিম।’ রুদ্র সেনগুপ্ত, এক্স-স্পেশাল ফোর্সেস, লম্বা, ফর্সা, টিকোলো নাক, দেখলে পাঞ্জাবি মনে হয়। টিম লিডার বিজয় উপাধ্যায়—লম্বায় প্রায় রুদ্র-রই মতো, ছিপছিপে চেহারা, কথাবার্তায় হালকা স্বভাবের মনে হলেও কাজের সময় পাক্কা প্রফেশনাল। এক্স নেভি কমাণ্ডো। রুদ্র আর বিজয় দুজনেই বেশ কয়েকটা ভাষা জানে।

টিমের বাকি তিনজনের মধ্যে দুজন মেয়ে। প্রথম শর্মিলা, পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। মানি লন্ডারিং, মানি ট্রেসিং, এসব দেখে। তবে দরকার হলে গুলি চালাতেও কসুর করে না। সুস্মিতা পেশায় জিওলজিস্ট, কিন্তু এখন পুরোপুরি এজেন্ট।

আর আছে সান্টা। সানথানম্। ওকে কেন্দ্র করেই অর্ধেক অপারেশন প্ল্যান করা হয়। কন্ট্রোল রুম ওর আন্ডারে। উস্কো-খুস্কো চুল, প্রায়ই শেভ করতে ভুলে যায়—আর ওর মার্কামারা সাদা শার্ট আর জিন্স ছাড়া কেউ কখনো ওকে দেখেনি। জিনিয়াস বলে ওর সাতের বদলে চোদ্দ খুন মাপ।

ওরা যখন ঘরে ঢুকল, ব্রিগেডিয়ার কতগুলো ছবি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। ইশারায় সোফাতে বসতে বলে নিজেও এসে বসলেন। ছবিগুলো রুদ্র-র হাতে দিয়ে বললেন, ‘দ্যাখো, কাউকে চিনতে পারো কিনা।’

রুদ্র ছবিগুলো কয়েকবার দেখে বিজয়ের হাতে দিল। সবাই তারপর দেখল ছবিগুলো। দেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রুদ্র চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, ‘স্যার, এর মধ্যে একজনকেই চিনতে পারছি। ব্রিটিশ এম.পি। নাম সম্ভবত অ্যালেন স্টুয়ার্ট। একটু রহস্যজনকভাবেই খুন হয়েছেন মাস দুয়েক আগে।’

‘আর আমিও দু’জনকে চিনি স্যার’, বিজয় বলে উঠল ‘আরবি ড্রেস পরা যে দুজন একটা ছবিতে, তার একজনের নাম শেখ আল্ল বু-বকর্, পুরোটা এখুনি মনে পড়ছে না—এক সময়ে আল্ কায়দার ফাইনান্সিয়ার ছিল। আর অন্যজন তো শেখ অল্ মন্সুরি। ভারতে এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে বলেছিল। পি.এম যখন দুবাই গিয়েছিলেন তখন ওঁর সঙ্গে ছবিও বেরিয়েছিল কাগজে। এও তো মারা গেছে মাস খানেক আগে। নিজের ইয়াটেই হার্ট অ্যাটাক। তবে একটু সন্দেহজনক ব্যাপার।’

‘ছবিগুলোর মধ্যে লিংক কি, স্যার?’ শর্মিলার প্রশ্ন।

ব্রিগেডিয়ার তাকালেন রুদ্র-র দিকে। রুদ্র বলল, ‘তৃতীয় জনের নাম মনে পড়েছে স্যার। ফ্রান্সিস লেরয়। একটা ফরাসি জার্মান কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ ছিল। ভারতে একটা বড়ো প্রোজেক্ট করার চেষ্টা করেছিল।’

ব্রিগেডিয়ারের দিকে তাকাল রুদ্র ‘ধরে নিচ্ছি এ-ও রিসেন্টলি মারা গেছে।’

মাথা নাড়লেন ব্রিগেডিয়ার।

—তাহলে আমি অন্তত দুটো লিংক পাচ্ছি স্যার। অ্যালেন স্টুয়ার্ট আমি জানি, ভারত সমর্থক ছিল। তাহলে তিনজন যারা মারা গেছে এরা সবাই ভারত সমর্থক ছিল। আর দ্বিতীয় এই সব ক’টা ছবিতেই একজন কমন। তাকে চিনি না। বাই দ্য ওয়ে স্যার, এগুলো জোগাড় হল কোথা থেকে?

‘এই তিনজনের অফিস ঘেঁটে উদ্ধার হয়েছে। আর যাকে চিনতে পারলে না, তার নাম ললিত কানাড়ে। আই.পি.এস অফিসার ছিল। ডি.জি.পি ছিল। রিটায়ার করেছে বছর তিনেক আগে। ব্যবসা শুরু

করেছে শুনেছি। ফুলে-ফেঁপেই উঠেছে শুনেছি।' কথাটা এমনভাবে বললেন, যেন ওঁর বিশ্বাস হয়নি।

কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী, স্যার? যারা খুন হবার তারা তো হয়েইছে। আমাদের ভূমিকা কী?' বিজয় জিজ্ঞাসা করল।

উত্তরে মিটিংয়ে যে সব কারণ দেখিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার, সেগুলোই আবার বললেন। তারপর যোগ করলেন, 'এটাকে এখন অ্যাক্সেপ্টেড থিওরি ধরে নিতে পার। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে আলাদা আলাদা ঘটনা হলেও আমার ধারণা এগুলো কো-অর্ডিনেটেড। দাঙ্গা একবার শুরু হলে আপনা থেকেই চলতে থাকে, কিন্তু শুরু করবার জন্য লোক চাই। আর তার জন্য টাকা লাগে—ভালো টাকাই লাগে।'

'কিন্তু স্যার, এতগুলো এজেন্সি, তারা তো সব কিছু ঘাঁটছেই। আমরা কী করব?'

'এদের সবারই হাত-পা আইনে বাঁধা। একমাত্র র' ছাড়া। আর আছি আমরা। এরা যা করছে করুক, আসল লোককে বার করে তার ঘাড়ে কোপ মারার দায়িত্ব আমাদের। অন্তত পি.এম আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাই ভাবেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পরমজ্যোৎ সিং। ঠিকভাবে শত্রুর ঘাড়ে কোপ না পড়লে পরের কোপটা যে ওঁর ঘাড়েই পড়বে, সেটা উনি ভালো মতোই জানেন।

কফির পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে আবার বললেন, 'দেখ, আমার ধারণা এর পিছনে যে বা যারা আছে, তাদের মধ্যে কিছু লোক অন্তত বিদেশি। আমাদের জানা সবগুলো খুনই বিদেশে হয়েছে। ভারতীয়রা যে ওখানে গিয়ে খুন করতে পারে সেটা অসম্ভব কিছু নয়, তবে তার জন্য ভালো কন্ট্যাক্ট চাই। বিদেশে সেই দেশের লোকদের দিয়ে খুন করানো অনেক সহজ।'

সুস্মিতা কথা বলে কম। কিন্তু যা বলে, মন দিয়ে সবাই শোনে। সাধারণত ওর মাথা খেলে ভালো। আজ প্রথমবার মুখ খুলল, 'স্যার, তাহলে তিনটে সিনারিও। প্রথম এই বিষচক্রের কর্ণধাররা সবাই ভারতের। দুই, চক্রে কিছু ভারতীয়, কিছু বিদেশি। এবং তৃতীয়, সবাই বিদেশি।'

শর্মিলা বলে উঠল, 'প্রথমটাকে বাদ দেওয়া যায় বোধহয়। অ্যানালিসিস অনুসারে কালো টাকা বাইরে থেকে আসছে। যদি ইন্ডিয়ান অপারেশনই পুরোপুরি হয়, বাইরে থেকে কালো টাকা আনতে হবে কেন?'

খেই ধরল সুস্মিত, 'আর দ্বিতীয়টা যদি হয়, তাহলে ভারতীয়রা সাবর্ডিনেট। বিদেশিদের সাবর্ডিনেট হবার কোনো মোটিভ নেই। তারা টাকাও দেবে আবার ভারতীয়দের নীচেও থাকবে, এটা হজম হয় না। হি হু পেজ্ দ্য পাইপার কলস্ দ্য টিউন।' বিজয় যোগ করল, 'তৃতীয়টাও বাদ দেওয়া যায়। ভারতে ভালো রকম লিংক না থাকলে ভারতে অপারেট করা যায় না।'

'তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে?' ব্রিগেডিয়ার বললেন।

রুদ্র উত্তর দিল, 'ভারত-বিদ্বেষী একটা লোক বা লোকেরা ভারতীয় এজেন্টদের দিয়ে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, এবং তার জন্য টাকা পাঠাচ্ছে। আমাদের সামনে যে ডেটা আছে—মানে ছবিগুলো—তাতে একজন ভারতীয় এবং একজন বিদেশির ওপর সন্দেহ হয়। ললিত কানাড আর শেখ আবু-বকর্। এদের বাজিয়ে দেখা যায়।'

'আই এগ্রি। তবে একটা টাইমফ্রেম আছে। যে ভাবে হোক তিন মাসের মধ্যে শেষ করো ব্যাপারটা। এক্সিকিউট ফুল্‌লি। তার মানে, শত্রুর শেষ রেখ না, আমি আছি। তিনদিনের মধ্যে একটা অ্যাকশানেবল প্ল্যান চাই। দ্যাটস্ অল্। উঠে পড় সকলে।

৪

ঘড়ি দেখল শহীদ সিং। এগারোটা। বসের সঙ্গে ন'টা নাগাদ কথা হয়েছে। ফোন লাগাল শহীদ।

'সার।'

'নজর রাখো। উসকে টিম মে কৌন লোগ হ্যাঁয় মালুম করো।'

'সমঝ গয়া।'

'ঔর কোই ইনসিডেন্ট বনাও, তাকি যা তো ডরে, য়া হড়বড় করকে কুছ কর ব্যয়টে। দোনো মে কি হমে ফায়দা হ্যায়।'

'হো যায়গা। ঔর কুছ?'

'জরুরত পড়ে তো এক কো হঠা দেনা। কাবিল হো?'

'আপ চিন্তা না করেঁ। আজ হি বন্দোবস্ত করতে হ্যাঁয়।'

রাজাকে ফোন মেলাল তারপর। নিজের বাড়িতে ডাকল। এসব কথা বাইরে হয় না। মাথার মধ্যে একটা প্ল্যান ঘুরছে। তবে কিছু জিনিস লাগবে। আজকেই।

রাজা এলে ওকে প্ল্যান বোঝাতে আধ ঘন্টা লাগল। তারপর সাপ্লায়ারকে ফোন করল। পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে মাল চুরি করে পাচার করে। কী চাই তার ফর্দ দিল।

রুদ্র রিপোর্ট করল বিকাল চারটে নাগাদ। ফাইল দেখছিলেন। মুখ না তুলেই বললেন, 'ওয়েট'।

ব্রিগেডিয়ারের টেবিলের সামনে বসার কোনো চেয়ার নেই। যে এসেছে, তাকে অপদস্থ করতে হলে এর থেকে ভালো এবং সহজ কিছু হয় না। ব্রিগেডিয়ার না-বলা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

সোফায় গিয়ে বসল রুদ্র। ব্রিগেডিয়ার উঠে এলেন মিনিট খানেক পরে।

'এনিথিং টু রিপোর্ট?'

'ইয়েস সার। সান্টা কানাড-এর ফোন ট্যাপ করবার ব্যবস্থা করছে। ওর ফোন রের্কড বার করিয়েছে। ওর পিছনে লোক লাগানো হচ্ছে।'

'গুড। আর?'

'বিজয় দুবাইতে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। রাত নাগাদ কিছু খবর পাওয়া যাবে আশা করছি।'

'হুম্। লেগে থাকো । আমি আজ রাতে পি.এম আর হোম মিনিস্টারকে ব্রিফ করব। সন্ধ্যাবেলা একটু ক্লাবে যাব হয়ত। জিমখানা। দরকার হলে

চলে এসো। এটাই এখন ফার্স্ট প্রায়রিটি।’

৫

রাত আটটা। অন্ধকার হয়ে গেছে। ব্রিগেডিয়ারের গাড়ির টেল-লাইট বাংলোর গেট থেকে বেরিয়ে ডান দিকে ঘুরে চলে গেল।

গেটে সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে ছিল। পিছন থেকে একটা কালো পোশাক পরা লোক এক হাতে ওর মুখটা চেপে ধরে অন্য হাতে ছুরি চালাল। সেন্ট্রি সাধারণ পুলিশ সেলফ্-ডিফেন্স বিশেষ জানে না।

সেন্ট্রি পড়ে গেল। ওর ইনসাস রাইফেলটা পিছনের কাউকে পাচার হল। লোকে ভাবুক না, যে রাইফেলটার জন্যই খুনটা হয়েছে। এমনিতে বন্দুকটা ওদের কোনই দরকার নেই। আজকের দুনিয়াতে একেবারেই অচল। এর থেকে অনেক ভালো জিনিস ওদের আছে।

দেওয়ালের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। গোলাপের কেয়ারি আছে, যদিও রাতের অন্ধকারে গোলাপগুলোকে কালো দেখাচ্ছে। লোকদুটোর পায়ে মোটা ক্রেপ সোলের ‘ডেজার্টস্টর্ম’ জুতো। প্রায় নিঃশব্দেই এগোচ্ছে। সামনেই বাংলো। জানলা দিয়ে আলো আসছে। পর্দা খোলা।

সদর দরজা গিয়ে একজন সাদা উর্দি পরা লোক বাইরে এল। খানসামা হবে। এরা দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। খাসনামা উঁচু গলায় ‘আরে সুকু ভাই, কঁহা গইল হো’ বলতে বলতে বাড়ির পিছন দিকে গেল। সদর দরজা খোলাই রইল।

এই সুযোগ। এক দৌড়ে লন পার হয়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। বাড়ির ভিতর থেকে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। তারপরই হঠাৎ চুপ।

যে লোকটা সেন্ট্রির মহড়া নিয়েছিল সে সাইলেন্সড্ পিস্তলটা নিজের জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, ‘কাম গুরু।’

দুজনের পকেট থেকে সিগারেটের টিনের মতো দেখতে গোটা চারেক ‘ইনসেন্ ডিয়ারি বম্ব’ মানে যা ফাটলে চারদিকে আগুন ধরে যায়, সেই জিনিস বার করল। এগুলো অত্যাধুনিক। সফিস্টিকেটেড মোলোটভ্ কক্‌টেল বলা যেতে পারে।

চটপট্ সেফটি পিনগুলো বার করে ঘরে ঘরে ফেলে দিল। দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাংলো থেকে। পিছনে এখন আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। ওরা যখন গেট দিয়ে বেরোচ্ছে তখন ড্রইংরুমের পর্দা এবং সোফায় আগুন লেগে গেছে। বাড়ির মালী, খানসামা এরা দৌড়ে এসেছে।

খানসামা নিজের মোবাইল থেকে কন্ট্রোল রুমে ফোন করল। এরাও এক্স-আর্মি। ইমার্জেন্সিতে কী করতে হয় জানে। মালি ফোন করল ফায়ার ব্রিগেডে। সাহেব কোথায় গেছেন জানা নেই, আর উনি এসেই বা কী করবেন।

খানসামা এগিয়ে গেল গেটের কাছে। বাংলোয় আগুন, সেন্ট্রি কোথায়? গেটের এদিক-ওদিক দেখতে গিয়ে সেন্ট্রির বডিতে পা লাগল। গায়ে হাত দিতেই বোঝা গেল রক্ত। খানসামার মুখটা কঠিন হল। সেন্ট্রির বন্দুকটা খুঁজল, পেল না।

ততক্ষণে পুলিস আর ফায়ার ব্রিগেড এসে পড়েছে।

জিমখানা ক্লাবের বারে ঢুকতে যাচ্ছেন, পাশ থকে একজন শ্যুট পরা ভদ্রলোক বললেন, ‘ব্রিগেডিয়ার পরমজ্যোৎ সিং, ইফ আই এম নট্ মিসটেকেন?’ গলায় একটা প্রশ্নের সুর। ভদ্রলোককে চিনতে পারলেও (সকালেই ছবি দেখেছেন), মুখে বললেন, ‘আই অ্যাম সার, বাট্...’

-‘ইউ ডোন্ট নো মি। মাই নেম ইজ কানাড। এক্স-পোলিস। উই হ্যাভ আ মিউচুয়াল ফ্রেন্ড, কর্নেল ভার্গব, হি পয়েন্টেড ইউ আউট হোয়েন ইউ ওয়াক্ড্ ইন্।’

হঠাৎ এরকম ভাবে আলাপ করার মানে? ওয়ার্নিং দিচ্ছে নাকি? দেখাই যাক না। হাত বাড়ালেন ব্রিগেডিয়ার—‘গ্ল্যাড টু নো ইউ টু। শ্যাল উই হ্যাভ আ ড্রিংক?’

হোয়াই নট? বেস্টওয়ে টু ব্রেক দ্য আইস।

জানালার ধারের সোফাতে বসলেন দুজনে। ওয়েটারকে দুটো সিঙ্গল মল্ট অর্ডার করে এ-কথা, সে-কথা। ড্রিংক এল। সবে প্রথম চুমুকটা দিয়েছেন, ফোনটা বাজল।

সান্টা স্যার। নীড টু টক টু ইউ নাও।

হোল্ড। আই উইল গো আউটসাইড।

‘এক্সকিউজ মি বলে বেরিয়ে লনে চলে গেলেন ব্রিগেডিয়ার। উনি উঠে যাবার পরে পরেই কানাডের ফোন ভাইব্রেট করল। কানাড ফোন তুললেন—শহীদ সিং।

ইয়েস?

জব ডান্ স্যার।

গুড্। উইল স্পিক লেটার।

ফোন কেটে গেল। কানাডের মুখে মৃদু হাসি।

ব্রিগেডিয়ার ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘এখন তো আর আমার কিছু করার নেই। আজ রাতটা আমি সুজান সিং পার্কের সেফ

হাউসে থাকব। আর টিমকে ডাকো ওখানে।’ ঘড়ি দেখলেন ব্রিগেডিয়ার—ন’টা দশ। ফোনে বললেন, ‘রাত দশটায়।’

বার-এ ফিরে এসে কানাডকে বললেন, ‘ইউ উইল হ্যাভ টু এক্সকিউজ মি। সাম্ প্রবলেমস্।’ এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করলেন।

‘সী ইউ। ডোন্ট হারি, এনজয় ইওর ড্রিংক।’ হাত নেড়ে বার থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্রিগেডিয়ারের ড্রাইভার আগে আর্মিতে ছিল। প্রেম সিং। বছর দশেক ওঁর কাছে। প্রেম সিং আগেই খবরটা পেয়েছে খানসামার কাছে। জানে, সাহেবকে সহানুভূতি জানিয়ে কোনো লাভ নেই। উনি এসব পছন্দ করেন না। যেটুকু কমনীয়তা ছিল সেটাও মেমসাহেব মারা যাবার পর থেকে চলে গেছে। শুধু বলল, ‘হুকম্ সার।’

ঘর চলো। ফির সুজন সিং পার্ক।

সাব্, অগর হমসে কুছ...

কথাটা উহ্যই রাখল।

উত্তর দিলেন না ব্রিগেডিয়ার। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বললেন, ‘প্রেম সিং, পেট্রলিং সেরে ফিরে এসে যদি দ্যাখো ক্যাম্পে আতঙ্কবাদীরা হামলা চালিয়েছে, তোমার সাথীরা মারা গেছে, তুমি কি করবে?’

‘পহলে তো ঘর সামহালেঙ্গে। কুছ সাথীওঁ কা ডিউটি লগায়েঙ্গে। অউর হম্ খুদ আতঙ্ক বাদীয়োঁ কা পতা লগাকে উনকা খুন পী যায়েঙ্গে।’ গাড়ি চালাতে চালাতেই বলল প্রেম সিং।

সহী কহা। সাবাশ্। হম্ ভি ওয়হি করনেওয়ালে হ্যাঁয়।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার বললেন, ‘দেখো প্রেম সিং, আজ বাড়িতে অ্যাটাক হয়েছে, কাল আমাদের গাড়িতে বোম্ রাখতে পারে। এখন থেকেই তুমি গাড়ি স্টার্ট করার আগে ভালো করে চেক্ করবে। আর গাড়ি ছেড়ে যত পারো কম যাবে। সাবধানী বর্তো। ডবল্। সম্ঝ গয়ে? কোই শক্?’

‘নহীঁ সাব্।’ গাড়ি চালাতে চালতে অর্ধেক স্যালুট দিয়ে ফেলল প্রেম সিং।

বাংলোর সামনে গোটা পাঁচেক পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, একটা ফায়ার এঞ্জিন তখনও দাঁড়িয়ে।

এগিয়ে গেলেন ব্রিগেডিয়ার। একজন কনস্টেব্‌লকে বললেন, ‘বড়া সাব কৌন?’ আঙুল দিয়ে দেখাল কনস্টেবল। এগিয়ে গেলেন ব্রিগেডিয়ার। দিল্লি পুলিশের অ্যান্টি টেরর সেলের চিফ্ অনিল প্রধান। চেনা।

ব্রিগেডিয়ারকে দেখে একটু হাসলেন প্রধান।

শের কে ঘর মেঁ হি ডাকায়তি?

মৃদু হাসলেন ব্রিগেডিয়ার, ‘কী করা যাবে। দ্য টাইমস্ উই লিভ!’

এনিথিং টু ডু উইথ হোয়াট মাই বস্ ওয়াজ টেলিং মি, ইউ নো হোয়াট আই মীন্।

পারহ্যাপস্, পারহ্যাপ্স নট্; বাট আই ডোন্ট রিয়্যালি বিলিভ দ্যাট্।’

তাই হবে। এরা ভালোভাবেই তৈরি ছিল। একটা ইন্‌সেনডিয়ারি ফাটেনি ঠিকমতো। মার্কিং দিল্লি পুলিশ আর্মারি। লজ্জার ব্যাপার। ঘুন সব কাঠেই ধরে। যাক্, আমি একটু দেখি।

বাংলোর ভিতর প্রায় সবই ছাই হয়ে গেছে। শোবার ঘরের আলমারিতে ভালো করে আগুন লাগার আগেই ফায়ার ব্রিগেড এসে পড়েছিল বোধহয়—তাই বেঁচে গেছে। খানসামাকে ডেকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গাড়িতে ফিরে চললেন। হাত নেড়ে প্রধানকে বাই করলেন। গাড়িতে বসে হোম মিনিস্টারকে ফোন করে ঘটনাটা জানালেন। উনি বললেন, পি.এমকে উনিই খবরটা দেবেন। সহানুভূতি জানালেন, আর বললেন জীবিত বা মৃত, সবাইকে ধরতে হবে। ইঙ্গিত দিলেন যে মৃত হলেই ভালো—ঝামেলা কম। ব্রিগেডিয়ার যখন সুজান সিং পার্কের ফ্ল্যাটের দরজায়, ঘড়ি বলছে সোয়া দশটা।

৬

টিম আগেই পৌঁছেছিল। ব্রিগেডিয়ার যখন ঢুকলেন, সান্টা সবে নিজের ব্রিফিং শেষ করেছে। রুদ্র দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাতের হুইস্কির গ্লাসটা ঘোরাচ্ছে। বিজয়ের হাতেও গ্লাস, সে একটা সোফাতে বসে ছাতের দিকে চেয়ে আছে। সকলেরই মুখের ভাব কঠিন।

ব্রিগেডিয়ার বেল বাজিয়ে কেয়ারটেকারকে ডেকে ড্রিংকের অর্ডার দিলেন। তাকালেন একবার সবার দিকে। ড্রিংক না আসা পর্যন্ত কিছুই বললেন না। একটা ড্রিংক শেষ করে আর একটা আনালেন। সবাই চুপ করেই আছে। দ্বিতীয় ড্রিংকে চুমুক দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। প্রেম সিং একটা পুরনো প্রিন্সিপ্‌ল আজ মনে করিয়ে দিল। এমন অবস্থায় শুধু হট্ পারসিউট। যেখানে যেতে হবে যাবে, শেষ করবে। কেননা, বড়ো রকমের কোনো একটা ফন্দি না থাকলে এতবড়ো একটা রিস্ক—প্রায় বোলতার চাকে ঢিল মারার মতো—ওরা কখনোই নিত না। হোম মিনিস্টারও আমাকে সেই ইশারাই করলেন। কোই শক্?

বিজয় আর রুদ্র দুজনেই স্যালুট মারল, ‘নো স্যার।’

মাথা হেলালেন ব্রিগেডিয়ার। কারোর দিকে বিশেষ না তাকিয়েই বললেন, ‘কী ভেবেছ?’

‘স্যার, আমার ধারণা এটার দুটো উদ্দেশ্য। এক, আপনাকে ভয় দেখানো বা তাড়াহুড়ো করতে বাধ্য করা, আর দুই আসল লোকদের দিক থেকে আমাদের নজর সরিয়ে দেওয়া। আর এর পিছনে একটাই কারণ আমার মনে হয়—ওরাও বোধহয় কোনো একটা টাইমটেবলের চাপে আছে।

‘হুম্। একটা কথা তোমরা জান না।’ ক্লাবে কানাডের সঙ্গে আলাপের ঘটনাটা বললেন।

সুস্মিতা হাত তুলল।

ইয়েস?

আমার মনে হয় স্যার, কানাড যখন আপনার সঙ্গে বসে, তখনই ঘটনাটা ঘটেছে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে কানাড জানত এরকম কিছু একটা হবে, এবং সেজন্য আপনাকে এনগেজ করে রেখেছিল।

বিজয় বার কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘এটাও তাহলে প্রমাণ হয় যে কানাড জানত আপনি ওই সময় বাড়ি থাকবেন না। প্রশ্ন, জানল কী করে? ক্লাবের ব্যাপারটা আমার মনে হয় চান্স। আপনি অন্য কোথাও যেতে পারতেন। ক্লাবে গেছেন, আপনাকে দেখে লোভ সামলাতে পারেনি।’

পসিব্‌ল আই উইল ইভ্‌ন সে প্রোবেব্‌ল।

অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং, স্যার। ওরা ইচ্ছা করলেই অ্যাটাক তখন করতে পারত যখন আপনি বাড়িতে। অস্ত্রশস্ত্র, লোকবল কিছুরই তো অভাব নেই, তাহলে করল না কেন? করল না, তার কারণ তাহলে রিঅ্যাকশন যা হত সেটা সামলানোর মতো ক্ষমতা বোধহয় নেই। সুতরাং আমাদের নেভির ভাষায় এটা ওয়ার্নিং শট্‌।

এবার রুদ্র।

লেট্‌ মি অ্যাড টু দ্যাট, স্যার। বিজয়ের পয়েন্টটা মাথায় রাখলে, এটাই মনে হয় যে এটা একটা ওদের উইক পয়েন্ট। আমরা যদি ওদের পুরো অর্গানাইজেশন নাড়িয়ে দিতে পারি, ওদের ‘কম্যান্ড কম্যুনিকেশন’ অর্থাৎ কম্যান্ড—আমরা ধরেই নিচ্ছি ভারতে সেটা কানাড এবং নীচের লোকেদের মধ্যে কথাবার্তা ব্যাহত করতে পারি, তাহলে গোলমাল পাকাবে। কানাডের পর কে আছে জানি না। দু’তিনজনও যদি হয়, তাহলে গোলমাল আরো ভালো পাকাবে।

‘সেটা কি করে সম্ভব?’ শর্মিলার প্রশ্ন।

টিট্‌ ফর ট্যাট্‌। কানাড আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে, আমরা এবার হাত ধুয়ে ওদের পিছনে পড়ে যাব, জীবন অতিষ্ঠ করে তুলব।

প্রত্যক্ষে আসবে, নয় পরোক্ষে। পরের অ্যাটাক কোথা দিয়ে আসবে জানতেও পারবে না, উল্টো-পাল্টটা ডিসিশন নেবে।

অ্যাকসেপ্টেড। কী করবে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু নো। জাস্ট প্লে সেফ্‌ ফ্রম দ্য মিডিয়া।

‘লাস্ট পয়েন্ট স্যার।’ সুস্মিতা, ‘ওরা জানল কী করে যে ওদের ব্যাপারে আপনার একটা রোল আছে?’

আঙুল তুললেন ব্রিগেডিয়ার, ‘গুড পয়েন্ট।’

শর্মিলাকে বললেন, ‘গেট্‌ মি মালতী।’

মালতী শর্মা ব্রিগেডিয়ারের সেক্রেটারি। ডান হাত, বাঁ হাত এবং তৃতীয় নয়ন। স্বামী মারা গেছেন, ছেলেপুলে নেই, অফিসই ওঁর সব। শর্মিলা মালতীকে ফোন লাগিয়ে ফোনটা বাড়িয়ে দিল ব্রিগেডিয়ারের দিকে।

‘মালতী। সবই তো শুনেছ। আমরা পরের পদক্ষেপ প্ল্যান করছি। উইল ব্রিফ ইউ লেটার। আপাতত, উই সাসপেক্ট যে আমাদের আল্ট্রা-হাই সিকিউরিটি মিটিংয়ের খবর লিক হয়েছে। ফার্স্ট, সেদিন যে সব স্টাফ ডিউটিতে ছিল তাদের অন্য জায়গায় শিফ্‌ট করাও কিছুদিনের জন্য। প্রত্যেকের আর এক রাউন্ড সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স হবে। কেউ বাদ যাবে না, ঝাড়ুদার পর্যন্ত না। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, পরিবারে ক্যান্সার যার জন্য টাকা চাই—ইউ নো দ্য ড্রিল।’

মালতীর উত্তর শুনলেন, ফোন কেটে দিলেন।

৭

সেই রাতে।

হ্যাঁ শহীদ, বোলো।

স্যার, কাজ তো হয়ে গেছে, লোকেদের কি বোনাস দেব?

দাও। আর এটা হয়েছে বলেই বসে থেক না। কিপ্‌ আপ্‌ দ্য প্রেসার। আর সিং-য়ের টিম মেম্বারদের খোঁজ-খবর নাও। দু’একটাকে এলিমিলেট করো। আর শোনো, আমি দিন দুয়েক পরে বাইরে যাব। তখন কোরো যা করবার।

—জী স্যার। হো যায়েগা।

৮

সেই রাতে।

সান্টা, হোয়াট ক্যান ইউ অ্যাড?

স্যার, কানাডের ফোন রেকর্ড থেকে জানা যাচ্ছে যে কলকাতায় বেশ কয়েকটা ফোন করেছে। কলকাতা হচ্ছে ফ্রড আর স্ক্যামওয়ালাদের আড়ৎ। খোঁজ লাগিয়েছি। হয়তো ওখান থেকেও লন্ডারিং হচ্ছে। কানাডের বাড়ির সামনে সিসি টিভি বসিয়েছি।

থাকে কোথায়?

দিলশাদ বাগ। তবে আরো একটা আড্ডা আছে। এম এল এ কানহাইয়ালালের ফার্ম হাউস। ওখান থেকে ওর ফোনে কয়েকটা কল হয়েছিল, তাই জানা গেছে।

তাহলে ওই ফার্ম হাউস থেকে আর যত কল হয়েছে সেগুলো ট্রেস করিয়েছ?

হ্যাঁ স্যার। যতগুলো কল ওখান থেকে হয়েছে গত ছ’মাস ধরে, সব ফোনগুলোর মালিকদের নাম-ঠিকানা জোগাড় হয়েছে।

কী পেলে?

দুটো লোক সন্দেহজনক। এক, রাজা ঠাকুর ওরফে রাজাদাদা। ডন্‌। থাকে মোরদাবাদে। আর অন্যজন শহীদ সিং। আগে দিল্লি পুলিশে ইন্সপেক্টার। চাকরি ছেড়ে বলে ব্যবসা করছে, কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়। দিল্লি পুলিশকে বলে দেওয়া হয়েছে।

অদ্ভুত বোকা তো! নিজের নামে ফোন নিয়েছে।

ফোন আসল নামে নয় স্যার। তবে বাড়ি ছেড়ে পালাবে কোথায়? কল্‌ অরিজিন দেখেই ট্রেস করা গেছে।

ঠিক আছে। এই রাজা আর শহীদের ওপর নজর রাখছ তো?

হ্যাঁ স্যার, আর কিছুক্ষণ আগে দিল্লি পুলিশকে বলেছি যে আমাদের সন্দেহ আপনার বাংলোতে যে সেন্ট্রি খুন হয়েছে তার পিছনে এরা আছে। কথাটা নীচের তলাতেই চালিয়েছি। এতক্ষণে দিল্লিতে ছড়িয়ে গেছে।

ফাইনালি, মিডিয়ার কী ব্যবস্থা করেছ?

গল্প তৈরি স্যার। আজ রাতেই রিলিজ হবে।

গুড। দিস মিটিং নাও ওভার। কাল কথা হবে।

তৃতীয় চক্র

কোন পথে?

১

ইজাজ আবদুল্লা দুবাই পুলিশের অ্যান্টি টেররিজমের বস্। পুলিশের যা হয়ে থাকে, দিন-রাত সবই এক। কাজেই যখন রাত দশটায় দিল্লি থেকে ফোনটা এল, আবদুল্লা অবাক হল না। মন দিয়ে ওপাশের কথা শুনল, তারপর বলল, ‘দিস্ ইজ ব্যাড্। কী করতে হবে?’

শেখ আবু বক্‌র্ অল্ ইসফাহানী। যদি সম্ভব হয় ফোন ট্যাপ। অন্তত কারা ওর কাছে যাওয়া-আসা করে সেটা জানা এবং তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড।’

‘সেটা এখনই বলতে পারব।’ পাশে রাখা একটা প্যাড্ টেনে নিল আবদুল্লা। ‘একজন বিল্ ব্রায়ান্ট। পেশায় ব্যাংকার। আমেরিকান। আগে একটা ভালো ব্যাংকেই ইন্‌ভেস্টমেন্ট দেখত। কী একটা কারণে ব্ল্যাকলিস্টেড। এখন আবু-র ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইসার। আর দ্বিতীয় রহিম বা রহিমুল্লাহ্। পাকিস্তানি। করাচীতে কাস্টম্‌স অফিসার ছিল। একটা খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে পালাতে বাধ্য হয়। আবু-র বাঁ হাত যদি ব্রায়ান্ট হয়, রহিম ডান হাত।’

থ্যাংক ইউ। কাজে লাগবে। তবে আবু বক্‌র—এর গতিবিধি-র ওপর নজরটা...’

‘হয়ে যাবে। ফিকর্ নিস্।’

শুকরান। শখা খ্যায়র।

ফোনটা রাখল বিজয়। একটা এসএমএস লিখে কোডেড মোবাইলে পাঠিয়ে দিল সান্টার কাছে।

২

সকাল সকালই ফোনটা এল। রুদ্র তখনও বিছানায়। অলসভাবে ফোনটা তুলল।

‘মর্নিং। অ্যাওয়েক?’ ওপাশ থেকে সান্টা।

আই অ্যাম নাও। বল।

কানাড হামবুর্গ যাচ্ছে পরশু। আজ সকালে টিকিট বুক হয়েছে। ফ্লাইট ডিটেল...

পরে নেব।

হামবুর্গে গাড়ি ভাড়া করেছে অ্যাভিস থেকে। ডিটেল পরে পাওয়া যাবে।

আর?

রাজা মীরাটে থানা গেড়েছে। শহীদ সিং আজ মীরাট যাবে।

ভেরি গুড্। বাকি আমি দেখছি।

ডি সি ওয়েস্টকে ফোন করল রুদ্র।

কী ব্যাপার মেজর? তোমার তো দেখাই পাওয়াই যায় না। তা এত সকালে?

একটা ছোটো অপারেশন করব। রাজৌরী গার্ডেনের এস এইচ ও-কে বল একটু চোখ বন্ধ করতে। তবে যা হবে দিল্লির বাইরেই হবে। আর লোকটা রোগ পুলিশ অফিসার, এখন ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে ভিড়েছে।

ঠিক আছে। বাট্ উইদিন লিমিট্স।

‘বুঝেছি। এর অর্থ খুন-টুন যেন না হয়।’ ফোন রাখল রুদ্র।

এবার বিজয়। ওকে ডিটেল্ড ইনস্ট্রাকশন দিল। তারপর উঠে গেল চা করতে।

রুদ্র থাকে আর কে পুরমের সেক্টর তেরোর একটা ফ্ল্যাটে। অবশ্য মাসে দশ দিনও থাকে কিনা সন্দেহ আছে। একটা চাকর আছে। পাশের বাড়ির। রুদ্র থাকলে একটু হাত লাগিয়ে দেয়, এই পর্যন্ত। সকালের ব্রেকফাস্ট অবশ্য ও-ই করে।

চায়ের পেয়ালা হাতে সোফায় এসে বসল। বস্‌কে ফোন করতে হবে। কিন্তু সেটা করার আগেই ফোন বাজল। শর্মিলা। একসাইটেড্ শোনাচ্ছে।

কাল একটা গেসের ওপর ওপর ভিত্তি করে লন্ডনে এস.আই.এস. এর বান্ধবী জেন-কে একটা মেল পাঠিয়েছিলাম। তার উত্তর আধঘন্টা আগে এসেছে।

এত হাই স্পীডে ব্রিফিং দিলে হয়? কী মেল করেছিলে?

আমার মনে হচ্ছিল যে এই চক্রান্তের পিছনে যারা আছে তারা নিশ্চয়ই বিরাট ধনী। আর তারা পাবলিকে হয়তো আসে না।

তারা বিরাট ক্রিমিনাল-ও তো হতে পারে?

নিশ্চয়ই পারে। তবে খুব বড়ো ক্রিমিন্যালরাও নিজেদের রেগুলার রাস্তা ছেড়ে বেরোয় না, অন্তত লং-টার্ম প্ল্যানিং করে না। যাদের নিজেদেরই জীবনেরই ঠিক নেই, তারা লংটার্ম প্ল্যানিং কী করবে? আর দাঙ্গা বাধিয়ে তারপর সামাজিক আর রাজনৈতিক গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে প্রফিট বার করে আনা... উহুঁ, আমার মনে হয় না।

ঠিক আছে। বুঝলাম। তা তোমার বন্ধু কী বললে?

ওদের কাছে একটা মেইল এসেছিল কয়েকদিন আগে। হামর্বুগ থেকে।

হামবুর্গ?

অবাক হলে কেন?

ও কিছু না। পরে বলব। তুমি বলো।

যে মেইল করেছে তার নাম শ্লেলার। জার্মান ইহুদী। সাইমন উইজেনথাল ইন্‌সিটিটিউটে ছিল বহুদিন। তারপর আবার টেল-আভিভ থেকে জার্মানিতে এসে এখন থাকে। কী করে জানা নেই। জেনের ধারণা মোসাদ (ইজরায়েলের স্পাই এজেন্সি)-এর ‘স্লিপার’ (যারা চুপ করে বসে থাকে, যতক্ষণ না তাদের প্রয়োজন হয়)। তাতে কিছু এসে যায় না। কাজের কথা হচ্ছে, শ্লেলার কিছুদিন ধরে সেই সব বিলিওনেয়ারদের খোঁজ করছে যারা লোকচক্ষুর সামনে থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। তা শ্লেলারের জালে তিনটে রাঘব বোয়াল পড়েছে, সেই খবরই দিয়েছে এম আই সিক্সকে।

এম আই সিক্সকে কেন?

কারণ এই তিনটে লোকই ব্রিটিশ।

রুদ্র ভাবল একটু। চা খেল দু’চুমুক।

এই শ্লেলারের কথার ওপর ভরসা করা যায়?

বললাম ত' সাইমন ইউজেনথাল ইন্সটিটিউটে ছিল। ওদের কাজ-ই নাৎসিদের খুঁজে বার করা, পৃথিবীর কোনো কোণে গিয়ে ওদের হাত থেকে কেউ বাঁচেনি।

এদের সবার রেকর্ড আছে শ্মেলারের কাছে?

অবশ্যই আছে। কপি দেখে বলেছে। হার্ড কপি। তাদের সমস্ত ডিটেল আছে।

গুড্। জেন্‌কে বলে দাও আমরা ইন্টারেস্টেড। কী প্রোগ্রাম করা যায় দেখি। আর... থ্যাংক ইউ।

চায়ের কাপ শেষ করল রুদ্র। চাকরটা মিনিট পনেরোর মধ্যেই আসবে ব্রেকফাস্ট বানাতে। তার আগেই বসের সঙ্গে কথাটা বলে নেওয়া দরকার। ফোন লাগাল।

মর্নিং স্যার। বল।

গুড মর্নিং। বলো।

সকাল থেকে যা যা কথা হয়েছে সবই বলল রুদ্র। একটু আগে সান্টার মেসেজে পাওয়া ব্রায়ান্ট আর রহিমের কথাও।

সো, হোয়াট ডু ইউ প্ল্যান টু ডু?

এক, বিজয় আর একটা অ্যাকশন নেবে এই রাজাদাদা আর শহীদ সিংয়ের বিরুদ্ধে। তারপর ও যাবে দুবাই। আজ আর কালকের মধ্যেই এটা করতে হবে।

ওকে সো ফার, দেন?

আমি শর্মিলাকে নিয়ে লন্ডন যাব। ওর এম আই সিক্সে কন্ট্যাক্ট কাজে লাগবে। আপনি স্যার এস আই এসের (ব্রিটিশ স্পাই এজেন্সি) বয়েড, ফ্রান্সে সুরেটের (ভ্জত্রষ্ঠত্র্ ভাঁল, আর বার্লিনে বিএন ডির ডেকারকে বলে রাখবেন। ওদের সাহায্য দরকার হতে পারে। আর তাছাড়া জানিয়ে রাখা ভালো।

সুস্মিতাকে কাজে লাগাতে চাও?

হ্যাঁ স্যার। ওকেও দুবাই পাঠাব বিজয়ের সঙ্গে। ব্যাক আপ হিসাবে।

আর এখানকার ব্যাপারে?

সান্টাকে ইন্সট্রাকশন দিয়ে যাব, ও কো-অর্ডিনেট করে নেবে।

ঠিক আছে। গো অ্যাহেড। কবে যাচ্ছ?

আমরা আজকেই। বিজয়রা কাল বা পরশু।

থ্যাংক ইউ স্যার।

ফোন কেটে গেল।

৩

শহীদ এই গাড়িটা নতুন কিনেছে। একটা অটোমেটিক গাড়ি। গিয়ার বদলাতে হচ্ছে না, বেশ নিশ্চিন্তেই চালানো যাচ্ছে।

এখন বেলা এগারোটা। রাজৌরী গার্ডেন থেকে বেরিয়ে দিল্লি আড়াআড়ি পার করে অক্ষরধাম পৌঁছতে লেগে গেল একঘন্টা। অবশ্য এখান থেকে মীরাট এক্সপ্রেস ওয়ের দৌলতে ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই পৌঁছনো যাবে। রাজার সঙ্গে দেখা হবে বাইপাসের একটা রিসর্টে। বেলা দেড়টায়। এখনো অনেক সময় আছে।

এক্সপ্রেস ওয়েতে পড়ে স্পিড তুলল শহীদ সিং। স্পিডোমিটারের কাঁটা একশ দশ দেখাচ্ছে। বেশ কিছুটা পিছনে একটা সাদা গাড়ি। হঠাৎ ফট্ করে একটা আওয়াজ। বাঁ দিকের চাকাটা ছিটকে গেল। ভাগ্যিস বাঁ লেন ধরেই চলছিল, গাড়িটা প্রায় অর্ধেক উল্টে ব্যারিয়ারে গিয়ে ধাক্কা খেল। ভিতরে শহীদ সিং। এয়ারগ্যাস থাকা সত্ত্বেও স্টিয়ারিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পাঁজরের কটা হাড় ভেঙেছে। শহীদ অজ্ঞান। পিছনের সাদা গাড়িটা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। বিজয় নামল গাড়ি থেকে। হাতে একটা রিমোট। অপারেশন ভালোই হয়েছে। চাকার সঙ্গে লাগল। লো-পাওয়ার এক্সপ্লোসিভটা রিমোট দিয়ে ফাটিয়েছে বিজয়। সকালে রাজৌরী গার্ডেনে গিয়ে এই কাজটাই করেছে।

দেখতে দেখতে হাইওয়ে স্কোয়াড এল, অ্যাম্বুলেন্স এল। একটা টো-ট্রাক এল। টো-ট্রাক বিজয়ের এজেন্সির। টো-ট্রাক এজেন্সির চেনা গ্যারাজে নিয়ে যাবে গাড়িটা। সেখানে গিয়ে এক্সপ্লোসিভের সমস্ত চিহ্ন সরিয়ে ফেলবে। তারপর শহীদ সিংকে—হাসপাতালে খবর দেওয়া হবে। হাসপাতালকে বলা আছে, অন্তত সাত দিন শহীদ সিংকে 'অবজার্ভেশনে' রাখবে।

৪

লন্ডন হয়ে হামবুর্গ। লন্ডনে অ্যালবার্ট এমব্যাংকমেন্টে এস.আই.এসের চীফ বয়েডের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মেইলটা এস.আই.এস-এর সিকিউর মেইলে এসেছে, সুতরাং যে পাঠিয়েছে সে এস.আই.এসের ঘাঁতঘোঁত জানে, সুতরাং ব্যাপারটা যে উড়ো নয় সেটা বোঝা গেছে। বয়েডকে দিল্লির ঘটনা একটু কাট-ছাঁট করেই বলেছে রুদ্র, আর সেই সুবাদে দরকার হলে সাহায্যের আশ্বাসও পেয়েছে। তবে রুদ্রর আসাতে যেটা আসল লাভ হয়েছে সেটা হল জেন-কে সঙ্গে পাওয়া। জেন ওস্তাদ ফাইনান্সিয়াল অ্যানালিস্ট। গোলগাল হাসি-খুশি মেয়ে, চোখে চশমা।

এক্সিকিউটিভ ক্লাস। রুদ্রর পাশে কেউ নেই। পিছনের দুটো সীটে জেন আর শর্মিলা গল্প করছে।

লন্ডন থেকে হামবুর্গ এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট। পুরো ঘটনাগুলো মনে মনে একবার সাজাল রুদ্র। হামবুর্গ একটা চান্স, কিন্তু ছাড়া যায় না। আর তাছাড়া কানাড হামবুর্গেই আসছে। কেন কে জানে। নজর রাখতে হবে। ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রা মতনই এসে গিয়েছিল রুদ্রর। ল্যান্ডিং-য়ের অ্যানাউন্সমেন্ট হতে নড়ে চড়ে বসল।

হামবুর্গের ফুলস্বাট্‌ল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে দেখা গেল ওদের জন্য ফেয়ারমন্ট হোটেলের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হামবুর্গের সবথেকে দামি হোটেল। বয়েল করিয়ে দিয়েছে। অবশ্য ওরও ইন্টারেস্ট আছে। শ্মেলারের থেকে কি পাওয়া যায় সেটা খতিয়ে দেখে পুরো রিপোর্ট বয়েডকে দেবার জন্য জেনকে ওদের সঙ্গে দেওয়া। আর নিশ্চয়ই অন্য লোকও থাকবে। যে বা যারা ওদের ওপর নজর রাখবে। ফেয়ারমন্টের মতো বড়ো হোটেলে এই সুবিধা। লবিতে তিন-চার

ঘন্টা বসে থাকলেও কেউ জানতে চাইবে না কারণটা। আর কারোর ওপর নজর রাখতে গেলে লবিতে বসে লিফটের ওপর চোখ রাখাই সব থেকে সহজ।

গাড়ি ন্যুর ফারনস্টিগ ধরে বিনেনআলস্টারের পাশ দিয়ে চলল। শহরের দুটো লেকের মধ্যে এটা ছোটটা। সোনালি রোদে লেকের জল ঝক্-ঝক্ করছে, শর্মিলার কী আনন্দ। লেকের ওপর ছোটো ফেরিগুলো এপার-ওপার করছে। সেগুলো নিয়ে জেনকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। জেন হাসিমুখেই উত্তর দিচ্ছে।

হোটেলে জেন আর শর্মিলার দুটো ঘর, আর রুদ্র-র স্যুইট। তিনটেই ফ্লোরে এক ঘরে ঢুকেই শ্মেলারকে ফোন করল রুদ্র।

‘হের ডক্টর শ্মেলার? মাই নেম ইজ রুদ্র। সীমস্ ইট ইজ স্টিল নট্ কোল্ড ইন জার্মানি।’ এটাই কোড, পরিচয় করার জন্য। জেন দিয়েছে।

‘ও ইয়েস, মিস্টার রুড... মে আই কল্ ইউ রুডি? আই ওয়াজ টোল্ড অ্যাবাউট ইউ।’ ভদ্রলোকের ইংরাজি একেবারে পরিষ্কার, ঝরঝরে। গলাটা ভারী, বয়স হয়েছে বোঝা যায়।

হোয়েন ক্যান উই মি ইউ? আই উইল হ্যাভ টু ইয়ং কলিগস্ উইথ মি।

‘ইয়েস, আই ওয়াজ টোল্ড অ্যাবাউট দেম্ অলসো। কাম দিস ইভনিং অ্যাট নাইন। আমার বাড়ি আসার জন্য ফিশার হাফেন থেকে প্রোস এলকেস্ট্রাশে দিয়ে দেখবেন ডান হাতে একটা ছোটো রাস্তা চলে গেছে উচুঁ ঘাস জমির ওপর দিয়ে। তার পিছনে কিছু পুরনো বাড়ি। আমারটা ২৫ নং।

সী ইউ অ্যাট নাইট।

সী ইউ।

ঘড়ি দেখল রুদ্র। সাড়ে পাঁচটা। ডিনার খেয়ে শ্মেলারের বাড়ি পৌঁছনো যাবে। আর একটা ফোন করল। বিএনডি-র ডেকারকে। ভালো করেই চেনে রুদ্র। গত বছর দিল্লিতে ইন্টেলিজেন্স কনফারেন্সে এসেছিলেন। মাই ডিয়ার লোক। দেখতে সাধারণ, কিন্তু চোখ দুটো যেন জ্বল-জ্বল করে। আগে মিউনিখে পুলিশ চিফ ছিলেন, বাডার-মাইনহফ্ গ্যাংকে শায়েস্তা করার পরই ওঁর পুলিশি ভাগ্য খুলে যায়।

হের ডেকার, রুডি হিয়ার। রিমেমবার মী?

‘ও ইয়েস। পম্মি (ব্রিগেডিয়ারকে ওই নামেই ডাকেন ওঁর সমকক্ষরা) টোল্ড মি ইয়েসটারডে দ্যাট ইউ উড্ বি কামিং। তা কোথায় উঠেছ?’ টেলিফোনেই একটা শিষ দিলেন ডেকার।

‘লিভিং দ্য হাই লাইফ, আর উই?’ হাসল রুদ্র। ‘কার্টসি মিস্টার বয়েড অফ্ এস.আই.এস।’

গুড। বাই দ্য ওয়ে, আই অ্যাম ইন হামবুর্গ টুডে। হাও অ্যাবাউট ডিনার?

মাই প্লেজার। আই অল সো হ্যাভ টু ইয়াং লেডিজ উইল মি।

আই সি। শুধু হাই লাইফ নয়। পম্মি কি আজকাল প্লেবয়দের রিক্রুট করছে নাকি? এনিওয়ে, দে আর মোর দ্যান ওয়েলকাম। সন্ধ্যা সাড়ে ছটা, গ্রোস এলবস্ট্রাসেতে ফিশারহাফেন রেস্টুরেন্ট। ১৪৩ নম্বর। উইল বি দেয়ার। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।

ফোন রাখতেই বেল বাজল। দরজা খুলতেই দুই মূর্তিমতী। জেন শ্যাম্পেন শ্যাম্পেন করে চেঁচাল, তারপর কম্পিমেন্টারি বাস্কেটে রাখা শ্যাম্পেনের বোতলটা নিয়ে হাত করল। রুদ্র এগিয়ে গিয়ে ওর হাত থেকে বোতলটা খুলল। জেন দেখে বলল, ‘ইউ আর গুড্ অ্যাট্ দিস।’ রুদ্র উত্তর দিল, ‘আই গো ফর সফিস্টিকেটেড্ উইমেন।’ ওর পিঠের পিছনে দাঁড়িয়ে শর্মিলা মুখ ভেংচাল।

শ্যাম্পেন ঢালা শেষ হলে ওদের হাতে গেলাস দিয়ে রুদ্র বলল, ‘হিয়ারস্ টু সাকসেস ইন হামবুর্গ।’ গ্লাস শেষ হলে যোগ করল, ‘শোন, আজ বিকালের প্ল্যান এই...’

হাফেন মানে হার্বার। ফিশারহাফেন মানে ফিশারিজ হার্বার বা ফিশিং পোর্ট। যেতে যেতে এই কথাই শর্মিলাকে বলল জেন। রুদ্রর মন অন্যত্র। ডেকারের আজ এখানে থাকার মানে কি? নিশ্চয়ই চিফদের মধ্যে বিশদে কথাবার্তা হয়েছে। তবে এক দিকে ভালোই হল, সঙ্গে তো কোনো অস্ত্র নেই, ডেকারকে বললেই হবে, আর শ্মেলার সম্বন্ধে আরো খোঁজ ডেকারই দিতে পারবে। সিটি ম্যাপ দেখে বোঝা গেল ফিশারহাফেন একটা বেশ নামি-দামি খানদানি খাবার জায়গা। এলবে নদীর ওপরেই। ভিউ খুব সুন্দর। যদিও একটু এগোলেই বড়ো বড়ো দৈত্যের মতো ক্রেন।

ডেকার এলেন ঠিক সাড়ে ছ’টায়। সঙ্গে একটি ইয়ং ম্যান। নাম রল্ফ স্টেফনার। আলাপ শেষে ডেকার বললেন, ‘রল্ফ আমাদের সঙ্গে ডিনার করছে না। ওর ডিউটি বাইরে। তোমাদের চিনিয়ে দিতে নিয়ে এসেছি।’ রল্ফ একটু হাসল। তারপর যাবার ঠিক আগে রেস্তোঁরার বাকি টেবিলগুলোর দিকে পিছন করে রুদ্রর হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে গেল। ফিস ফিস করে বলল, ‘বাকিটা তোমার ওভার কোটের পকেটে।’ রুদ্র একটু হেসে মাথা নাড়ল।

যেমন বয়েডকে দিয়েছিল, সেরকমই একটু কাট-ছাঁট করে ডেকারকে ব্রিফ করল। ডেকার বললেন, ‘শুনে মনে হচ্ছে এরা খুব অর্গানাইজড। সাবধান। সেজন্যই রল্ফকে এনেছি। তোমাদের কাছাকাছিই থাকবে। অবশ্য নিজের মোটরবাইকে।’

তারপর একথা-সেকথা এবং খাওয়া। রুদ্র আবিস্কার করেছে মেনুতে রয়েছে ডেনমার্কের বিখ্যাত খাবার ‘শুটিং স্টার’-এর জর্মন সংস্করণ। তিন রকমের মাছ দিয়ে তৈরি ওপেন স্যান্ডউইচ। দুজন মেয়েই নিল অয়েস্টার স্যালাড। আর ডেকার একটা টুনা স্টেক। সাড়ে ন’পাতার ওয়াইন মেনু। শর্মিলা করুণ দৃষ্টিতে রুদ্রর দিকে তাকাতে রুদ্র এক বোতল প’ফু অর্ডার করল। ডেকার একবার ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। ওয়াইন সিলেকশন ভালোই হয়েছে।

খাবারের আগে ককটেল। রুদ্র একটা ড্রাই মার্টিনি, আর শর্মিলা আর জেন দুজনেই পিনা কোলাডার ওপর রইল। খাস জার্মান হিসাবে ডেকার একটা বিয়ার নিলেন। বিয়ারে একটা চুমুক দিয়ে ডেকার বললেন, ‘ছবি কিছু পরিষ্কার হয়েছে?’

একটু একটু। যে বা যারা এই পুরো চক্রান্তের পিছনে তাদের দুটো মেইন শাখার উইং-ও বলতে পারেন। একটা মিড্‌ল ইস্ট বেসড, আর একটা ইন্ডিয়ান। মিড্‌ল–ইস্ট থেকে মানি সাপ্লাই, আর অস্ত্রশস্ত্রও নিশ্চয়ই। ইন্ডিয়ান উইং থেকে এক্সিকিউশন। তবে মোটিভটাই ধরা যাচ্ছে না। এর পিছনে চীন বা পাকিস্তান হলে মোটিভ বোঝা যেত, কিন্তু আমরা ওদের 'ফুটপ্রিন্ট' এখনো পাইনি। তাছাড়া অপারেশন যদি চাইনিজ্‌ হয়, তাহলে খুব বড়ো, পলিটিক্যাল রিস্ক। আর আঙ্ম মাদের কোনো সোর্স পাকিস্তানের কোনো টেররিস্ট গ্রুপ—এমনকি আল-কায়দা বা আইসিস পর্যন্ত এরকম ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে বলে রিপোর্ট করেনি। সেজন্য আমাদের সন্দেহ এর পিছনে কোনো প্রাইভেট গ্রুপ আছে।

রুদ্র-র বক্তব্যটা হজম করতে করতে ডেকারের ওঁর বিয়ারটা শেষ। ততক্ষণে খাবার এসে গেছে। ডেকার আর এ বিষয়ে কোনো মন্তব্যই করলেন না। শুধু বিল দিয়ে ওঠার সময় রুদ্রকে বললেন, 'তোমার কথাগুলো ভেবে দেখার মতো। কীপ্‌ মি পোস্টেড।' হাসলেন একটু, 'অবশ্য তুমি যতখানি উচিৎ মনে করো ততটাই।' রুদ্রও একটু হাসল।

বাইরে এসে ডেকার বললেন, 'যাচ্ছ কোন দিকে?'

এলবেশসি। নো ওয়ারিজ, আমরা ট্যাক্সি নিয়ে নেব।

'ওকে।' ডেকারের সোফার গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়েইছিল। ডেকার বসতে গাড়ি বেরিয়ে গেল।

রুদ্র একটু অন্ধকারে গিয়ে রল্ফের দেওয়া প্যাকেটটা খুলল। একটা বেরেটা নাইন মিলিমিটার ছ৯৬৩, দুটো একস্ট্রা ম্যাগাজিন ওর ওভারকোটের পকেটে ঢোকানো। ডেকার ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছেন বোঝা গেল। যারা ভারতবর্ষের মতো এতবড়ো দেশে খেলতে নেমেছে তারা যে সহজ শত্রু নয় এটা আন্দাজ করেই হয়ত।

একপাশে দাঁড়িয়ে জেন আর শর্মিলা কথা বলছিল। রুদ্র আসতে বলল, 'এবার?'

শ্লেলার যে ডিরেকশন দিয়েছেন সেটা এখান থেকে অন্তত তিন কিলোমিটার। হাঁটবে, না ট্যাক্সি নেব?

'ট্যাক্সি।' সমস্বরে বললে দু'জনে।

ট্যাক্সি যেখানে নামাল তার কাছাকাছি বাড়িঘর নেই। নদীর দিকে কিছু গোডাউন শুধু। তিনজনে এগোল। সামনেই ডান হাতে একটা ফুটপাথ উঁচু জমির দিকে চলে গেছে।

তিনজনে এগোল।

ডানহাতি রাস্তা ধরার মিনিট খানেকের মধ্যে একটা কালো মোটরবাইক এল। এঞ্জিন অফ্‌ করা, গড়িয়ে গড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে গেল। চালক বাইক থেকে নেমে বাইকটাকে রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাথের ওপর চড়িয়ে স্ট্যান্ড নামিয়ে দিল। হেলমেটটা খুলল, সিটের ওপর রাখল। লোকটা পুরো কালো পোষাক পরা। কালো জিন্স, কালো সোয়েটার, হাতে একটা সাব মেশিন গানের মতো, লেজার লাইট লাগানো। লোকটা বাইক থেকে নামার আধ মিনিটের মধ্যে আর একটা বাইক গড়িয়ে গড়িয়ে আগের বাইকটার কাছে এল। এই বাইকটাও গাঢ় রংয়ের। এর চালকও গাঢ় পোশাক পরা। এ আগের বাইকটার পাশ দিয়ে দশ মিটার মতো এগিয়ে গিয়ে পার্ক করল। প্রথম লোকটা ততক্ষণে রুদ্রদের পিছন পিছন অনেকটা এগিয়ে গেছে। রুদ্ররা তখন ১৫ নম্বর বাড়ি খুঁজছে। মিনিট পাঁচেক লাগল। পুরনো টাউন হাউস। একটা আর একটার গায়ে লাগানো। দোতলা। কিন্তু প্রত্যেকটার সামনেই রুমাল সাইজের একটা লন। কাঠের গেট। গেটের দুপাশে নীচু দেয়াল, ভিতরে কাঁটাঝোপ। অন্তত তিন ফুট চওড়া। তারপর একটা চারফুট মতো জায়গায় গর্ত করে সেটা বালি ভর্তি করা। তারপর ফুলের কেয়ারি।

রুদ্র গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে এগুলো দেখল। মুখে চুক করে একটা শব্দ করল, বুদ্ধিমান লোক। 'কী সহজ, অথচ কাজের। যে কোনো লোক দেয়াল টপকে ঝোপের ওপর দিয়ে ভিতরে আসতে পারে, কিন্তু লাফ দিয়ে পালানো শক্ত। এই নরম বালিতে পা বসে যাবে। এখান থেকে চার ফুটের ঝোপ ক্রস করে দেওয়ালের ওপর দিয়ে পালাতে গেলে অ্যাথলিট্‌ হতে হয়। আর রাত্রে নিশ্চয়ই গেটটা ইলেকট্রিফায়েড থাকে। কাজেই...।'

বলতে বলতে ওরা দরজার কাছে। বেল বাজাতে দরজা খুললেন এক ভদ্রলোক। মাঝারি হাইটের। মাথায় একরাশ পাকা চুল। টিকোলো নাক। মুখে একটা হাসি-হাসি ভাব। গায়ে শার্টের উপর একটা পুলওভার চাপানো, মেরুন রঙের। ছাই রঙের ফ্ল্যানেলের প্যান্ট, পায়ে কার্পেটে স্লিপার। 'মিস্টার রুডি?'

'প্লিজড টু মীট ইউ ডক্টর শ্লেলার। দিজ্‌ আর মাই কলিগস্‌, জেন অ্যান্ড শর্মিলা।' হাত বাড়িয়ে দিল রুদ্র।

জেন আর শর্মিলা দুজনেরই গালে চুমু খেয়ে শ্লেলার বললেন, 'কাম ইন্‌, মাই ডিয়ারস্‌।' ওদের পিছনে দরজাটা বন্ধ করলেন শ্লেলার। রুদ্র লক্ষ করল, সাধারণ দেখতে হলেও ভারী। আর তিনটে লক্‌। শ্লেলার আর যাই হোন, অসাবধানী নন। ছোটো এটা প্যাসেজ, তার ডানদিকে লিভিং রুম। একটু এলোমেলো।

'আপনি একাই থাকেন?'

'হ্যাঁ একাই। আমার মেয়ে থাকে ডুসেলডর্ফে। মাঝে মাঝে আসে। গোছগাছ করে দেয়। একজন ক্লিনিং লেডি আছে। ফিলিপিনা। সপ্তাহে দু'দিন আসে। বাকি আমি একাই। এনিওয়ে, কী নেবে বল। আই হ্যাড এভরিথিং। অনেক রকম লোক আসে ত?' হাসলেন।

হুইস্কি ফর মি অ্যান্ড দ্য গার্লস...

আ গ্লাস অফ্‌ হোয়াইট ওয়াইন, প্লিজ।

ওয়াইন সার্ভ করে শ্লেলার এসে ওদের সামনে একটা সোফায় বসলেন, 'আমার রিসার্চ 'সিক্রেট' বিলিওনেয়ার নিয়ে। বেশির ভাগ ঘাগু নাৎসিদের আমরা কায়দা করেছি, এখন আর কেউ প্রায় বাকি নেই। আমি হাল ছাড়িনি। তাদের পরের প্রজন্ম নিয়ে পড়েছি। এই লুকিয়ে থাকা বিলিওনেয়াররা কারা। কী করে শুরু করেছিল এদের প্রথম ব্যবসা! আমি তাদের বয়স ধরেছি আশির আশেপাশে। এরা কেউই আইটি প্রজন্মের নয়। সুতরাং তাদের মূলধন কোথা থেকে এল

সেটা সন্দেহ করা যায় বইকি। আর যদি দেখা যায় এদের টাকা আসলে নাৎসি টাকা, এদের বাবা-মা-রা নাৎসি ছিল, তাহলে তো এদের বিরুদ্ধে কিছু করাই যায়।'

মন দিয়ে শুনছিল ওরা তিনজনেই। জেন বলল, 'এদের টাকা ট্রেস করলেন কী করে?'

উত্তর দেবার আগে রুদ্রর দিকে তাকালেন একবার। রুদ্র বুঝল। শ্মেলার এক্সপার্ট। সাধারণ লোকের সামনে মুখ খুলবেন না। মুখে বলল, 'এরা দুজনেই ফরেনসিক অ্যাকাউন্টেন্ট।'

অনেকটা আশ্বস্ত হলেন যেন শ্মেলার। 'দেখ আমি বয়সের হিসেব ধরে এগিয়েছি। আমেরিকানরা যখন মার্শাল প্ল্যান নিয়ে ইউরোপকে সাহায্য করতে এগোল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, তখন ওই প্ল্যানের ছত্রছায়ায় অনেক বেআইনি কাজও হয়েছে। এমনকি সি আই এ পর্যন্ত সেই সুযোগে বিভিন্ন দেশে নিজেদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে। সে যাই হোক, নাৎসিদের লুঠের টাকা যা স্যুইজারল্যান্ডে জমা হয়েছিল, তার একটা ভালো অংশও বের করে নিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় লাগানো হয়। স্বভাবত এর কো-অর্ডিনেটর ছিল রাইখম্যান। যারা ওর কাছের লোক ছিল, তারা তো এই টাকার ফায়দা উঠিয়েইছে, অন্যান্য দেশের লোক—বিশেষ করে ব্রিটেনে যারা যুদ্ধের সময় পরোক্ষে জার্মানদের সাহায্য করেছিল, তারাও এই তালিকায় ছিল। এদেরই ছেলেমেয়েরা এই টাকায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আর আমার জেহাদ তাদেরই বিরুদ্ধে।'

অনেকক্ষণ কথা বলে একটু হাঁপিয়ে উঠেছিলেন বোধহয় শ্মেলার। নিজের ওয়াইনটা শেষ করে একবার বাকিদের দিকে তাকালেন। তিজনেই ঘাড় নেড়ে না বলাতে উঠে গিয়ে নিজে নিলেন একটা। আবার সোফাতে বসে বললেন, 'আমার জালে পাঁচটা মাছ উঠেছিল। দু'জন জার্মান। তাদের নাম যেখানে পাঠাবার, পাঠিয়ে দিয়েছি।' রুদ্র মনে মনে ভাবল—মোসাদ। ওর কী এসে যায়!

শ্মেলার বলে চলেছেন, 'বাকি দু'জন ব্রিটিশ আর আইরিশ। ব্রিটেনে যে একটি ভালো মতো নাৎসি সমর্থক দল ছিল অসওয়ালডের নেতৃত্বে, সে তো সবারই জানা। সে যা হোক, এই তিনজনের মধ্যে একজন থাকে গুয়াতেমালায়। তার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। বাকি দু'জন সম্বন্ধে শুধু আন্দাজ করেছি।'

'এরা কারা?' রুদ্র শুধোলে।

একজনের নাম রবার্ট রেডভিল। পুরনো বংশ। ওর বংশ পরিচয় একটা খাড়া করতে পেরেছি। থাকে গ্রেনোবলের কাছে একটা শ্যালেতে। ডিটেল কিছু নেই আমার কাছে, তবে ওর ফাইনান্সিয়াল ডিটেল প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ জোগাড় হয়েছে।

'আর অন্যজন?' শর্মিলা জানতে চাইল।

'অন্যজনের নাম পিটার ফিট্জপ্যাট্রিক। আইরিশ। ওর দু ভাই ছিল আই আর এ তে। বাবা ছিল নাৎসী সমর্থক। থাকে সান্টো ডোমিঙ্গোতে। এরও ফাইনান্সিয়াল ডিটেল আছে আমার কাছে।' শর্মিলা আর জেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা ওয়াইন শেষ কর, আমি ফাইল দুটো তোমাদের দিচ্ছি।'

'ফাইল, মানে হার্ড কপি? ইলেকট্রনিক কপি নেই?' শর্মিলা বলল। গম্ভীর ভাবেই উত্তরটা দেবার চেষ্টা করলেন শ্মেলার, কিন্তু হল না। বললেন, 'তোমরা কম্পিউটার যুগের মানুষ। আমি বিশ্বাস করি যে জিনিস আমার জানার বাইরে কেউ দেখবে না, সেটাই সেফ। আমার ফাইলের দুটো কপি আছে। একটা আমার ব্যাংকের সেফে, আর অন্যটা আমার কাছে। সেটাই আমি তোমাদর দেব। অবশ্য আমার নিজস্ব নোটস্ রয়েছে। সে তোমাদের কাজে লাগবে না।'

শ্মেলার ভিতর থেকে একটা ব্রাউন রংয়ের ফাইল ওদের এনে দিলেন। ফাইলটা হাতে নিয়ে রুদ্র উঠে দাঁড়াল, 'আজ আমরা উঠি। রাত হয়েছে। থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং।'

শ্মেলার দরজা খুলে দিলেন। একে একে তিনজনে বেরিয়ে যাবার পর কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে। টেম্পারেচার ভালোই নেমেছে।

বুকভরে নিঃশ্বাস নিলেন।

সেটাই ওঁর শেষ নিঃশ্বাস।

কট্ করে একটা শব্দ। শ্মেলার পড়ে গেলেন। শব্দটা শুনেই রুদ্র পিছনে তাকিয়েছিল। শ্মেলারকে পড়ে যেতে দেখল। এক ধাক্কায় শর্মিলা আর জেনকে মাটিতে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলটা বার করে নিজের ডানদিকে গুলি চালাল। প্রায় পর পরই আরও দুটো গুলির আওয়াজ। তারপর সব চুপচাপ। রুদ্র গুলি চালিয়েই মাটিতে বসে পড়েছিল। প্রায় আধ মিনিট অপেক্ষা করল। আর কোনো আওয়াজ নেই। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল নিজের ডানপাশে। হাত দশেক দূরে একটা বডি পড়ে রয়েছে। কালো পোশাক পরা। দুটো গুলি লেগেছে। একটা গলায়, আর একটা বাঁ পাশে, একটু পিছন দিক থেকে। রুদ্র আন্দাজ করল এটা ওর নিজের পিস্তলের। কিন্তু চারটে গুলির শব্দ হয়েছিল। এই লোকটার গায়ে দুটো, শ্মেলারের একটা। তাহলে চতুর্থ গুলি কে করেছিল? যদি এই লোকটাই করে থাকে, তাহলে কাকে?

রুদ্র এগিয়ে গেল একটু। দশ ফুটের মতো। এখানে আর একটা বডি। মোবাইলের টর্চের আলোয় দেখল, রল্ফ। হতভাগ্য রল্ফ। আর দু'ইঞ্চি বাঁ পাশে সরে থাকলেই আর গুলিটা লাগত না। উঠে দাঁড়াল রুদ্র। পকেট থেকে রুমাল বার করে রল্ফের মুখে চাপা দিল। উঠে দাঁড়াল। ডেকারকে খবর দিতে হবে। এখনই। রুদ্র দাঁড়িয়ে আছে দেখে জেন আর শর্মিলা ওর কাছে এসে দাঁড়াল।

'ও মাই গড', দ্যাট নাইস ইয়ং ম্যান।' জেনের গলাটা ভারী শোনাল। শর্মিলা কিছু বলল না। নিজেকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে মনে হল।

'শোনো, ডেকারকে খবর দিতে হবে এখনই। তবে তার আগে আঙ্ম মাদের একটু কাজ আছে।'

'কি কাজ?' শর্মিলা মুখ খুলল।

শ্মেলার কি বলেছিলেন মনে আছে ত? ফাইলের অন্য কপিটা ওঁর ব্যাংকের ভল্টে রাখা আছে। ডিটেল দেননি। আর তাছাড়া ওঁর

নোটস্। কে জানে তাতে কি আছে। ব্যাংকের ব্যাপারটা ডেকারের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। শ্মেলার নিশ্চয় জার্মান ব্যাংকই ব্যবহার করতেন। আর আমরা ব্যাংকে পাত্তা না পেলেও বি এন ডি'র কথা ওদের রাখতেই হবে। বিশেষ করে যেখানে ভল্টের মালিক খুন হয়েছেন। আর আমরা খুঁজব নোটস্। ওটা তোমাদেরই কাজে লাগবে ফাইলের অ্যানালিসিস করার সময়। ওগুলো অন্য কারো হাতে পড়তে দেওয়া যায় না। এমনও হতে পারে যে রবার্ট রেডভিল আর পিটার ফিটজপ্যাট্রিকের এমন কিছু তথ্য সেখানে রয়েছে যা উনি ফাইলেও রাখেননি।

—'মেক্স্ সেন্স।' জেন কমেন্ট করল। বাড়িটার দিকে পা বাড়াল জেন। লিভিং রুমের উল্টোদিকেই শ্মেলারের স্টাডি। দুটো বড়ো বুককেস, একটা সেক্রেটারি টেবল, একটা গদি-আঁটা চেয়ার। সেফ্ নেই। থাকলেও সেটা লুকোনো। রুদ্র টেবিলের ড্রয়ারগুলো ঘাঁটতে বসল। শর্মিলা এগিয়ে গেল বুককেসের দিকে। অলসভাবে বইগুলো দেখতে দেখতে কী মনে হতে রুদ্রকে ডাকল, 'দেখ, ওপরের সেকেন্ড তাকে।'

দেখেছি, কিছু তো বুঝছি না। সমস্ত তো চামড়ায় বাঁধাই আর স্পাইনে সোনার জলে লেখা।

ভালো করে দেখো, মধ্যে তিনটে বই। টেবিল ল্যাম্পের মুখটা একটু তুলে এদিকে ঘোরাও তো?

আলোটা পড়লে শর্মিলা বলল, 'দেখ ভালো করে। বইয়ের স্পাইন। ওপরে টাইটেল বাদ দাও। অথরের নাম দেখ। শুধু ইনিশিয়াল আছে। এ.এস। কী হয়?'

'এবেনেজার শ্মেলার', বলে উঠল জেন।

গুড। এবার দেখো সবথেকে নীচে প্রকাশকের নাম। পি.এফ, আর.আর, এস.টি। পিটার ফিট্জপ্যাট্রিক, রবার্ট রেডভিল, আর তৃতীয়জনের নাম ওই বইটা খুললেই বোঝা যাবে।

শাবাস্, শর্মিলা। তুমি তো ডিটেকটিভও হয়ে উঠলে যে।' শর্মিলার পিঠে একটা মৃদু চড় মারল রুদ্র।

ইয়েস। দিস ইজ্ স্মার্ট ওয়ার্ক। কিছু লুকোতে হলে চোখের সামনে লুকোনো উচিৎ।

বইগুলো পেড়ে দেখা গেল যা সন্দেহ হচ্ছিল ঠিক তাই। এগুলো আঙ্ম সলে ডায়রি। খুদে খুদে হাতের লেখায় অজস্র নোট। হিব্রু, ইংরেজি, জার্মান তিনটে ভাষায় লেখা। সেগুলো জেনের ব্যাগে চালান হল।

বাইরে এসে ডেকারকে ফোন করল রুদ্র। 'ওয়েট দেয়ার ফর মি', বলে কেটে দিলেন ডেকার।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দশেক পরেই ডেকার এলেন, সঙ্গে হামবুর্গ পুলিশের একজন সিনিয়ার অফিসার। উনি বললেন, 'আপনারা যখন ডেকারের বন্ধু, এখন আর আপনাদের বিরক্ত করব না। কাল পুলিশ স্টেশনে এসে স্টেটমেন্ট দিয়ে সই করে দেবেন।'

মাথা নাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল ওরা। ডেকার রুদ্রকে ডেকে বললেন 'কাজ হয়েছে?'

'কিছু হয়েছে। কাল বলব।' রুদ্র বেরিয়ে গেল।

পরের দিন ব্রেকফাস্টের সময়েই ডেকার হাজির। ব্রেকফাস্ট একটু লেটেই হচ্ছে। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা। জেন আর শর্মিলা দুজনেরই চোখ লাল। সারা রাত জেগে ফাইল আর নোট ঘেঁটেছে। রুদ্র অবশ্য একেবারেই ফ্রেশ। প্রবলেম এখন এক্সপার্টদের হাতে। ওর কিছু করবার নেই।

কফির পেয়ালা হাতে ডেকার গতরাতের বিশদ জানতে চাইলেন। রুদ্রর কথা শেষ হতে যোগ করলেন, 'তাহলে তো এটা আমার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে—একজন ফ্রান্সে, অন্যজন সান্টো ডোমিঙ্গোতে। তবে শ্মেলার জার্মান ছিল বলেই আমার দায়িত্ব এখনও আছে। ফাইলের দ্বিতীয় কপিটা ব্যাংক থেকে বার করতে হবে। এটা তো একটা টাইম বোম মনে হচ্ছে। কিন্তু—রুদ্র, তোমাদের কেসের সঙ্গে এর সম্পর্ক তো পরিষ্কার হচ্ছে না?'

উত্তর দিল শর্মিলা, 'রেডভিল পরিবারের দৌলতের সূত্রপাত ইন্ডিয়া থেকেই। ফাইল বলছে একথা। আর কিছু বলছে না। নোটে হয়ত থাকতে পারে। আমি যা পেয়েছি সান্টাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সান্টা আমাদের কম্পিউটার জিনিয়াস। ও আর ওর সুপার কম্পিউটার যদি কিছু বার করতে পারে।'

মাথা নাড়লেন ডেকার, 'যে আততায়ী এসেছিল তার ড্রাইভিং লাইসেন্স হানস্ গুজমানের নামে। ভুয়ো। ওর ডি এন এ আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবার দেখা হবে। যদি আমাদের ডেটা বেসে কিছু থাকে। ইন্টারপোলেও যাবে। তবে সময় সাপেক্ষ। আমি এবার উঠব। তোমরা কি এখন থাকবে?'

নাঃ। এদের কাজ তো হয়েই গেছে, এরা আজ ফিরে যাবে। আমি দিন দুয়েক পরে যাব। ফ্রান্সে কাজ আছে।

ভুরু একটু তুললেন ডেকার। পুরো কথা যে রুদ্র বলবে না, সেটা তো জানাই আছে। 'ওকে। অল্ দ্য বেস্ট।'

ডেকার যাবার পর শর্মিলা বলল, 'তুমি থাকছ কেন?'

কানাড আজ হামবুর্গ এসে পৌঁছবে। ব্যাপারটা একটু দেখতে হচ্ছে।

এয়ারলাইন্সে ফোন করে ব্যবস্থা করা গেল। সব ফ্লাইটই প্রায় ফুল। শর্মিলার ব্যবস্থা হল জ্রঞ্জ ৪০০, হামবুর্গ থেকে ছাড়বে সকাল এগারোটা দশে। সারাদিন ওয়ারশতে বসে থাকতে হবে। সন্ধ্যা ছ'টা পঁচিশে ১০৭১, দিল্লি পৌঁছবে ভোর সাড়ে চারটে। শর্মিলা একটু খুশিই হল। সারাদিন ওয়ারস শহরটা ঘুরতে পারবে। জেনের অবশ্য কোনো অসুবিধা নেই। সারাদিনে অনেক ফ্লাইট। দুজনেই দৌড়ল। একসঙ্গেই বেরোবে।

রুদ্র আর একটা কফি খেল বসে বসে। কানাডের ফ্লাইট পৌঁছবে দুপুর সোয়া দুটোয়। স্ট্রাটেজি প্ল্যান করতে হবে। মনটা একটু বিক্ষিপ্ত। সুস্মিতা আর বিজয় কী করছে কে জানে। টেবিল থেকে উঠে বেরোতে যাচ্ছে, একজন ওয়েটার এসে জিজ্ঞেস করল, 'গুটেন মর্গেন। হের সেন... ইয়া?' রুদ্র মাথা নাড়লে বলল, 'ফর ইউ, স্যার।' একটা খাম বাড়িয়ে দিল। একটু অবাক হয়েই খামটা হাতে নিল রুদ্র। এখানে

আবার কে... খামটা খুলল।

ভিতরে একটা নোটপ্যাড থেকে ছেঁড়া কাগজ। তাতে মেয়েলি হাতে লেখা, 'আই ওয়াজ হের্ ডক্টর শ্মেলারস সেক্রেটারি। শকড্ বাই হোয়াট হ্যাপেনড্ ইয়েস্টার ডে। আই হ্যাভ থিংস টু টেল ইউ। মীট মি অ্যাট দ্য নর্থ উইন্ড ক্যাফে নেয়ার দ্য হামবুর্গ নর্থ রেলওয়ে স্টেশন অ্যাট টেন। আই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ্ ইউ ডোন্ট কাম।'

সইটাও মেয়েলি 'এলসা শেলেনর্বাগার।'

কাগজটা পকেটে পুরল রুদ্র। ঘড়ি দেখল। সোয়া ন'টা। অনেক সময় আছে। হোটেল থেকে হেঁটে গেলেও মিনিট পনেরোর বেশি লাগার কথা নয়। দু'কিলোমিটারের বেশি নয়। সুন্দর রাস্তা। বিনেন-অলস্টারের পাশ দিয়ে গিয়ে। ক্যাফেটা ঠিক কোথায়, গুগল্ ম্যাপে দেখে নিলেই হবে।

ওপরে গিয়ে দেখে মেয়েদের প্যাকিং হয়ে গেছে। ঘর লক্ করে বেরতেই যাচ্ছিল। নীচে এসে ওদের বিল দিয়ে ট্যাক্সিতে বসিয়ে দিল রুদ্র। সাড়ে ন'টা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে বিনেন-অলস্টারের পাশের রাস্তা দিয়ে স্টেশনের দিকে হেঁটে ক্যাফেতে পৌঁছল যখন, তখন বাজে দশটা বাজতে পাঁচ। ভিতরে ঢুকতেই কোণা থেকে এক মহিলা হাত নাড়লেন। রুদ্র এগিয়ে গেল।

গুড্ মর্নিং।' পরিষ্কার ইংরেজি।

অ্যান্ড গুড্ মর্নিং টু ইউ।' ওভারকোটটা খুলতে খুলতেই বলল রুদ্র।

'মে আই?' মহিলা মাথা নাড়তে ওর সামনের চেয়ারে বসে পড়ল।

ব্যস্ত ক্যাফে। তারপর এটা অফিস টাইম। পনেরো মিনিট পরেই অবশ্য কেউ থাকবে না। মহিলার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ডাকসাইটে সুন্দরী না হলেও, অ্যাট্রাক্টিভ চেহারা। সোনালি চুল। চোখ দুটো একটু ফুলে আছে। বোধহয় কেঁদেছেন, 'আই হ্যাভ অর্ডারড্ আ পট্ অফ্ কফি অ্যান্ড আর স্ন্যাপস ফর মি। ইউ ড্রিংক স্ন্যাপস্? উই জার্মানস্ ক্যান ড্রিংক স্ন্যাপস্ এনি টাইম।

মাথা নাড়ল রুদ্র। ওয়েট্রেস এক পট কফি আর দুটো কাপ নিয়ে এসেছে এতক্ষণে। মহিলা আর একটা স্ন্যাপ্স অর্ডার করলেন।

আমার নাম আপনি জানলেন কি করে?

নাম আমি জানতাম। ডক্টর শ্মেলারের কাছে মেসেজ এসেছিল, আপনি আর আরও দুজন আসবেন। তা আপনার সাথীরা কোথায়?

ওদের কাজ হয়ে গেছে। ওরা আজ সকালেই ফিরে গেছে।

আপনি পুরোটা বললেন না, আপনি যখন কাল বিকালে ফোন করেছিলেন, আমি ওখানেই ছিলাম। উনিই বললেন আপনি ফেয়ারমন্ট হোটেলে উঠেছেন।

এলসা কাপে কফি ঢাললেন। স্ন্যাপ্সের গ্লাসটা তুলে বললেন 'হিয়ারস্ টু বেটার টাইমস্।'

প্রোস্ট্।

গ্লাস নামিয়ে কফিতে ক্রিম মেশাতে মেশাতে রুদ্র বলল, 'এবার বলুন, কেন ডেকেছেন।'

শ্মেলার হয়ত আপনাদের সম্পূর্ণ কথাটা বলেননি, বলবার সময় পাননি। সেটা বলার জন্য।

আপনার কথা শোনার আগে একটা জিনিস আরো জানতে চাই, অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন।

বলুন।

আপনি কি ইহুদী?

'হ্যাঁ।' হাসলেন এলসা। রুদ্রও মুচকি হাসল। সেয়ানে সেয়ানে।

শ্মেলারও ইহুদি ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। দুয়ে দুয়ে চার।

একটু নড়ে চড়ে বসল রুদ্র।

এবার বলুন।

রবার্ট রেড্ভিল এবং পিটার ফিট্জপ্যাট্রিক দুজনেই গভীর জলের মাছ। দুজনেরই প্রথম দিকের রোজগার অস্ত্রপাচার থেকে। ব্যাকগ্রাউন্ডে টাকা তো ছিলই, সেটা কয়েকশোগুণ বাড়িয়েছে রাশিয়ান মাফিয়ার থ্রু দিয়ে, সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে পড়ার পর। এছাড়া আফ্রিকায় ইল্‌লিগাল মাইনিং, কী করছে না ওরা। পৃথিবীকে তোয়াক্কা করে না।

এরা কি দুজনে কোলাবোরেটর?

প্রত্যক্ষ ভাবে নয়, তবে পরোক্ষে হতেও পারে।

আপনি আর ডক্টর শ্মেলার যে কারণে এদের খোঁজ নিচ্ছিলেন, আমার উদ্দেশ্য কিন্তু আলাদা।

আপনার উদ্দেশ্য জানি না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারি।

সেটা কি রকম?

দেখুন, এরা জন্মসূত্রে জার্মান না হতে পারে, কিন্তু নাৎসিবাদ এদের রক্তে। দেশে দেশে গণ্ডগোল লাগিয়ে সেখানে ডিকটেটরশিপ বসাতে এরা বদ্ধ পরিকর। অবশ্যই সেসব একনায়কত্ব চলবে ফ্যাসিবাদের আদর্শে।

বদ্ধ উন্মাদ।

বলতে পারেন, কিন্তু নিজেদের উন্মাদ স্বপ্নকে সাকার করতে যে টাকা লাগে তার থাকে বেশিই ওদের আছে। দেয়ার ইজ্ মেথড্ ইন্ দেয়ার ম্যাডনেস।

আল্-কায়দা ইত্যাদির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ?

মনে হয় না। মনে রাখবেন, যারা নাৎসি নয়, তারা এদের কাছে মানুষ নামের অযোগ্য।

তাহলে তো নিও-নাৎসিদের সঙ্গে যোগ থাকবেই।

তারাই তো এদের 'ফুট সোলজার' সাপ্লাই দেয়।

এরা কোনো দেশে কিছু করে উঠতে পেরেছে কি?

অন্ততঃ দুটো দেশের কথা তো আমি জানি।

হুঁ। আর কিছু বলবেন?

এখুনি তো নয়। মনে পড়লে বলব।

শিওর। থ্যাংক্স। আমার ফোন নাম্বারটা রাখুন।

বিল দিয়ে একসঙ্গেই বেরোল দুজনে। বাইরে সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া

বইছে। ক্যাফেটা ভালো হলেও লোকের ভিড়ের জন্য একটু চাপা লাগছিল।

‘কোথায় যাবে?’ এলসা জিজ্ঞাসা করল।

আমাকে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে হবে দুটো নাগাদ। হাতে এখনও ঘন্টা দেড়েক সময়। হোটেলেই যাই।

ঠিক আছে। আমিও ওই দিকে যাব। চল হাঁটা যাক।

রাস্তাটা খুব ব্যস্ত নয়। রাস্তার পর বেশ অনেকটা জায়গায় ঘাস আর গাছ, তারপর বিনেনঅলস্টারের জল। শ’দুয়েক মিটার হেঁটেছে, হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা মোটরবাইক একটু সামনে এগিয়ে ব্রেক কষল। মোটর সাইকেলে দু’জন আরোহী, দু’জনেই কালো পোশাক পরা। মাথার হেলমেটও কালো। পিলিয়ন রাইডার (পিছনে বসা লোকটি) মোটর সাইকেল স্লো হবার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ঘুরে দুটো ফায়ার করল। একটা গুলি লাগল এলেনার বুকে, আর অন্যটা রুদ্রর পায়ের কাছে। মোটরবাইক নিমেষে হাওয়া। রুদ্র নিজের পিস্তল বার করার সময়ই পেল না। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। এলসা পড়ে গেছে। রুদ্র নীচু হয়ে গলার কাছে পালস্ দেখল। সাড় নেই। উঠে দাঁড়াল। চোয়ালটা শক্ত হয়ে গেছে। মাথায় আগুন জ্বলছে। মোবাইল বার করে ডেকারকে ফোন করল। পুলিশ এসে গেল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। রুদ্রকে থাকতেই হল। মিনিট দশেক পরে ডেকার নিজেই হাজির।

হু ইজ্ শী?

ডক্টর শ্মেলার’স সেক্রেটারি। এলসা শেলেনর্বাগার। আমাকে সাহায্য করছিল। পুওর উওম্যান।

লেট আস্ গো টু আ ক্যাফে। এখানে আমাদের কিছু করার নেই।

একটু আগেই রাস্তার ধারে একটা ক্যাফে। বাইরে চেয়ার টেবিল পাতা।

ডেকার বললেন, ‘বলো এবার।’

সবই বলল রুদ্র। আজ এয়ারপোর্ট কেন যাবে সেটাও বলল। ডেকার ভুরু কুঁচকে চিন্তা করলেন দু’মিনিট।

তোমার এবার মোবিলিটি দরকার হবে। ওরা তোমাকে দেখেছে, চিনেওছে। দ্বিতীয় গুলিটা তোমার লাগেনি, ভাগ্য ভালো। রাস্তা দিয়ে হাঁটা নিরাপদ নয়। তবে তুমি নিজের নামে গাড়ি ভাড়া করতে যেও না। আজকাল যে কেউ ট্রেস করতে পারে। আমি ব্যবস্থা করে দেব। আমার লোক হোটেলের পার্কিং-এ গাড়ি রেখে তোমার ঘরে গিয়ে চাবি দিয়ে যাবে আজ বেলা চারটে নাগাদ। ততক্ষণ ট্যাক্সি ভাড়া করে চালাও।

ঠিকআছে তাই করব। এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি নেওয়াই ভালো। কানাড গাড়ি বুক করেছে আগেই। সুতরাং ফলো করা শক্ত হবে না। যেখানে গাড়ি নেবে তার কাছাকাছি ট্যাক্সিতে থাকব আমি। আর তাছাড়া কানাড তো আমাকে চেনে না।

ওকে। আমার এটা ট্যাক্সি থাকবে ওখানে। নম্বর দিয়ে দেব। শোফারকে শুধু বলবে ‘টাইগার’।

থ্যাংক ইউ।

ওয়েলকাম। তবে এটার আমার কর্তব্য। আমার চোখের সামনে দু’দুটো খুন হয়ে গেল। যাক্, তবে এই নিও-নাৎসি দলগুলোকে এবার টাইট দিতে হচ্ছে।

উঠে পড়লেন ডেকার। রুদ্র গেল নিজের হোটেলের দিকে।

৫

বিজয় আর সুস্মিতা দুবাই পৌঁছে আব্দুল্লাহকে কন্ট্যাক্ট করেছে। আব্দুল্লাহ্‌র অফিসেই কথা হয়েছে।

শেখ আবু বক্র অল-ইসফাহানি। ফোন ট্যাপ হয়েছে। ফলো করা হচ্ছে। ব্রায়ান্ট আর রহিমেরও ফোন ট্যাপ হচ্ছে। আজ পর্যন্ত খবর, আগামীকাল আবু-বক্র ফ্রান্স যাচ্ছে। টিকিট কেটেছে স্ট্রাসবুর্গ পর্যন্ত। কেন যাচ্ছে জানি না। ও একটা রিলে নম্বরে ফোন করে, সেটা আবার একটা ভি পি এন এক্সচেঞ্জে গিয়ে হারিয়ে যায়। প্রোটোকল এখনো ভাঙা যায়নি, তবে চেষ্টা চলছে। তোমাদের কম্পিউটার এক্সপার্টের সাহায্য নিতে হতে পারে। সে তো শুনেছি একটা জিনিয়াস।

নিশ্চয়ই। এনি টাইম। ব্রায়ান্ট আর রহিমের কী খবর?

এটা জানা গেছে যে রহিমের সম্পর্ক আছে আইসিসের সঙ্গে। তুমি তো জানো ওদের সঙ্গে আল্ কায়দার সম্পর্ক অহি-নকুলের। কাজেই এ খবরটা জানতে পারলে আবু বকর খুশি হবে না। তবে সেটা সময় মতো দেওয়া যাবে।

এদের দুজনের ছবি দিলে ভালো হয়, সুস্মিতা বলল।

‘নিশ্চয়। তোমাদের জন্য কপি তৈরি আছে’, ড্রয়ার থেকে গোটা চারেক ফটো বার করল আবদুল্লাহ্, ‘ছবি তুলে নেবে, না হার্ড কপি নিয়ে যাবে?’

‘দুটোই’, উত্তর দিল বিজয়।

আব্দুল্লাহ্‌র কাছ থেকে দুটো গ্লক পিস্তল ধার করা গেল। শর্ত এই, যে দুবাই ছাড়ার সময় ফেরৎ দেবে। এয়ারপোর্ট পুলিশকে দিলেও চলবে।

বাইরে এসে বিজয় বলল, ‘দ্যাখো সুস্মিতা, আমার মনে হয় আমাদের হয়তো ফ্রান্সে যেতে হতে পারে। তবে আগে বসের সঙ্গে কথা বলা দরকার।’

হোটেলে পৌঁছে নিজের ঘরে গিয়ে ব্রিগেডিয়ারকে ফোন লাগল বিজয়। সুস্মিতা পাশেই ছিল, স্পিকারটা অন্ করে দিল বিজয়। স্যাটেলাইট ফোন। ট্যাপিং-এর চিন্তা নেই। খবর দেওয়া-নেওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার বললেন, ‘এবার তোমাদের প্ল্যান কী?’

সেটার জন্যই আপনাকে ফোন করা স্যার। যদি রেডভিল্ স্ট্রাসবুর্গের আশেপাশে কোথাও থাকে তাহলে আবু বক্রের স্ট্রাসবুর্গে যাওয়ার একটা অর্থ হয়। ওদিকে কানাড যদি হামবুর্গ থেকে স্ট্রাসবুর্গ যায় তাহলে রুদ্র ওদের ফলো করবে। তবে আমাদের হাতে এখনও প্রমাণ নেই। অ্যাকশন নেবার সময় এসেছে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে রুদ্র যদি রেডভিলের আস্তানার খোঁজ লাগাতে পারে সেটা আমাদের পরে কাজে লাগবে।

ইউ আর রাইট। আমার মনে হয় তোমরাও ফিরে আসতে পার। অবশ্য যদি ব্রায়ান্ট বা রহিমকে কায়দা করতে পার, সেটা আমাদের পক্ষে

বোনাস তো হবেই।

রজার স্যার। আমরা দেখছি।

ফোন বন্ধ করে সুস্মিতার দিকে তাকাল বিজয়, 'এগ্রিড? কোই শক্?'

মাথা নাড়ল সুস্মিতা। হাসল।

ঠিক হ্যায়। দেন টু ওয়ার্ক।

ফোন লাগাল বিজয়। মোখতার বিজয়ের পুরনো কন্ট্যাক্ট। এর আগেও কয়েকবার বিজয়কে সাহায্য করেছে। লোকটা বেদুইন। উপকার ভোলে না, আর শত্রুকে ক্ষমাও করে না।

সালাম, মোখতার।

সালাম, রইস।

'সব ভালো তো?' মোখতার পেশায় স্মাগলার। ওদের কাছে এটা কোনো নীচু কাজ নয়। সব ভালো মানে কোনো স্মাগলিং ক্যারাভান ধরা পড়েনি।

সব ভালো। আল্লার রহমত। বলুন কী করতে হবে।

ফোনে বলা যাবে না। হোটেলে আসতে পারবে?

আপনি যে হোটেলে থাকেন সেখানে আমাকে ঢুকতে দেবে না। আমি আপনার জন্য একটা ডেজার্ট সাফারির জিপ পাঠাব বেলা চারটে নাগাদ। আপনি তৈরি থাকবেন। জিপ আমাকে পরে তুলে নেবে। ডেজার্টে গিয়েই কথা হবে।

ঠিক আছে। খুদা হাফিজ্।

খুদা হাফিজ।

ঘড়ি দেখল বিজয়। বেলা একটা বাজে। লাঞ্চ খাবার সময় আছে। বার-এ গিয়ে একটা করে বিয়ার খাওয়া হল। এটা ফাইভ-স্টার হোটেল, তার উপর ওরা বিদেশি। কোনো অসুবিধা নেই।

দুবাই থেকে তিরিশ কিলোমিটার শারজাহ্‌র দিকে গিয়ে রাস্তা থেকে নেমে পড়ল জিপ। দু'কিলোমিটার মতো গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার। ওদের গাড়িতে বসিয়ে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে সিগারেট ধরাল।

বিজয় আর সুস্মিতা পাশাপাশি, আর মোখতার সামনে। মোখতার ওদের দিকে ঘুরে বলল, 'বলুন এবার।'

'আবু বকর্ অল ইসফাহানি, ব্রায়ান্ট, আর রহিম। এই তিনটে লোক। আমাদের দুশমন। দুবাইয়েরও দুশমন। এদের খোঁজ-খবর ইজাজ্ আব্দুল্লাহই লাগিয়েছে।

তো আবদুল্লাহ এর মধ্যে আছে। তাহলে আমি কী করব? সব কিছুর কল-কাঠি তো ওরই হাতে।

না। ভিতরের খবর ও জানে না। তোমাকেই করতে হবে আসল কাজটা।

কী?

রহিম যে আইসিসের সঙ্গে আতাঁত করেছে সে খবরটা আল-কায়দার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আবদুল্লাহ এ ব্যাপারে ঢিল দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেই।

ঠিক কীভাবে দেব?

বলো আল কায়দার জন্য বরাদ্দ টাকা আইসিসের কাছে চলে যাচ্ছে। এটা আবু বক্‌রের নজরের বাইরে হচ্ছে বলে তোমার ধারণা। কেননা আবু বক্‌র আল কায়দার পুরনো লোক, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

তারপর?

আমরা রহিমকে সরাব। নাম হবে আল কায়দার। সেটা আবু বক্‌র ভালো চোখে দেখবে না। রহিম ওর বিশ্বাসী লোক। সেটাই আমাদের লাভ। আবু বক্‌রের সন্দেহ কতদূর গড়ায়, সেটা দেখতে হবে।

'বাঃ। আপনার সঙ্গে কাজ করার সুবিধা এই যে আপনি বেদুইনদের মতো ভাবেন।' নিজের পায়ে একটা চড় মারল মোখতার।

আর ব্রায়ান্ট? তার কী হবে?

সোজাসুজি আবু বক্‌রকে খবর পৌঁছতে হবে। ব্রায়ান্ট টাকা সরাচ্ছিল, এটা জানতে পেরে রহিম ব্রায়ান্টকে ভয় দেখিয়েছিল, ব্রায়ান্ট আইসিসের কথাটা আল কায়দার কাছে পৌংছে দিয়েছে।

আরো ভালো। বেহতরিন।

'আর শোন, আবু বক্‌র ফ্রান্স যাচ্ছে। অন্তত চার দিন নিশ্চয়ই। তার মধ্যে কাজগুলো সারতে হবে। যদি রহিমকে তুমি সরাও, তাহলে আমি আজই ফিরে যাব। নাহলে আমাকে থাকতে হবে।

ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমি সামলে নেব। আর খরচা যা হবে...

হাত তুলল বিজয়, 'আজ পর্যন্ত এই নিয়ে আমাদের কথা বলতে হয়েছে কি?'

মাথা নাড়ল মোখতার, 'না, হয়নি। মাফী।'

বিজয়ও মাথা নাড়ল, 'আর শেষ কথা। ব্রায়ান্টের খবর যেন শেখ রহিম গায়েব হবার পরই পায়।' হাসল মোখতার, 'সোটা বলার

দরকার ছিল না।’

হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে আটটা বেজে গেল। আগামীকাল সকালে দিল্লির ফ্লাইট।

৬

রুদ্র গাড়ি পেয়েছে। কোথাও কোনো পুলিশি চিহ্ন নেই। শুধু ড্যাশবোর্ডে এটা কাগজ লাগানো আছে যাতে দরকারি ফোন, নম্বর দেওয়া, আর একটা রেডিও টেলিফোন। ড্যাশবোর্ডের তলায় একটা বেরেটা বুলপাপ ট্রঞ্চ২৭৭ৃ সঙ্গে একটা কাগজ, ডেকারের সই করা। তাতে লেখা, ‘পারলে সব কিছু ফেরৎ দিও।’ গাড়িটার নম্বর নিশ্চয় সার্কুলেট করা হয়েছে। এয়ারপোর্টে ভি.আই.পি পার্কিং-এ যখন দাঁড়াল, এয়ারপোর্ট পুলিশ দেখেও দেখল না। রুদ্রর পরনে এখন একটা ক্যামেল কালারের পোলো সোয়েটার, কালো স্যুট, আর চোখে এভিয়েটর সানগ্লাস। ইচ্ছা করেই এইসব চড়িয়েছে—কোথায় কখন ঢুকে পড়তে হবে কে জানে—তৈরি থাকাই ভালো।

কানাডকে দেখল পার্কিং লট্-এএর দিকে এগিয়ে যেতে। সঙ্গে একটা লোক, হাতে প্ল্যাকার্ড। এ নিশ্চয়ই গাড়ি ডেলিভারি দিতে এসেছে। কানাড একটা ছোটো স্যুটকেস টানতে টানতে চলেছে। চলতে চলতেই কানাড মোবাইল ফোন বার করে কথা বলছিল। রুদ্র নিজের গাড়ি স্টার্ট করে পার্কিং লটের এক্সিটের একটু সামনে একটা লে-বাই দেখে গাড়ি সেখানে দাঁড় করাল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার দরকার হল না। কানাড বেরল একটা সাদা মার্সিডিস সেডান নিয়ে। গাড়ির নম্বরটা নোট করল রুদ্র। মোবাইল স্পিড ডায়াল করে ডেকারের অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিল। এরপর বিশেষ কিছুই হল না হামবুর্গ শহর অবধি দশ কিলোমিটার রাস্তা পেরোতে। শুধু শহরের কাছাকাছি যখন, পিছন থেকে একটা বড়ো কালো ভ্যান পাশ দিয়ে এসে রুদ্রর আগে সামনে ঢুকে পড়ল। রুদ্র যখন পাশ কাটিয়ে বেরোতে পারল, সাদা মার্সিডিজ হাওয়া হয়ে গেছে। ফোনে খবরটা ডেকারের অ্যাসিস্টেন্টকে জানাতে সে মিনিট তিনেক অপেক্ষা করতে বলল। ঠিক চার মিনিটের মাথায় ফোন করে জানাল সাদা মার্সিডিজ হোটেল অলিম্পিয়াতে গেছে। কী করে যেতে হবে তাও বলে দিল। অবশ্য ততক্ষণে রুদ্রর গুগ্‌ল ম্যাপ-ও লাগানো হয়ে গেছে। হোটেলটা হামবুর্গ সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে। মনে মনে হামবুর্গ পুলিশের কন্ট্রোল রুমের তারিফ করল রুদ্র। ওদের সিসিটিভি নেটওয়ার্ক থেকে কম্পিউটার সার্চ করে মার্সিডিজ খুঁজতে ওই তিন-চার মিনিট সময় লেগেছে।

এবার হোটেলের সামনেই পার্ক করল। রিসেপশনের ক্লার্কর্কে একপাশে ডেকে ডেকারের দেওয়া একটা কার্ড দেখাতেই জানা গেল কানাড ১৪০৫ নং রুমে আছে। এক বোতল ওয়াইন অর্ডার দিয়েছে আর ভোর পাঁচটায় ওয়েক-আপ কল বুক করেছে। এটা অবশ্য ঘরে টেলিফোনেই করা যেত, কিন্তু বোধহয় সাবধানের মার নেই ভেবে এই কাজটা করেছে। রুদ্র নোট করল, কানাড পুরোপুরি সাবধানী নয়। নইলে নিজের প্রোগ্রামের কোনো অংশই কাউকে জানতে দিত না। যাক্, এখন দেখতে হবে লোকটা আজ বাকি সময়টা কী করে। রুদ্র লাউঞ্জে গিয়ে বসল। একজন ওয়েটার ঘোরাঘুরি করছে দেখে তাকে ডেকে একটা বিয়ারের অর্ডার দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে কানাড বাইরে এল। রুদ্র একটু পিছনে। কানাড এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে না। কি একটা ভাবছে। পার্কিং-এর দিকে না গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে এগিয়ে গেল। এখানে চতুর্দিকে ক্যাফে আর রেস্তোরাঁ। কানাড একবার মাথা তুলে সাইনবোর্ডগুলো দেখল, তারপর একটা ক্যাফের সামনে রাখা টেবিলগুলোর একটা অধিকার করল। রুদ্র তিন চারটে টেবিল ছেড়ে বসল। দুটো লোক এল কিছুক্ষণ পরে। কানাড নীচু গলায় তাদের সঙ্গে কথা বলল। রুদ্র নিজের মোবাইল দেখার ভঙ্গি করে মাথা নীচু করল। লোকগুলোর ছবি তুলল। পাঠিয়ে দিল ডেকারকে। সন্ধ্যা ছ’টা যখন বাজে, লোকদুটো উঠল, কানাডও। রুদ্রর বিল দেওয়া ছিল, সেও উঠল। ওঠার আগে একটা লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল রুদ্রর। লোকটা তার সঙ্গীকে কিছু একটা বলল, বোধহয় কানাডকে-ও বলল, কানাড তাকাল রুদ্রর দিকে, কিন্তু রুদ্র তখন ওদের দিকে পিছন ফিরে উল্টো দিকে হাঁটছে। তবে বেশি দূর গেল না। একটু অল্প আলো দেখে আবার ঘুরল। লোক দুটো নেই, কানাড আবার হোটেলের দিকে যাচ্ছে। রুদ্র-ও যাবে, কে পিছনদিক থেকে ওর শিরদাঁড়ায় একটা কী ঠেকাল। নট্ সো ফাস্ট, মিস্টার। দিস ইজ্ আ পিস্টল। মেক নো ফলস্ মুভস্। গেট্ টু দ্যাট সাইড।

দুটো ক্যাফের মাঝে একটা সরু মতো রাস্তা। লোকটা সেইদিকে ঠেলল রুদ্রকে। ০লোকটা নিশ্চয় একা নয়। এর স্যাঙাৎ এখানেই কোথাও আছে। হয়তো ওই গলিতে একবার ঢুকে গেলেই ফাঁদ।

এসব ভাবতে ভাবতেই রুদ্র কাঁধের পেশী ঢিলা করল, যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। তারপর হঠাৎ শরীরের ওপরের দিকটা বাঁ দিকে নীচু করে বেঁকে গেল। লোকটাও এই প্যাঁচ আগে দেখেছে, নিজেকে নিজের বাঁ দিকে সরাল, পিস্তলটা তুলল রুদ্র মথায় মারবে বলে। কিন্তু রুদ্র-ও জানে যে লোকটা এই প্যাঁচ জানে। যেটা লোকটা জানে না, রুদ্র তাই করল, পড়ে যেতে যেতে লোকটার ডান পা ধরে হেঁচকা টান। এবার লোকটার পড়ার পালা। রুদ্র ওই দুই সেকেন্ডে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাতে একটা লাথি। পিস্তলটা ছিটকে গেল। রুদ্র কথা বলার পাত্র নয়। পরের লাথিটা লোকটার চিবুকে, আর তৃতীয়টা দু’পায়ের মাঝখানে। লোকটা কাঁকিয়ে উঠল। কয়েকটা দাঁত বোধহয় ভেঙেছে। মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। পিস্তলটা একটু দূরে ছিটকে পড়েছে। রুদ্র সেটাকে লাথি মেরে পাশের নালিতে ফেলে দিল।

এবার স্যাঙাতের পালা। স্যাঙাত এল আধ মিনিট পর। এখন রুদ্রর হাতে পিস্তল। স্যাঙাতের পিছনে গিয়ে পিস্তলের বাঁট দিয়ে ঘাড়ে এক ঘা। তারপর আর একটা। প্রথম লোকটার হাতে এখন একটা ছুরি। উঠে দাঁড়িয়েছে, টলছে। রুদ্রর অভিধানে করুণা বলে কিছু নেই, এসব লোকেদের জন্য। টলতে থাকা লোকটার কনুইতে পিস্তল ঠেকিয়ে একটা গুলি। ওই হাত আর কোনো দিন ব্যবহার করতে পারবে না।

এতক্ষণে লোক দুটোর মুখ দেখল মোবাইলের টর্চ দিয়ে। যারা কানাডের সঙ্গে কথা বলছিল এরা তারা নয়। রুদ্র মোবাইলে ডেকারকে খবরটা জানিয়ে ওখান থেকে সরে পড়ল। পুলিস আসবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই। সঙ্গে মিডিয়াও নিশ্চয়ই থাকবে। যত কম লোকে ওর চেহারা দেখে, ততই ভালো। হোটেলের রিসেপশনে এসে জানা গেল কানাড ফিরেছে। ঘরেই আছে। রুদ্রর একটা সন্দেহ হল। একটু আগে কানাডকে ও অসাবধানী ভাবছিল। এমনও তো হতে পারে যে সে অতি সাবধানী। ওয়েক-আপ কলের জন্য অহেতুক রিসেপশনকে বলে রেখেছে এজন্য যে কেউ যদি ওর খোঁজ করে, তাহলে ভাববে রাতটা ও হোটেলেই থাকবে। সাত-পাঁচ ভেবে রুদ্র ঠিক করল আপাতত লাউঞ্জেই বাসা গাড়বে, আর... ডেকারকে বলল লোক পাঠিয়ে কানাডের গাড়িতে একটা ট্র্যাকার লাগিয়ে দিতে, আর ওর নিজের গাড়ির ডিসপ্লে স্ক্রীনে ফ্রিকোয়েন্সি ফিড করে দিতে। ডেকার বলল আধ ঘণ্টার মধ্যে কাজ হয়ে যাবে।

রুদ্র বসে রইল।

৭

মোখতার পড়েছে একটু মুশকিলে। বিজয়কে কথা তো দিয়েছে, কিন্তু এবার কী করা। আবার কালই বিজয় চলে যাবে, আজ রাতটা শুধু সময় আছে। যাবার আগেই, বিজয়কে কিছু রেজাল্ট দেখাতে পারলে বিশ্বাস—অর্থাৎ টাকার ভিত্তিটা আরো শক্ত হবে। সবথেকে সহজ হল কিডন্যাপ করা। কিন্তু এখন রাত আটটা প্রায় বাজে, এখন তো রহিম বাড়িতেই থাকবে। থাকবে কি?

রহিমের ঠিকানা জোগাড় করতে অসুবিধা হল না। শেখের বাড়িতে ফোন করে বলল যে ও পাকিস্তান থেকে এসেছে, রহিমের জন্য ওর পরিবার জরুরি খবর পাঠিয়েছে। রহিমের ফোন ছিল, কিন্তু হারিয়ে ফেলেছে। যে ফোন তুলেছিল সে চাকর গোছের। গলা ভারী করে বলল, ‘গ্রাম থেকে এসেছ নাকি?’

‘জী। মুলতানে সইদপুর গ্রাম থেকে। কাজের জন্য এসেছি। রহিমের পরিবার আমাদের গ্রামেই থাকে।’ প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল মোখতার।

ঠিক আছে, লিখে নাও। লিখতে জান?

জী পারি। আমি ট্রাক ড্রাইভার।

অতঃপর ঠিকানা দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে মোখতার তার দুই চেলাকে নিয়ে রহিমের বাড়ির সামনে হজির। একটা টোয়োটা হাই-এস করে এসেছে ওরা। গাঢ় সবুজ রঙের। গাড়িটা একটা দূরে দাঁড় করাল। ড্রাইভার বসে রইল, মোখতার আর তার চেলা জাকির এগিয়ে গেল। এটা একটা টাওয়ার। বড়োলোক পাড়া। সিকিউরিটি, সিসি টিভি সবই থাকবে। মোখতার পাগড়ির কাপড় দিয়ে মুখটা ঢাকল, বেদুইন স্টাইলে। জাকির মুখটা খোলাই রাখল—কথাবার্তা ও-ই বলবে, তাছাড়া এখানে ওকে কেউ চেনে না, পুলিশ রেকর্ড নেই। ও থাকে আল-যুজেইরাহ্‌তে।

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের দরজায় সিকিউরিটি আটকাতে রহিমের পরিবারের গপ্পোটা আউড়ে গেল জাকির। গার্ড ওদের দাঁড়াতে বলে ভিতরে গেল, বোধহয় সঙ্গীদের ফ্ল্যাটে ফোন করার জন্য। মিনিট দুয়েক পরে ফিরে এসে বলল, রহিম বাড়ি নেই, ফিরতে রাত হবে। সকালে আসতে বলল।

এবার অপেক্ষা করার পালা। গাড়িটা আরো একটু দূরে নিয়ে গেল। একজন ব্যাগ থেকে ঝলসানো ভেড়া র মাংস আর খেজুর বার করল। ওরা মরুভূমির বাসিন্দা, এতেই ওদের রাতের খাওয়া হয়ে যাবে। মোখতার একটা নাইট-ভিশন গ্লাস বার করল। একজন সবসময় অ্যাপার্টমেন্টের দিকে নজর রাখবে।

এবার মুশকিল হল রহিমকে ধরা যাবে কী করে। চিন্তা করার পর একটা বুদ্ধি বেরল। রহিম যদি নিজেই ড্রাইভ করে তাহলে গ্যারাজে গাড়ি ঢোকাবার আগে ধরা যাবে। আর যদি ড্রাইভার থাকে তাহলে ও নামবে গেটের সামনে, আর ড্রাইভার গাড়ি গ্যারেজ করবে। তাহলে মুশকিল হবে। আজকে আর ধরা যাবে না। অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে। গাড়ি থেকে নেমে মোখতার আর জাকির গ্যারাজের দরজার পাশে, একটু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল। জাকিরের হাতে একটা টেজার (বোতাম টিপলে সাড়ে চার হাজার ভোল্টের শক দেয়, পুলিশরা সাধারণত ব্যবহার করে) আর মোখতারের হাতে একটা অ্যানাসথেটাইজার গান (অজ্ঞান করার ডার্ট ফায়ার করে)। লোকটাকে জ্যান্ত ধরতে হবে।

মোখতারের ভাগ্য ভালো, ঘন্টা দেড়েক পরে রহিম নিজেই এল গাড়ি চালিয়ে। মোখতারের ভাগ্য আরও ভালো এই জন্যে যে, অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িটা খুব নতুন নয়। ফলে, গাড়ি থেকে নেমে রিমোট দিয়ে গ্যারেজের দরজা খুলতে হয়। রহিম তাই করল। যখন গাড়িটা আস্তে আস্তে পার্কিংয়ের দিকে ঘুরছিল, তখনই নাইটগ্লাস দিয়ে দেখা গেছে গাড়িতে আর কেউ নেই। মোখতার নিজের গানটা ফায়ার করল। রহিম পড়ে গেল। ধরাধরি করে পাশে টেনে নিয়ে গেল ওরা। ওদের নিজেদের ড্রাইভার দৌড়ে এল। রহিমের গাড়িতে বসে সেটা ব্যাক করে ইউ টার্ন করে গাড়ি নিয়ে হাওয়া হল। শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে নাম্বার প্লেট খুলে কাউকে বেচে দেবে। যা পাবে, সেটাই ওর আজকের পারিশ্রমিক।

অচেতন রহিমকে তুলে ওরা শহরের বাইরে একটা বেদুইন ক্যাম্পে নিয়ে গেল। গোটা কুড়ি তাঁবু, ছাগল-ভেড়া, আর উঁট। একটা বিশ্রি বোটকা গন্ধ চারিদিকে। রহিমকে বালি চাপা দিল ওরা। শুধু মাথাটা বেরিয়ে রইল। রহিমের জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু গলায় জোর নেই।

আমাকে মারছ কেন? কী করেছি আমি তোমাদের?

‘মারছি কোথায়? মারিনি তো! বালি চাপা দিয়ে রেখেছি এই জন্যে যে বাইরে এখন খুব ঠান্ডা, আমাদের একস্ট্রা কম্বলও নেই, বালির মধ্যে তোমার শরীর গরম থাকবে। কত আরাম না?’ মোখতার নিজের মোবাইল বার করতে করতে বলল।

কিন্তু আমি তো তোমাদের ক্ষতি করিনি। তোমাদের চিনিও না।

আমাদের করোনি, কিন্তু আমাদের বন্ধুদের করেছ। তারা খুব দুঃখ পেয়েছে।

তারা কারা?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মোখতার, 'সেটা যদি জানতে তাহলে তো তোমার দুঃখ অনেকদিন আগেই মিটে যেত। যাক্, জল খাবে?' জাকিরের দিকে ইশারা করল মোখতার। জাকির রহিমের মুখে একটু জল ঢেলে দিল একটা বোতল থেকে।

মোখতার একটু দূরে গিয়ে বিজয়কে ফোন করল।

রইস, রহিম আমাদের কব্জায়। এখন কী করা? শেষ করে দেব, না আপনি ওর সঙ্গে কথা বলবেন?

ঘড়ি দেখল বিজয়। রাত একটা। ওদের ফ্লাইট সকাল এগারোটায়। অনেক সময় আছে।

তোমাকে কোথায় মীট করব?

এক ঘন্টা পরে, গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলের উল্টোদিকে যে মল্‌টা আছে সেখানে গিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দেবেন। আমি তুলে নেব।

দুরস্ত্। কিন্তু সকালে আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কোরো। আমি চেক আউট করছি।

দুরস্ত্।

ফোন করে সুস্মিতাকে তুলল, 'গেট রেডি টু চেক্‌-আউট নাও।'

'কী হয়েছে?' ঘুমে জড়ানো গলা সুস্মিতার।

পরে বলব। টেন মিনট্‌স। মীট মি অ্যাট দ্য রিসেপশন।

সাত মিনিটের মাথায় বিজয় তৈরি। নেভিতে তার বেশি সময় দিত না। ওদের কথাই আছে, শেভ্, শাওয়ার অ্যান্ড শিট্—সেভেন মিনাটস্।

সুস্মিতা নীচে এসে দেখল রুদ্র রিসেপশনের লাইনে। অবশ্য দু-তিন জনই। মিনিট পাঁচেক লাগল। বাইরে এসে ট্যাক্সি পেতে লাগল আরো মিনিট দশেক। এক ঘন্টা পুরো হবার আগেই ওরা মলের সামনে। এত রাত্রে কেউ কোথাও নেই। সুস্মিতা ভাবল এত রাত্রে আবার পুলিশ না ধরে। জিনিস অবশ্য কিছুই নেই—বিজয়ের কাঁধে একটা রুকস্যাক, আর ওর নিজের একটা ছোটো স্ট্রলার। দাঁড়াতে বেশিক্ষণ হল না অবশ্য। মিনিট কয়েক পরেই একটা কালো ল্যান্ড ক্রুইজার এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার মোখতার নিজেই। ভিতর থেকে দরজা খুলে দিল। বিজয় সামনে, সুস্মিতা পিছনে।

'আই থিংক আই ওয়ান্ট টু বি টোল্ড যে কী হচ্ছে।' সুস্মিতার মেজাজ একটু খিঁচিয়েই আছে। সেটা ঘুম থেকে উঠে পড়ার জন্যই হোক বা এতক্ষণ চুপ করে থাকার জন্যই হোক। বিজয় দু-তিন কথায় ব্যাপারটা বোঝাল সুস্মিতাকে। সুস্মিতা বলল, 'কিন্তু গার্ড তো জাকিরকে দেখে ফেলেছে।'

'জাকির কাল সকালেই বেদুইনদের সঙ্গে ওমানের দিকে চলে যাবে। কেউ খুঁজে পাবে না ওকে।' উত্তরটা মোখতারই দিল।

প্রায় আধ ঘন্টা বলার চলার গাড়ি থামল একটা বালিয়াড়ীর পিছনে। মোখতার ডিকি থেকে একটা জেল্লাবা আর পাগড়ি বার করে বিজয়কে দিল। আর সুস্মিতাকে একটা বোরখা। 'পাগড়ির শেষটা দিয়ে মুখটা ঢেকে নিন। আপনার তো দাড়ি নেই।' বলল মোখতার। মাথা নাড়ল বিজয়। একটু দূরে একটা ছোটো আগুন জ্বলছে। কনকনে ঠান্ডা। আগুনের পাশে বসে জাকির হাত সেঁকছে। কয়েক পা দূরে বালির ওপর কালো মতো কী একটা উঁচিয়ে আছে। কাছে গেলে বোঝা যায় ওটা একটা মানুষের মাথা। লোকটা এখনো জ্যান্ত। বিড়বিড় করে নিজের মনে কীসব বলছে। মোখতার ও র কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল। বিজয়ও। সুস্মিতা লোকটার পিছন দিকে, বলো কেমন আছো। সব ভালো তো? শরীর বেশ গরম?'

লোকটা কী বলল বোঝা গেল না। মোখতার বলে চলল, 'রাগ হচ্ছে? হবারই কথা। মাথা গরম হয়ে গেছে তোমার। নইলে এ সময়ে ভয় করে। তা তোমার যখন ভয় হচ্ছে না, শুধু মাথা গরমই হয়েছে, তোমার মাথা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করি? সেই ভালো হবে।' জাকিয়ের দিকে ইশারা করল। জাকির একটা জেরিক্যান ভর্তি জল নিয়ে এসে অর্ধেকটা রহিমের মাথায় ঢেলে দিল। হঠাৎ কনকনে ঠাণ্ডা জলে রহিম বিষম খেল।

যা চাও তা যদি বেশি করে পাও তাহলে ওরকমই হয়। এবার বল, যা জানতে চাইব বলবে?

কি জানতে চাও?

বিজয় ফিসফিস করে মোখতারকে বলল, 'জিজ্ঞেস কর, আল কায়দা ছাড়া আর কাকে ও টাকা দিয়েছে।' রহিম পাকিস্তানি, সুতরাং এর পরের কথাবার্তা উর্দুতেই হল। মোখতারের প্রশ্নের উত্তরে রহিম জোর গলায় বলল, 'কাউকে না।'

বিজয় বলে উঠল, 'জবরদস্ত ঝুট। আমরা জানি তুমি অন্যত্র টাকা দিচ্ছ। সেটা তোমার শেখের কথাতে বোধহয় না।'

না না, শেখের কথাতেই দিয়েছি। অনেক মিলিয়ন ডলার। আল-কায়দা কম পেয়েছে।

কাকে দিয়েছ?

চিনি না।

ক'বার দিয়েছ?

বেশ কয়েকবার।

একই লোককে?

না, দুটো লোক আছে।

তাহলে চেননা বলছ কেন? বল কী রকম দেখতে।

যা বর্ণনা করল, সুস্মিতা নিজের মোবাইলে রেকর্ড করল। বিজয়ও।

আইসিসকে কত টাকা দিয়েছ?

আল্লা কসম্, কোনো টাকা দিইনি।

ঝুঠ্।

মোখতার মিহি গলা করে বলল, 'দ্যাখো, সত্যি বললে এক গুলিতে তোমার দোজখে যাবার পথ পরিষ্কার করে দেব। আর যদি না বল, এমনিই ছেড়ে চলে যাব। দিনের বেলা লাল পিঁপড়ে এসে কুরে কুরে খাবে। জ্যান্ত। তুমি বেঁচে আছ আর লাল পিঁপড়ে তোমার চোখ খাচ্ছে, এটা কি তোমার ভালো লাগবে? অবশ্য ক'দিনই বা বাঁচবে

ওইভাবে। জাকির, রেকর্ডটা কি এই ব্যাপারে?’

জাকির উত্তর দিল, ‘সাড়ে তিন দিন। আমাদেরই করা রেকর্ড। মরতে দিইনি। জল দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। তাও চার দিন হল না।’ দুঃখে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মনে হল জাকিরের।

তাহলেই দ্যাখো, কী অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। এবার বল আইসিসকে কত ডলার দিয়েছ?

কুড়ি মিলিয়ন।

ভালো, ভালো। আর অন্যদের?

দশ, দশ করে তিন বার।

কোথাকার লোক ওরা।

ঠিক জানি না। মনে হয়েছে হিন্দুস্থানি।

একবার পাঁচ মিলিয়ন নিয়েছিল ওভার ইনভয়েসিং করে। ডকুমেন্ট ছিল বম্বের কোম্পানির নামে।

আর?

আর অন্য লোকটার উর্দুর মধ্যে অনেক হিন্দি ছিল।

বাঃ। তুমি তো চালাক লোক দেখছি হে। তা চালাকিটা তো তোমাকে শয়তান শিখিয়েছে, তুমি এবার তার কাছেই যাও।

একবার বিজয়ের দিকে তাকাল মোখতার। বিজয় মাথা হেলাল। দুজনেই উঠে দাঁড়াল। মোখতার পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে রহিমের কপালে গুলি করল। .৪৫ ক্যালিবারের পিস্তল। মাথাটা চৌচির হয়ে গেল। রক্ত আর মগজ ছড়িয়ে পড়ল। সুস্মিতার বোরখাতেও পড়ল। সুস্মিতা একটু শিউরে উঠল। মোখতারের নজর পড়েছিল সুস্মিতার দিকে। বলল, ‘মোহতরমা, ওটা এবার খুলে ফেলুন। আর রইস সাহেব, আপনিও। ওগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।’ বিজয়ও নিজের জেল্লাবা আর পাগড়ি খুলল। সব কাপড়গুলো রহিমের মাথার উপরই ফেলল মোখতার। ওর নির্দেশে জাকির কাঠ আর পেট্রল নিয়ে এসে একটা বনফায়ার বানাল।

ফেরার পথে আবার কালো গাড়িতে ওরা তিনজন। অন্য গাড়িটা নিয়ে জাকির চলে গেছে। ঘড়িতে ভোর চারটে। এয়ারপোর্ট লাগল এক ঘন্টা আরও। চেক-ইনের এখনো ঘন্টা চারেক দেরি। একটা পে-লাউঞ্জে পয়সা দিয়ে ঢুকে ফ্রেশ হওয়া গেল। এই সময়ে অতবড়ো লাউঞ্জে জনা চারেক লোক। এক কোণায় বসে কোডেক্স মোবাইলে ফোন করল ব্রিগেডিয়ারকে।

মর্নিং

এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ থেকে বলছি স্যার। আজকের ঘটনা...।

রেকর্ডেড?

যাক্, একটা প্রমাণ তো পাওয়া গেল। যে দুটো লোকের বর্ণনা পাওয়া গেছে তাদের সনাক্ত করতে পারলেই...।

সে তো বটেই স্যার। তবে শনাক্তকরণের কাজটা অন্য এজেন্সিকে দেবার আগে একবার সান্টাকে দিলে হয় না?

ইয়েস। সার্টেনলি আ পসিবিলিটি। তোমরা এস, আলোচনা করা যাবে।

রুদ্রর কোনো রিপোর্ট, স্যার?

নট্ ইয়েট। তবে ডেকারের থেকে ওর খবর পাচ্ছি। সীমস্ টু বি ওকে। গুড্ ডে স্যার।

ফোন কেটে গেল।

সোফাগুলোর সামনেই একটা বড়ো টিভি স্ক্রিন। নিউজ্। গতকাল ভারতের চার জায়গায় দাঙ্গা হয়েছে। ক্ষেত্রীতে, ম্যাঙ্গালোরে, দ্বারভাঙ্গায়, আর মোরাদাবাদে। কারণ কোথাওই বিশেষ কিছু নেই। মাকড়সার জাল। কিছুটা কাটা গেছে, তবে অনেকটাই আছে। আর মাকড়সা তো আছেই। সুস্মিতা একটা ট্রেতে করে স্যাণ্ডউইচ্ আর কফি নিয়ে এসেছে। ও বসলে বিজয় টিভি-র দিকে আঙুল তুলল।

দিস হ্যাজ টু বি স্টপ্‌ড্।

‘ওয়েল, উই টুক আ স্টেপ টুডে।’ সুস্মিতা বলল।

তা বটে। ওকে, এখনো অনেক দূর যেতে হবে। রুদ্র কি করছে দেখা যাক।

হ্যাঁ। আর শর্মিলার রিপোর্টও তো পাইনি।

দিল্লি গেলেই বোঝা যাবে।

দিল্লিতে যখন ল্যান্ড করল তখন সাড়ে তিনটে।

৮

রুদ্রর সন্দেহ ঠিকই ছিল। রাত বারোটা নাগাদ কানাড রিসেপশনে এসে চেক-আউট করল। রুদ্র কোণায় সোফায় বসে ছিল, একটু অন্ধকারে। একটু ঘুম ঘুম পেলেও প্রায় জোর করেই চোখ খোলা রেখে ছিল। ধীরে সুস্থে বেরোল। কানাডের গাড়ি আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং-এ। ওরটা বাইরে। ইল্‌লিগাল পার্কিং। লোক দেখানোর জন্য পুলিস একটা পার্কিং স্টিকার লাগিয়ে গেছে। কানাডের গাড়ি বেরোতে দেখল। ফলো করল। শহরের বাইরে গিয়ে অটোবান ৭ ধরল। জার্মানিতে হাইওয়েকে অটোবান বলে। এ রাস্তা গেছে সোজা দক্ষিণ দিকে, ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ পর্যন্ত। এই উপপ্রদেশের নাম আলসাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি এর উপর আধিপত্য ছিল জার্মানির। ফ্রান্স আর জার্মানির মধ্যে বিস্তর যুদ্ধ হয়েছে এই জায়গা নিয়ে। এখানকার ওয়াইন তো বিখ্যাত বটেই, পৃথিববীকে এরা দিয়েছে অ্যালসেশিয়ান কুকুর। পুরো উপপ্রদেশটার নাম আলসাস-লোরেইন। হামবুর্গ থেকে স্ট্রাসবুর্গে যেতে লাগবে সাত ঘন্টা। সাতশ’ কিলোমিটার। এইসব টুকরো কথা ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছিল রুদ্র। এ লোকটা যদি স্ট্রাসবুর্গ যায় তাহলে রেডভিলের সঙ্গে সম্পর্কটা পরিষ্কার হবে। অটোবানে পড়ে গাড়ির স্পিড উঠল একশ’ আশি। দূরে কানাডের গাড়ির পিছনের লাল আলো দেখা যাচ্ছে। রুদ্রর গাড়ির স্ক্রিনেও সামনের লাল স্পট্‌টা দেখাচ্ছে। একটু ঝিমুনি আসছে। কথা বলার লোক থাকলে ভালো হত। কুছ পরোয়া নেই। কানাড যদি আট হাজার মাইল প্লেনে করে এসে জেট-ল্যাগের পরোয়া না করে সারারাত গাড়ি চালাতে পারে, তাহলে রুদ্রও পারবে।

রাস্তায় কোনো ট্র্যাফিক নেই। মাঝে মধ্যে দু-একটা বিশালকায় ট্রাক

একেবারে রাইট লেনে অপেক্ষাকৃত আস্তেই চলেছে। মাঝে মধ্যে দু-একটা গ্রাম, একটা শহর। সেখানে গাড়ি স্লো করে পঞ্চাশে নামিয়ে আনতে হচ্ছে। এক সময় অটোবান ৭ ছেড়ে দুটো গাড়িই অটোবান ৫-এ পড়ল। ঘড়ি বলছে রাত তিনটে। একটু কফি পেলে হত। শেষ পর্যন্ত একটা পেট্রোল পাম্পে দাঁড়াল কানাড। রুদ্রও ওই পাম্পে ঢুকল। গাড়ি পার্ক করে ঢুকে গেল ক্যাফেতে। কানাড তখনো বাইরে। তেল ভরছে গাড়িতে। ওর আগে আরও গোটা দুয়েক গাড়ি। যতক্ষণে ওর তেল ভরা হল ততক্ষণে রুদ্র কফি কিনে আবার নিজের গাড়িতে। স্ট্রাসবুর্গে যখন গাড়ি ঢুকছে তখন সকাল সোয়া সাতটা। কিন্তু কানাড স্ট্রাসবুর্গে থামল না। এদিক ওদিক করে যে জায়গাটায় এল, রুদ্র দেখল সেটা স্ট্রাসবুর্গ নর্থ স্টেশন। বুলেভার্ড দ্য স্টেজ থেকে ডানদিকে ঘুরল। তারপর অটোবান ৩৫ ধরে চলল। এ রাস্তাটা দক্ষিণ-পশ্চিমে যায়। প্রায় একঘন্টা চলার পর অটোবান ছেড়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়ে পৌঁছল কোলমার শহরে। এখানেও দাঁড়াল না। চলল উইন্টজার্মহেম-এর দিকে। তবে উইন্টজার্মহেম পৌঁছনোর আগেই একটা বাঁ-হাতি পাহাড়ি রাস্তা ধরল। সরু রাস্তা এঁকে-বেঁকে চলল। রুদ্র এখন আর কানাডের গাড়ি দেখতেই পাচ্ছে না। ভাগ্যিস ট্র্যাকারটা ছিল। কানাডের গাড়ি একসময় মোড় নিল। রুদ্র মোড়টাতে পৌঁছল মিনিট দুয়েক পরে। লাল স্পট ততক্ষণে থেমে গিয়েছে। রুদ্র মোড় থেকে একটু এগিয়ে দাঁড়াল। হেঁটে ফিরে গেল মোড়ে। ওপর দিকে তাকাল। গাছের ফাঁক দিয়ে একটা শ্যাতো (প্রাসাদ) দেখা যাচ্ছে। রুদ্র রাস্তার একপাশের ঝোপ ঝাড় মাড়িয়ে পঞ্চাশ মিটার মতো এগোল। বেশি এগোনো ঠিক হবে না, নিশ্চয় রাস্তার ওপর বা আশেপাশে সি সি টিভি, ইনফ্রারেড সেন্সর সব লাগানো আছে। পকেট থেকে একটা মোনোকিউলার স্পাই-গ্লাস বার করে সেটা দিয়ে শাতোর যতটা দেখা যায়, দেখল। খুব বড়ো বলে মনে হল না। পিছন দিকে একটা পাহাড় খাড়া বলেই মনে হল। অন্য দু-পাশেও তাই। বস্তুত জায়গাটা একটা ছোটো উপত্যকার মতো। পাইন আর অন্যান্য গাছ। এটা)osges পাহাড়ের একটা অংশ। রুদ্র আর সময় নষ্ট করল না। নিজের গাড়িতে ফিরে এল। গাড়ি স্টার্ট করে সোজা চলল। কয়েক কিলোমিটার গিয়ে আবার ইউ-টার্ন করে ফিরে গেল কোলমারে।

শরীর আর দিচ্ছে না। আজ রাতটা বিশ্রাম নেওয়া দরকার। কোলমারে ফিরে গেল রুদ্র। আজ এখানেই থাকবে। লে পিতি ভেনিসের পাশে লে মারেশাল হোটেলে উঠল। ঘড়ি দেখল, এগারোটা দশ। ঘরে গিয়ে স্নান করে সোজা বিছানায়। ঘুম থেকে যখন উঠল, প্রায় সোয়া চারটে বাজে। কফি বানাল, তারপর ফোন করতে বসল। প্রথমে ডেকার। রুদ্র কোলমারে শুনে একটু অবাক হলেন। রুদ্র ওঁকে বলল আগামীকাল দিল্লি ফিরে যাবে। আপাতত এখানে আর কিছু করার নেই। গাড়িটা সম্বন্ধে জানতে চাইলে বললেন স্ট্রাসবুর্গের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ডেপুটি চিফ মঁশিয় জিদকে জমা করে দিতে। পিস্তলটাও। থ্যাংক ইউ বলে ফোন কাটল।

পরের ফোন ব্রিগেডিয়ারকে। ওঁকে বলল পরের দিন দিল্লি রওনা হবে। ব্রিগেডিয়ার বেশি কথা বললেন না, বা বলতে চাইলেন না। মনে হল চিন্তিত। দাঙ্গার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। হোম মিনিস্টার আর পি এম দুজনেই চাপ দিচ্ছেন। ইমিডিয়েট কিছু করা দরকার। শেষ ফোন বিজয়কে। বিজয়ও কিছু ভেঙে বলতে চাইল না। রুদ্র একটু অবাকই হল। তারপর ভাবল নিশ্চয় কোনো কারণ আছে যা সিকিওর ফোনেও বলা যাচ্ছে না, বা বলতে গেলে বেশি বড়ো কাহিনি হয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলা একটু বেরোল, কানালের ধার দিয়ে। কোলমার শহরটা একটু ভুতুড়ে। গায়ে গায়ে ঘেঁষা বাড়ি, সরু সরু গলি। একটু রাত হলে একা ঘুরতে ভয়ই করে। তবে এখন সেরকম নয়। ক্রিস্টমাস মার্কেটের জন্য শহর সাজছে। একমাস ধরে চলে এই মার্কেট এবং পুরো ইউরোপে নাম করা। স্ট্রাসবুর্গের মার্কেট অবশ্য অনেক বড়ো, কিন্তু কোলমারের মার্কেট, যাকে বলে চার্মিং। পরের দিন ভোরবেলা উঠেই রওনা হল স্ট্রাসবুর্গের দিকে। সোয়া ঘন্টা লাগল। সেখান থেকে টিজিভি (হাই স্পিড ট্রেন) ধরে প্যারিস। প্যারিস থেকে দিল্লি।

চতুর্থ চক্র

বুনন

১

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা সুজান সিং পার্কের সেফ হাউসে। ব্রিগেডিয়ার নতুন বাংলো পেয়েছেন, ব্যবস্থা করে আসতে একটু দেরি হচ্ছে। বাকিরা সবাই হাজির। নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা। কাজের কথা হচ্ছে না। ব্রিফিং রিপিট করতে কেউ রাজি নয়। ব্রিগেডিয়ার এলেন আটটায়। সোফায় বসেই অভ্যাস মতো হাত বাড়ালেন। বিজয় তৈরিই ছিল, স্কচের গেলাস ধরিয়ে দিল হাতে। তিন দলের বক্তব্যই শুনলেন। তাকালেন সান্টার দিকে। সান্টা বলল, ‘আমি লাস্ট। তবে একটুকু বলছি, ভি পি এনের প্রোটোকল আমরা ভেঙেছি। কলগুলো যায় ফ্রান্সের কোলমারে। আবার সেখান থেকে রিলে হয়। শর্মিলা যোগ করল, ‘সব মিলিয়ে প্রায় আড়াইশ মিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার হয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকে, একটা প্রাইভেট স্যুইস ব্যাংক থেকে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নাৎসিদের টাকা ব্যাংকে থাকলে সেটা ডিক্লেয়ার করতে হয়, যদি কোনো দেশের সরকার জানতে চায়। ডক্টর শ্লেলার অনেকটাই করেছিলেন, বাকিটুকু করেছে জেন, এস আই এসের নাম ব্যবহার করে। টাকা ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে একটা বারবাডোসের ব্যাংক, একটা নাউরুর ব্যাংক, আর একটা লিখটেনস্টাইনের ব্যাংক থেকে। ওখান থেকে কোথায় গেছে সেটা এখন আমরা দেখছি।’

‘তাহলে সব মিলিয়ে চেহারাটা দাঁড়াচ্ছে যে একদিকে কানাড আর তার সহকারী শহীদ সিং আর রাজা। অন্যদিকে শেখ আবু বক্‌র আর তার সহকারী। মাথার ওপর রেডভিল তো নিশ্চয়ই, ফিট্‌জপপ্যাট্রিকও থাকতে পারে।’

‘তাই তো মনে হচ্ছে’, রুদ্র বলল।

‘কিন্তু আমার মনে হয় ছবিটা এখনো কম্‌প্লিট নয়। এতবড়ো দেশে

এতগুলো বিচ্ছিন্ন দাঙ্গা করাবার মতো কমপিটেন্স কি শহীদ সিং বা রাজার আছে? আমার তো মনে হয় না। আমার ধারণা অন্য কেউও আছে, যে এখনো ছায়াতে। টাকা পাচারের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারি—সেখানে যত কম লোক থাকে ততই ভালো, কিন্তু আসল কাজ করাবার জন্য শহীদ আর রাজা যথেষ্ট নয়।' ব্রিগেডিয়ারের গ্লাস খালি; বিজয় আবার ভরে নিয়ে এল।

'স্যার, যদি কেউ থাকে তাহলে তাকে কানাড চেনে না বলে আমার মনে হয়। আপনার লজিক ধরে চললে হয়তো কানাডের মতো আরো তিনজন আছে। চারজনের গ্রুপটা পুরো ভারতবর্ষ দেখে, কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। তবে যে ব্যাপারে খট্‌কা লাগছে সেটা হল বিদেশে যারা খুন হয়েছে তাদের সঙ্গে কানাডের ছবি। কানাড কেন? তাহলে কি সে এদের মুখপাত্র?' চিন্তিত ভাবেই বলল রুদ্র।

'আর একটা কথা। কানাড এদের দলে গেল কী করে? ওর তো কোনো ক্রিমিনাল হিস্ট্রি নেই।' সুস্মিতা বলল।

'সাইকোলজিক্যাল কিছু থাকতেই পারে। সেটা পরে দেখা যাবে', বললেন ব্রিগেডিয়ার। কী একটা মনে পড়ায় সান্টাকে বললেন, 'সুস্মিতা যে দুটো লোকের বর্ণনা দিয়েছিল, তা থেকে কিছু বেরোল?'

দেখছি স্যার, তবে খুব একটা আশা নেই। ওরকম মৌখিক বর্ণনা থেকে চেহারা বার করা খুব শক্ত। আর চেহারাগুলোও খুব সাধারণ। তবে একটা বর্ণনা শহীদের সঙ্গে মিলছে। শহীদের পাসপোর্টে দুবাইয়ের স্ট্যাম্প আছে। তবে রহিম তো আর ডেট বলেনি, যে তার সঙ্গে মেলাব। রাজাদাদার তো পাসপোর্টই নেই।'

রুদ্র উঠে গিয়ে নিজের ড্রিংক বানাল। দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'স্যার, উইথ ইয়োর পারমিশান।' মনস্থির করেছে মনে হল। টিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা যা জানি তার উপর ভিত্তি করে এখন চলি। যা জানি না, তার পিছনে দৌড়বার সময় নেই। প্রথম, টাকার সোর্স বন্ধ হলেই এদের প্ল্যান মার খাবে। সুতরাং এক নম্বর প্রায়োরিটি হচ্ছে, শেখ আবু বক্‌র। দুই নম্বর হচ্ছে সাপের মাথা, অর্থাৎ রেডভিল্‌। ও যদি না থাকে টাকা চালাচালি একেবারেই বন্ধ হবে। চেষ্টা করতে হবে রেডভিলের যদি কোনো রেকর্ড থেকে থাকে তা উদ্ধার করা। কানাড ছাড়া যদি আরো লোক থাকে, তাদের ঘাঁত-ঘোঁত সেখান থেকেই বেরোবে। আর রেডভিলের ব্যবস্থা করতে পারলে ফিট্‌জপ্যাট্রিক অন্তত কিছুদিন চুপ থাকবে। আমরা হাতে সময় পাব।

রইল কানাড। ওকে যে কোনো সময়ে কায়দা করা যায়। তবে রাজা আর শহীদ, এই দুজনের মধ্যে একজনকে ধরে পেট থেকে কথা বার করতে হবে। আমার ধারণা ইউ.পি বা রাজস্থানে বা মধ্যপ্রদেশে আর পাঞ্জাবে যা ঘটছে, তার পিছনে এরা আছে। সিস্টেমটা কি, সেটা জানতে হবে।' একটানা অনেকগুলো কথা বলে রুদ্র থামল। সকলের মুখের দিকে তাকাল।

ব্রিগেডিয়ার মুখ খুললেন।

'সাউন্ডস গুড্‌। কীভাবে এগোতে চাও?'

বিজয় হাত তুলল, 'শেখকে আমার উপর ছেড়ে দিন।'

তুমি একা নয়। ব্যাকআপ চাই। আমি থাকব তোমার সঙ্গে।

ডান। তারপর?

তারপর রেডভিল। তুমি, আমি আর সুস্মিতা, তিনজনেই যাব কোলমার।

'আর আমি?' শর্মিলা জিজ্ঞেস করল।

'তুমি ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইজ করো। শ্মেলারের নোটস্‌ খতিয়ে দেখ আর কিছু বেরোয় কিনা। এ কাজটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট এইজন্যে যে আমরা যা করতে যাচ্ছি তা জাস্টিফাই করার জন্য ওই প্রমাণ দরকার।' শর্মিলা সায় দিল।

রুদ্র বলে চলল—'আর সান্টা, তুমি প্রথমত দেখ যে কলকাতার স্ক্যামওয়ালাদের সঙ্গে কানাড কথা বলে, তারা টাকা পাচারের ঠিক কত বড়ো অংশ। দরকার হলে যে কোনো একটা অ্যাসেট ফাঁসিয়ে দাও। তারপর কথা বের করার জন্য আমাদের এক্সপার্ট তো আছেই।'

'ক্যান ডু', বলল সান্টা।

সেকেন্ড, শেখ আবু বক্‌র সম্বন্ধে ডিটেল জোগাড় কর। ক'টা বাড়ি আছে, কোথায়, ইয়াট আছে কিনা, থাকলে তার ডিটেলস্‌, গত কয়েক মাসে কোথায় কোথায় গেছে, ইউ নো দ্য ড্রিল। কাল বিকালের আগে চাই।

'ক্যান ডু।' আবার বলল সান্টা।

রুদ্রর কথা শেষ হয়নি, কিন্তু ড্রিংক শেষ হয়েছে। আর একটা নিতে যাবে, ব্রিগেডিয়ার হাত বাড়িয়ে দিলেন। রুদ্র একটু মুচকি হেসে গ্লাসটা নিল। ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা। সকলে নিজের নিজের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ভাবছে মনে হল। রুদ্র ব্রিগেডিয়ারের হাতে হুইস্কির গ্লাসটা দিয়ে এবার এসে বসল।

অ্যাণ্ড সান্টা, লাস্ট বাট নট দ্য লীস্ট। পিটার ফিটজ্‌প্যাট্রিক। যা খবর পাওয়া যায়, আমাদের চাই, এমনকি সান্টো ডোমিঙ্গো জায়গাটার সম্বন্ধেও। ওই দেশটা—মানে ডোমিনিকান রিপাবলিক— আমরা কেউই কিছু জানি না। দেখ সি আই এ যদি সাহায্য করতে পারে।

'ওকে।' সান্টা নিজের গ্লাসে চুমুক দিল। সান্টা ড্রিংক করে না। লেমোনেড খাচ্ছে।

রুদ্র তাকাল ব্রিগেডিয়ারের দিকে, 'স্যার...'

ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'ফাইন উইথ মি। আমাকে কী করতে হবে?'

আপনি যদি স্যার সুরেটকে (Surete, ফরাসি গুপ্তচর বিভাগ, ইন্টারনাল সিকিউরিটি দেখে। পোশাকি নাম (Directorrate General or Intornal security) কে বলে রাখেন। অস্ত্র আমরা জোগাড় করে নেব, কিন্তু পারমিট চাই।

এটাও হয়ে যাবে। কাল দুপুরের পর আমার সঙ্গে দেখা করবে।

রজার স্যার। আপনি ভাববেন না স্যার। বাকি আমরা সামলে নেব।

'রাইট'। ব্রিগেডিয়ার উঠে দাঁড়ালেন। রুদ্র আর বিজয় দুজনেই স্যালুট মারল, মিলিটারি অভ্যাস, ছাড়তে পারে না। অবশ্য ছাড়তেও চায় না।

২

ব্রিগেডিয়ার বেরিয়ে গেলে সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। শর্মিলা সান্টার পাশে গিয়ে বসল। নীচু গলায় আলোচনা করতে লাগল। হাত তুলে সবাইকে থামতে বলল রুদ্র। সান্টাকে বলল, তুমি ভি.পি.এন-এর থ্রু দিয়ে একটা রিলিতে শেখের কিছু কল যায়। যদি ধরে নিই কলগুলো রেডভিল বা ফিট্‌জপ্যাট্রিককে হয় তাহলে আমাদের জানতে হবে ওই প্রোটোকল হ্যাক করা যায় কিনা।’

‘করা যায়, তবে করা শক্ত।’ সান্টা মুখে একটা করুণার ভঙ্গি এনে বলল, ‘অবশ্য আমার কাছে শক্ত নয়।’

কিন্তু ধর শেখ রেডভিলকে ফোন করছে, সেক্ষেত্রে ও রেডভিলের আওয়াজ তো চিনবে।

‘নিশ্চয়ই। তবে আওয়াজ নকল করা শক্ত নয়। ফ্রান্সের সাইবার-সিকিউরিটি যদি সাহায্য করে তবে রেডভিল বা যে-ই হোক-এর আওয়াজ নকল করা যাবে। রেডভিল নিশ্চয় অন্য ফোনও করে ওখান থেকে। সেই ফোন রেকর্ড করে তার ভয়েস প্রিন্ট নিয়ে অন্যের গলার ওপর সুপার ইমপোজ করে...।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সান্টা, ‘তোমাদের বলে আর কী হবে, তোমরা নেহাৎ ছেলেমানুষ।’ ছাতের দিকে তাকিয়ে রইল।

হাসি চাপল অন্যরা। রুদ্র আর একটা ড্রিংক নিল। সুস্মিতা কটমট করে তাকাল ওর দিকে, ‘কী হচ্ছে কি, ক’টা হল খেয়াল আছে?’ সুস্মিতার এইটুকু খবরদারিটা রুদ্র মেনে নেয়। এর পিছনে আরো গভীর কিছু আছে কিনা, কেউ জানে না। শর্মিলার একটা দীর্ঘশ্বাস আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। ওর শাসন করার লোক কানাডায় বসে আছে। সুস্মিতার ওপর একটু হিংসে হল। রুদ্র একটু হেসে সুস্মিতাকে উত্তর দিল, ‘তোমাদের সবার থেকে ভাবতে হয় তো, তাই আমার মাথার উপর চাপটা একটু বেশি।’

‘হুঁঃ, দুরাত্মার আবার ছলের অভাব। কী বলছিলে বলো।’

‘হ্যাঁ বলছি’, গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে রুদ্র বলল, ‘আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। সান্টা যদি আবু-বক্‌রের সিকিওর ফোন হ্যাক করতে পারে তাহলে ওকে একটা ফলস্ মেসেজ দিয়ে কোনো জায়গায় ডেকে নেওয়া যেতে পারে। তাহলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। আমার ধারণা আবু যে রেডভিলের টাকা সরিয়ে আল-কায়দাকে দেয় সেটা রেডভিল জানে না। আমাকে এলসা ওদের অ্যাটিটিউড সম্বন্ধে যা বলেছিল, তার থেকেই আমার এই ধারণা হয়েছে। এটা একটা অস্ত্র হতে পারে আমাদের হাতে।’

‘ঠিক আছে। আমার দিকটা আমি দেখব। যেতে পারি? তোমাদের অপারেশনাল প্ল্যানিং-এ আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।’ সান্টা বলল।

ঠিক আছে, যাও। গুড্ নাইট।

‘গুড্ নাইট।’ সান্টা বেরিয়ে গেল।

বিজয়ও এতক্ষণে আর একটা ড্রিংক নিয়েছে। গ্লাস হাতে ঘুর ঘুর করছিল।

দ্যাখো। এটা তো ক্রিসমাস সিজন্। আমরা উইন্টার ট্যুরিস্ট হয়ে কোলমার যাব। আর যদি হোয়াইট ক্রিসমাস হয়, অর্থাৎ বরফ পড়ে, তাহলে তো কথাই নেই। শর্মিলা দেখ তো, কাছাকাছি স্কি রেসর্ট আছে কিনা।

শর্মিলা চট্ করে গুগ্‌ল ম্যাপ দেখল, ‘হ্যাঁ আছে। স্কিরামা। কোলমার থেকে তিরিশ কিলোমিটার মতো।’

—‘আমি ভাবছি...।’ বলে একবার শর্মিলার দিকে তাকাল। ঠোঁটের কোণে একটা মুচকি হাসি দিল। সন্ধ্যা থেকে ওই একটা ড্রিংক নিয়েই বসে আছে, ‘ভাবছি’, ক্রিস্টমাসের কয়েকদিন তো বিশেষ কাজ হবে না, লন্ডনও বন্ধ থাকবে। আর শর্মিলার তো মাথা গরম হয়ে যাবে। ওকেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।’

‘লাভলি।’ শর্মিলা প্রায় নেচে উঠল।

বড়দার মতো একটা শ্রাগ করল রুদ্র, ‘ভালো মেয়েদের জন্য আমি অনেক কিছুই করতে পারি।’

‘কী করতে পার?’ এটা সুস্মিতা।

‘বুঝেছি’, বিজয় বলে উঠল। ওর মুখেও হাসি।

‘তুমি আবার কী বুঝলে?’ বিজয়ের দিকে তাকাল সুস্মিতা।

সেটা বস্‌কেই জিজ্ঞাসা করো।

সুস্মিতা আবার তাকাল রুদ্রর দিকে।

চাইলে ডেরেককেও ডেকে নিতে পারি। ওর জন্য দুঃখ হচ্ছিল। আমরা সবাই ক্রিসমাস মার্কেট দেখবো—দেখবোই—আর ও বেচারা একা একা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে... না, এগেনস্ট্ অল্ রুলস্ অফ নেচার।’

ডেরেক ও’কমর শর্মিলার বয়ফ্রেন্ড। কানাডিয়ান। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে, কিন্তু নিষ্পত্তি হয়নি।

শর্মিলার মুখটা লাল। সুস্মিতা ওকে একটা ঠেলা দিল, ‘কিরে, কিছু বল্।’

‘আমি আর কী বলব।’ শর্মিলা একটু লাজুক গলাতেই উত্তর দিল।

তাহলে ওই কথাই রইল। ব্রিগেডিয়ারের পারমিশন আমি নিয়ে নেব।

‘লাস্ট কোয়েশ্চেন’, হাত তুলল সুস্মিতা। ‘ওদের কাজ কী?’

ওরা আমাদের ব্যাকআপ। মার্কেট ঘুরবে, শহর ঘুরবে, কেউ আমাদের দিকে নজর রাখছে কিনা দেখবে। ইন ফ্যাক্ট, যদি ডেরেক জনকে আনতে পারে আরো ভালো। তাহলে তুমি আমি একটা টিম, বিজয় আর জন—ওরা ভালো টিম, আর শর্মিলা আর ডেরেক। আমরা চারজন অ্যাকশন টিম, ওরা ব্যাকআপ্।

রাইট, বস্। শত্রু কত স্ট্রং আমরা যখন জানি না, তখন দল একটু ভারী করাই ভালো।

‘আর একটা কথা’, সুস্মিতা নিজের ওয়াইন শেষ করে ঠক্ করে টেবিলে রাখল, ‘শ্যাতো আক্রমণ করতে হবে ক্রিসমাসের আগের দিন বা ক্রিসমাস নাইটে। ওই দিন নিশ্চয় শ্যাতোর স্টাফরা ছুটি পাবে। আমাদের পক্ষে সুবিধা।’

‘গুড্। এনিথিং টু অ্যাড্? নো? তাহলে শর্মিলা তুমি ডেরেকের সঙ্গে কথা বলে রাখ। আজ হচ্ছে ছ’ তারিখ। ওকে বল একুশ তারিখে

প্যারিস পৌঁছতে। ওখানেই দেখা হবে। সুস্মিতা তুমি সান্টাকে বলে ওই জায়গার ডিটেইলড্ স্যাটেলাইট ম্যাপ জোগাড় কর আর সেটা স্টাডি কর। আমি ধরে নিচ্ছি সান্টা উইল বি সাকসেসফুল। সেই মতো বিজয় আর আমি অপারেশন শেখ প্ল্যান করব। আর ইতিমধ্যে...' রুদ্র থামল।

ইতিমধ্যে কি?

'ইতিমধ্যে আমরা কানাড, শহীদ আর রাজাকে আর একটা 'ঝটকা' দব।' হাসল রুদ্র। সেটা মিষ্টি হাসি নয়।

বাকিরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সুস্মিতা এসে রুদ্রর গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'থ্যাংক ইউ।'

হঠাৎ?

ওটা শর্মিলার আর ডেরেকের হয়ে। ফর থিংকিং অফ দেয়ার হ্যাপিনেস।

ও, আর আমার কিছু পাওনা নেই?

'আছে', আর একটা চুমু প্রাপ্তি হল রুদ্রর।

এটা কেন?

জাস্ট ফর বীং ইউ।

সুস্মিতা বেরিয়ে গেল। রুদ্র ওর যাওয়ার দিকে তাকাল একটু। এই মেয়েটাই অবলীলাক্রমে গুলি চালিয়ে মানুষ মারতে পারে; মেরেওছে। আবার এত নরম। একটা শ্রাগ্ করে নিজেও বেরোল। ওর নিজের খালি ফ্ল্যাটে (আক্ষরিক অর্থেই খালি; আসবাবপত্র কিছুই প্রায় নেই) যেতে ভালো লাগছে না। মাঝে মাঝে মনে হয়...আর একটু শ্রাগ্ করল। ওই জীবন ওর জন্য নয়।

৩

সুস্মিতার কল যখন এল তখন বাজে সকাল ন'টা। আর্কটিক সার্কেলের কাছে বলে সূর্য এখনও ওঠেনি। অবশ্য ডেরেক আর জন দুজনেই তৈরি। বেকন আর স্ক্র্যাম্বল্ড এগ্ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারা হয়েছে। গত রাত্রে বরফ পড়েছিল একটু। চারদিক এখনো সাদা। সেন্ট জনস্ শহরটাতে বিশেষ কিছুই নেই। প্রধানত ফিশিং পোর্ট। অবশ্য মালবাহী জাহাজও আসে। কিছু বড়োলোকদের ইয়াট থাকে। ডেরেক আর ওর পার্টনার জন্ একটা রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপ চালায়। ইয়াট আর ট্রলার। আগে শুধু দুজনে মিলে করত, এখন একজন হেল্পারও আছে। শিখ। দিলওয়ার সিং। মেশিন ওদের রক্তে। স্কটদের মতো। জন ম্যাকএলিস্টার নিজে স্কট, এক্স রয়েল নেভি। ওকে পেয়ে জন খুশি।

শর্মিলা বলল টিম ফ্রান্সে যাচ্ছে একটা অপারেশনে। ওকে আর জনকে যেতে বলল। অপারেশন সম্বন্ধে কিছু বলল না। জনকে কথাটা বলাতে জন রাজি। এমনিতেই ক্রিসমাসের সময় কোনো কাজ নেই, কী করা যায় ভাবছিল ডেরেক—এতো হাতে চাঁদ। জন প্ল্যান করছিল গ্লাসগো যাবে ওর মেয়ের কাছে। একুশ তারিখ প্যারিস পৌঁছবার কথা শুনে বলল ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড যাবে ক্রিসমাসের পর। নিউ ইয়ার মেয়ের কাছে কাটিয়ে সেন্ট জনস্ ফিরবে পাঁচ তারিখ নাগাদ।

'স্যুটস্ মী', বলল ডেরেক।

—'দেন্ কনফার্ম টু হার', উত্তর দিল জন্।

এখনো দু'সপ্তাহ আছে। তবুও তৈরি হতে হবে। ইন্ডিয়ান ভিসা চাই, তার জন্য সময় লাগবে। হাতের সমস্ত কাজ শেষ করে, দিলওয়ারকে ছুটি দিয়ে, ওয়ার্কশপ বন্ধ করে তবে যাওয়া।

বেরিয়ে গেল দুজনে।

পঞ্চম চক্র

প্রথম মার

১

রাত এগারোটা। দুবাইয়ে শেখ আবু-বক্র অল্ ইসফাহানির বাংলো। শহর থেকে একটু বাইরে। নতুন হাউসিং ডেভলপমেন্ট হচ্ছে, সেখানে। আবু-বক্র নিজের স্টাডিতে বসে কাগজপত্র দেখছে, আর ব্র্যান্ডি খাচ্ছে। আবু অল-কায়দাকে টাকা দিতে পারে, কিন্তু ওদের মতো ধার্মিক নয়। নমাজ ইচ্ছে হলে পড়ে, নয়ত নয়। ওর স্মার্টওয়াচ একটা বীপ্ করল। এর মানে, ওর লুকোনো ফোনে কল্ আসছে। ফোনটা থেকে শুধু রেডভিলকে ফোন করা যায়। দেরাজ খুলতে খুলতে আবু ভাবল, এই তো সেদিন দেখা হল, এর মধ্যেই আবার কী!

ফোন তুলতেই রেডভিলের গলা। একটু ভারী শোনাচ্ছে, তবে রেডভিল্ই।

তুমি খুব ডেঞ্জারাস খেলা খেলছ, শেখ।

'কী হল?' আবুর গলাটা কেঁপে গেল।

আমার টাকা তুমি অল্-কায়দাকে দিয়েছ। এর জন্য তোমার শাস্তি হবে। তবে এখুনি নয়। এখনো কিছুদিন আছে। যাক্ শোন, কাল সকালে তুমি ইয়াট নিয়ে ওমানের দিকে যাবে। হাই সীতে তোমার সঙ্গে একটা ইয়াটের দেখা হবে, খাসাব আর মাধার মাঝামাঝি জায়গায়। ইয়াটের নাম ব্লু এঞ্জেল। তাতে আমার লোক থাকবে। তোমাকে ইন্সট্রাকশন দেবে। ডোন্ট ফেইল মী।

ফোন কেটে গেল। দিল্লিতে সান্টার মুখে এক গাল হাসি।

২

ভোর ছ'টা। অর্ডার মতো আবু বকরের ইয়াট যাবার জন্য রেডি। ক্যাপ্টেন ব্রিজে। ক্যাপ্টেন ছাড়া আর চারজন আছে ইয়াটে। একজন এঞ্জিনিয়ার, তার অ্যাসিস্টেন্ট, একজন নাবিক আর একজন কুক-কুম-বেয়ারা। এছাড়া শেখ যখন আসে, এক-দুজন ওর সঙ্গেই আসে। ইয়াট খুব বড়ো নয়, তবে আবু-বক্র-এর কাজ চলে যায়। আবু এল সাড়ে ছ'টায়। সঙ্গে অ্যাটাচি নিয়ে একটা লোক। ইয়াট মুরিং থেকে বেরিয়ে এক কিলোমিটারও যায়নি, একটা ফ্ল্যাগ ওড়ানো কাস্টমসের লঞ্চ সিগন্যাল করে থামতে বলল। শেখ জাহাজের ব্রিজেই ছিল, ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়ে। বলল, 'কী হল?'

এঞ্জিন রুমে অল্ স্টপ্ সিগন্যাল দিয়ে কাস্টমসের লঞ্চের দিকে আঙুল

দেখাল ক্যাপ্টেন। একটু ভুরু কোঁচকাল শেখ। এমন তো হবার কথা নয়। কাস্টমস্ অফিসাররা ইয়াটে উঠল। তাদের মধ্যে একজন পরিষ্কার দাড়ি কামানো, পোশাকটা একটু অন্য রকম। সিনিয়র অফিসার নিজের পরিচয় দিল, মুফাতিশ (ইন্সপেক্টর) রশিদ। অন্যজনকে দেখিয়ে বলল ইন্সপেক্টর কুমার, ইন্ডিয়ার কাস্টমস্।

তা আমাদের থামালেন কেন?

কিছু মনে করবেন না শেখ। কিছুদিন ধরে আপনার মতোই বড়ো ইয়াটে করে গোল্ড স্মাগলিং হচ্ছে ইন্ডিয়াতে। সেজন্য আমরা সব ইয়াট-ই বেরোবার সময় চেক করছি। এই আমার ওয়ারেন্ট, ইয়াট সার্চ হবে।

ওয়ারেন্ট না দেখেই ফেরৎ দিল আবু, 'কিন্তু আমি তো ইন্ডিয়া যাচ্ছি না, ওমানের দিকে গিয়ে একটু ঘুরে চলে আসব।'

আপনি কি রুট ফাইল করেছেন আমরা জানি। তবুও অর্ডার তো অর্ডারই। প্লিজ, আমাদের কাজ করতে দিন।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সরে দাঁড়াল শেখ। ইন্ডিয়ান অফিসার আর রশিদের দুজন অ্যাসিস্টেন্ট কাজে গেলে পড়ল। ক্যাপ্টেন ওদের সঙ্গেই গেল।

৩

রুদ্র ইয়াটের নীচে। গায়ে নিওপ্রীণ রাবারের স্যুট, মুখের মাস্কের সঙ্গে রি-ব্রিদার ইউনিট লাগানো। এতে জলে বুদ্বুদ ওঠে না। রাত্রিবেলা একটা ছোটো ট্র্যাকার লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ইয়াটের নীচে। ওর রিস্টওয়াচের সঙ্গে সিনক্রোনাইজ করা। তিরিশ ফুট মতো নীচে রুদ্র। ইয়াটের প্রপেলারের কাছে উঠে এল। আন্দাজ করল ইয়াটের ডিজেল ট্যাংকটা কোথায়। ডাইভ ব্যাগ থেকে একটা লিম্পেট মাইন বার করল। ম্যাগনেট দিয়ে ইয়াটের গায়ে আটকে যাবে। এটা আধুনিক বম্ব। রেডিও কন্ট্রোলড্। তবুও সাবধানের মার নেই ভেবে একটা দু'ঘণ্টার আন্ডারওয়াটার টাইমার পেন্সিল গুঁজে দিল। মাইনটা আর কিছুই না, একটা আর.ডি.এক্সের তাল। আর টাইমার পেন্সিলে রয়েছে দুটো কেমিক্যাল, মধ্যে একটা পাতলা তামার পাত্র। দেড় ঘন্টায় কেমিক্যাল ওই তামার পাতটা গলিয়ে দেবে। দুটো কেমিক্যাল মিশে অসম্ভব হীট হবে, আর তারপরই বিস্ফোরণ।

কাজ শেষ করে আবার ফিরে যাচ্ছে, পায়ে কী একটা কামড়াল। ফিরে দেখে একটা ছোটো হাঙর। পা থেকে মাংস খুবলে নিয়েছে। ভাগ্যিস বড়ো নয়, তাহলে পা-টাই নিয়ে যেত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, রক্ত বেরোচ্ছে গল্ গল্ করে। আর ওই রক্ত শুঁকে বড়োরা এসে পড়তে কতক্ষণ! যত তাড়াতাড়ি পারে সাঁতার কাটল। কিন্তু হাঙরটা আবার আসছে। ওটাকে মারতে পারলে হয়তো বড়োগুলো এসে ওটাকেই আগে খাবে, রুদ্র একটু সময় পাবে। তবে যা করতে হবে তাড়াতাড়িই। মাথাটা ঝিম মেরে আসছে।

জলের মধ্যে উল্টো হয়ে গেল। ওর হাতে একটা কম্যাণ্ডো নাইফ। এটাই সঙ্গে করে এনেছে।

হাঙরটা ওর চারদিকে ঘুরছে। ওরা তাই করে। হঠাৎ স্পিড্ নিয়ে অ্যাটাক করবে। রুদ্রও ঘুরল হাঙরটার সঙ্গে একই জায়গায় জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে। যখন অ্যাটাক করল, রুদ্র তৈরিই ছিল। একটু পাশে সরে গিয়ে নাইফটা সোজা হাঙরটার চোখে। ছিটকে গেল জন্তুটা। একটা লাল রেখা টেনে দূরে চলে গেল। নিজেকে কোনোমতে টেনে নিয়ে চলল রুদ্র। তবে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠছে। মাথার ওপর একটা ছায়া। একটা বোট। কোনোমতে বোটের পাশটা চেপে ধরে উঠবার চেষ্টা করল। পারল না। আবার চেষ্টা করল। কে একজন শক্ত হাতে ওকে টেনে তুলল। বোধহয় জেলে। মাছ ধরতে যাচ্ছিল। রুদ্র আর কিছু বলতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরলে দেখে হোটেলের ঘরে শুয়ে আছে। পাশে একজন নার্স, বিজয় একটা চেয়ারে বসে, আর ওর পায়ে মোটা ব্যাণ্ডেজ। ওর চোখ খুলেছে দেখে নার্স তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস ওর মুখের সামনে ধরল। বেশ কিছুটা জল খাবার পর মনে হল শরীরে একটু বল পেয়েছে। তাকাল বিজয়ের দিকে। বিজয় ইশারায় নার্সকে চলে যেতে বলে নিজের চেয়ারটা বিছানার কাছে টেনে আনল।

গ্ল্যাড টু সী ইউ ব্যাক্, বস্।

থ্যাংকস্। কিন্তু এখানে এলাম কী করে?

তুমি ফেরোনি দেখে আমি ওয়াটারফ্রন্টে খোঁজ করছিলাম, একজন বললে একটা জেলে নাকি একজন ডুবুরীকে উদ্ধার করেছে। দৌড়লাম। ধরাধরি করে হোটেলে। শার্ক অ্যাটাক। কেউ কিছু বলেনি। সবাইকে বললাম শখের ডাইভিং করতে গিয়েছিলে, মানা করা সত্ত্বেও শোনোনি।

ব্যাণ্ডেজ কে করল?

হোটেলের ডাক্তার। এখুনি আসবে।

বলতে বলতেই ডাক্তার এল। ভারতীয়।

হাও আর ইউ নাও?

ভালোই। মাচ্ বেটার।

ব্লাড লস ভালোই হয়েছিল। প্লাজমা দিয়েছি আপনাকে। কালকের মধ্যে ইউ শুড্ ফিল নরম্যাল। তবে ক্ষত সারতে সময় লাগবে।

সময় তো আমার নেই, ডক্। কাল আমাকে যেতেই হবে দিল্লি।

একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়লেন ডাক্তার, 'আমি বললেও আপনি শুনবেন না জানি। যান, তবে এগেনস্ট মাই অ্যাডভাইস। অ্যান্ড দ্যাট উইল বি অন্ রেকর্ড। আর দিল্লি গিয়েই হাসপাতালে যাবেন। ব্যাণ্ডেজ কাল পাল্টে দেব।'

মেনি থ্যাংকস্, ডক্টর। নার্সের আর দরকার নেই। আমার বন্ধু রয়েছে, আই উইল বি ফাইন।

ঠিক আছে। আমি একটা ক্রাচ্ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ডাক্তার যাবার পর রুদ্র জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কাজ হয়েছে?'

মাথা নাড়ল বিজয়, 'হ্যাঁ। তোমার রিমোট কোথায় আছে জানি না। আর কাস্টমস্ অফিসার সেজে আমি তো একটা রিমোট সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারি না, তাই সে চেষ্টাও করিনি। ভ্যাগ্যিস তুমি টাইমার

লাগিয়ে এসেছিলে। তোমাকে উদ্ধার করার পর একটা টিভি বুলেটিনে শুনলাম একটা ইয়াটে বিস্ফোরণ হয়েছে খাসবা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। কেউ বাঁচেনি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুদ্র, 'এখন তাহলে শুধু রয়ে গেল শেখের সব ডকুমেন্ট হাত করা।'

সেটা আজ রাতেই হবে। মোখতারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

৪

সেই রাত্রে। রাত ন'টা বাজে। শেখ আবু বক্‌রের বাড়ির সামনে একটা কালো এস.ইউ.ভি এসে দাঁড়াল। এমনিতে এখানে অন্তত দুটো সিকিউরিটি গার্ড থাকে, কিন্তু আজ একটাকেও দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি থেকে চারজন নামল। বিজয়, মোখতার আর দুজন মোখতারের লোক। গেট ভিতর থেকে তালা মারা। তবে গেটের গায়ে কাঁটা মতো লাগানো আছে, উঠতে অসুবিধা নেই। একজন গেট বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেল। বোধহয় গার্ডহাউসে গিয়ে গেটের লক্ অফ্ করল। গেট খুলল। বাকি তিনজন ঢুকল ভিতরে। মোখতার নিজের সাথীর দিকে একবার তাকাতে সে গার্ডহাউসের ভিতরটা দেখাল। একটা ইউনিফর্ম পরা বডি পড়ে আছে। মোখতার নীচু গলায় একটা কিছু বলল, ওর সাথী গিয়ে গার্ডহাউসের লাইট ফিউজ করে এল। পুরো বাংলোটা অন্ধকার, শুধু একটা ঘরের জানলা দিয়ে আলো আসছে। পর্দা অর্ধেক টানা। একজন ঘরের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করছে। হাতে কাগজপত্র নিয়ে যাচ্ছে, আসছে। ওরা বাড়িটা পুরোটা ঘুরল। সব জানলাগুলোই বন্ধ, শুধু কিচেনের জানলা অর্ধেক খোলা। সেখান দিয়ে হাত ঢুকিয়ে জানলা খোলা গেল। এক এক করে তিনজনই ঘুরে ঢুকল। প্যাসেজ দিয়ে এগোল। প্যাসেজে কার্পেট নেই, বোধহয় একটু আওয়াজ হয়েছিল। স্টাডি থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল, হাতে পিস্তল। প্যাসেজের আলো জ্বালল।

কেউ বলার আগেই লোকটা ফায়ার করল। কিন্তু ততক্ষণে বিজয়ের হাতেও পিস্তল। ওর গুলিতে লোকটার হাতের পিস্তল ছিটকে গেল। লোকটাও পড়ে যাচ্ছিল, দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিজয় পাশ ফিরে দেখল মোখতার পড়ে গেছে। গুলিটা বুকে লেগেছে। ওর জেলাবার সামনেটা লাল। বিজয় আবার ঘুরল লোকটার দিকে। এতক্ষণে মুখ দেখা যাচ্ছে—ব্রায়ান্ট।

ব্রায়ান্ট দু'হাত তুলল 'প্লিজ ডোন্ট শুট। আই অ্যাম এন্ আমেরিকান। নট্ স্কাম লাইক দোজ পিপ্‌ল।' পড়ে যাওয়া মোখতার আর তার সঙ্গীর—এখন নীচু হয়ে মোখতারকে দেখছে—দিকে দেখাল। বিজয়ের চোয়াল শক্ত, 'ইউ শট্ আ ম্যান হু ওয়াজ নট্ থ্রেটেনিং ইউ। ফর দ্যাট, ইউ ডাই।'

প্লিজ, প্লিজ, আই ওয়াজ স্কেয়ারড, দ্যাট ইজ্ হোয়াই...'

—'নট্ গুড্ এনাফ। সে গুড্ বাই টু মাদার আর্থ।' বিজয় ফায়ার করতে যাচ্ছিল, তার আগেই একটা ছুরি সোজা গিয়ে বিঁধল ব্রায়ান্টের গলায়। মোখতারের সঙ্গীই প্রতিশোধটা নিল।

ব্রায়ান্ট পড়ে গেল। গলায় ছুরিটা বিঁধে আছে। কী একটা বলবার চেষ্টা করছে। বিজয় ওর বডিটা পা দিয়ে সরিয়ে দিল, 'মোখতার ওয়াজ ওয়র্থ টেন অফ্ ইউ, ইউ বাস্টার্ড। বার্ন ইন্ হেল্।'

শেখ আবু-র স্টাডিতে ফাইলপত্র একদিকে জড়ো করা, কিছু পেন ড্রাইভ আর একটা ল্যাপটপ। একটা বড়ো রুকস্যাক পাশেই পড়ে আছে, বোধহয় ব্রায়ান্ট এনেছিল এসব নিয়ে যাবার জন্য। সবকিছু ওটাতেই ভরল বিজয়। রুকস্যাকটা মোখতারের সঙ্গীর হাতে দিয়ে মোখতারের বডিটা কোলে তুলে নিল। মেইন গেট দিয়ে বেরোল ওরা। মোখতারের বডি সযত্নে পিছনের সীটে রাখল বিজয়। নিজে বসল তার পাশে। বিজয়কে হোটেলের বাইরে নামিয়ে গাড়ি চলে গেল। বিজয় কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ওরা মরুভূমির লোক মরুভূমিতেই মোখতারকে কবর দেবে।

রুকস্যাক কাঁধে নিয়ে হোটেলে ঢুকে গেল বিজয়।

৫

দু'দিন পর ওরা ফিরতে পারল। একটা দিন গিয়েছে জবানবন্দি দিতে। বিজয়ের পিস্তল সমুদ্রের অতলে, আর রুকস্যাক ডিপ্লোম্যাটিক পাউচে দিল্লি। কোনো প্রমাণ নেই, শুধু সন্দেহ। ইজাজ্ নিজের কর্তব্য করেছে। একটু দায়সারা ভাবেই। ইচ্ছা করলেই বিজয়ের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে শেখের বাংলোর সব প্রিন্ট মিলিয়ে দেখতে পারত; কিন্তু দেখেনি। অনিচ্ছাটা ওর, না ওর ওপরওয়ালার, বোঝা গেল না। বিজয় গ্লাভস্ না পরে খুব ভুল করেছে। যাক্, বেঁচে গেছে। রুদ্র উঠতে পারছে। পায়ে ব্যথা, কিন্তু ব্লিডিং হচ্ছে না। ডাক্তার বলেছেন নর্ম্যালের কাছাকাছি পৌঁছতে দিন পনেরো লাগবে। রুদ্রর হাতে অত সময় নেই, তবে সেকথা তো আর ডাক্তারকে বলার নয়। দিল্লিতে ওকে ওর ফ্ল্যাটে কেউ থাকতে দেয়নি। সুস্মিতা বিজয়কে নিয়ে গিয়েছিল একদিন, ফ্ল্যাটের অবস্থা দেখে নাক মুখ কুঁচকে বলে

এসেছে ‘এভাবে মানুষ থাকে?’

বিজয়ের ফ্ল্যাট অনেক সুন্দর গোছানো। কৃতিত্ব বিজয়ের নয়, ওর বন্ধুর বৌয়ের। সেই সব গুছিয়ে দিয়েছিল। অগত্যা বিজয়ের বাড়ির গেস্ট রুমে রুদ্রর ঠাঁই হয়েছে। ওখান থেকেই মিটিং আর অন্য কাজ করছে। শহীদ সিং আর রাজাদাদা আন্ডার গ্রাউণ্ড হয়েছে। এই মুহূর্তে ওদের ব্যাপারে কিছু করছে না রুদ্র। আগের প্ল্যানটা বাতিল। এখন নজর শুধু রেডভিলের ওপর। হোমওয়ার্ক সবই হয়েছে, এখন শুধু যাবার অপেক্ষা। তবে তারিখটা একটু এগোতে হয়েছে। প্যারিসে সুরেটের ভাঁলর সঙ্গে দেখা করতে হবে পারমিটের জন্য। তাছাড়া কেনাকাটিও আছে। ওরা এখন রওনা হবে ১৯ তারিখে। শর্মিলা ডেরেককে সেইমতো জানিয়েছে। কানাড আবার দিল্লিতে। যতদিন ও ছিল না, ততদিনে ওর বাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় মাইক্রোফোন ইত্যাদি বসানো হয়েছে। কানাড ফিরে এসে বাড়ি যেরকম ছেড়ে গিয়েছিল সেরকমই পেয়েছে। সন্দেহের কোনো কারণ নেই। ওকে আপাতত ‘ব্যাক-বার্নারে’ রেখেছেন ব্রিগেডিয়ার। আশা করছেন রেডভিলের শ্যাতো থেকে প্রামাণ্য যদি কিছু পাওয়া যায়।

সান্টা আর একটা কাজের কাজ করেছে। যেভাবে শেখের ফোন হ্যাক করেছিল সেভাবেই কানাডের সিক্রেট ফোনও হ্যাক করার ব্যবস্থা করেছে। এ কাজের জন্য ব্রিগেডিয়ার ওকে প্রাইজ দিয়েছেন। একটা দামি সফট্ওয়্যার কেনার জন্য বহুদিন ধরে ছোঁক ছোঁক করছিল, ব্রিগেডিয়ার শেষ পর্যন্ত সেটা কিনে দিয়েছেন। শেখের কাগজপত্র আর ল্যাম্পটপের উপর পুরোদমে কাজ চলছে। অল্-কায়দা কানেকশন তো ছিলই, এখন দেখা যাচ্ছে আরও একটা সন্ত্রাসবাদী দলকে টাকা দিয়েছিল শেখ। যাক্, সেসব টাকার মূল্য নিজের প্রাণ দিয়েই দিয়েছে।

ষষ্ঠ চক্র

দ্বিতীয় মার

১

প্যারিস যেমন ছিল তেমনই আছে, শুধু নতুন করে সেজেছে ক্রিসমাসের জন্য। রুদ্র এবং বিজয় দুজনেই এর আগে অনেকবার এসেছে, তবে এই সময়ে নয়। আর মেয়েরা তো প্রথমবার। ফলে বিজয় আর রুদ্র সুরেটের অফিসে আর অন্যত্র ছোটাছুটি করল দু’দিন, আর মেয়েরা শাঁজে লিজে থেকে শুরু করে মর্তে সব ঘুরে বেড়াল। ভাঁল এমনিতে খুব মাইডিয়ার লোক, তবে ক্রিমিন্যাল শায়েস্তা করার ব্যাপারে একটু বেশিই কড়া। ভারতে যেমন নিয়ম ‘ইনোসেন্ট আন্টিল প্রুভেন গিল্টি’, ফ্রান্সে এটার ঠিক উল্টো—গিল্টি টিল্ প্রুভেন ইন্নোসেন্ট। এতে পুলিশের সুবিধা হয়, আর ক্রিমিন্যালদের সাবধানে চলতে হয়। ফ্রান্সে যে ক্রাইম রেট খুব কম তা নয়, কিন্তু ভারতের মতো ব্যাপক চুরি জোচ্চুরি হয় না, আর ক্রিমিন্যালরা হাসপাতালে আশ্রয় নিতে পারে না। ভাঁল পুরো রিপোর্ট নিলেন, বিশেষ করে ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্কটার ব্যাপারে জোর দিলেন। রুদ্র ব্রিগেডিয়ারের নির্দেশ মতো রিপোর্ট তৈরি করেই এনেছিল, সেটা ভাঁলর সামনে পেশ করল। মন দিয়ে বললেন, ‘আমার থেকে কী চাও?’

আমাদের সবার জন্য গান পারমিট, আর কোলমারের সি আর এস (Cowpagines Republicans de sceurite) ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল পুলিশকে বলে রাখা, আমরা ওদের সাহায্য চাইতে পারি।

হুঁ। তবে দেখো এমন কিছু করে বোসো না, যাতে আমার চেয়ারও নড়ে যায়। লোকটা বলছ বিলিওনেয়ার, অনেক বছর ধরে ফ্রান্সে আছে—নিশ্চয় পলিটিক্যাল কানেকশনও ভালোই আছে।

জল খেলেন একটু ভাঁল। তারপর একেবারেই ফরাসি ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন—‘ডেমোক্রেসির অন্ধকার দিক।’

মাথা নেড়ে সায় দিল রুদ্র। ভাঁল বেল বাজিয়ে, সেক্রেটারি ডাকলেন। সেক্রেটারি কতকগুলো ফর্ম নিয়ে এসে রুদ্র আর বিজয়কে দিয়ে সই করাল। রুদ্র সই করতে করতে একবার মাথা তুলে বলল, ‘আপনাকে বলতে ভুলে গেছি, আমাদের দু’জন ‘কন্সালটেন্ট’, ডেরেক ওকনর আর জন ম্যাকএলিস্টার-ও আসছে। অবশ্যই ওরা সিকিউরিটি ক্লীয়ারড্।’

ভুরু কোঁচকালেন ভ্যাঁল, ‘ব্রিটিশ না আমেরিকান?’

ক্যানাডিয়ান।

তাহলে ঠিক আছে। ব্রেক্সিটের পর—জানই তো, ব্রিটিশ হলে একটু অসুবিধা হত। পারমিট আমি দিয়ে দিচ্ছি। তবে যেহেতু ওরা ভারতীয় নয়, ওদের বলবে এখানে এসে আমার সেক্রেটারির কাছে ফর্ম সই করে যাবে।

নিশ্চয়ই যাবে। মার্সে বোকু, মঁসিয় (অনেক ধন্যবাদ) ভাঁল। আমরা এখন উঠি।

‘উই (হ্যাঁ)। আর... তোমরা হলে পাম্মি সিংয়ের লোক, তোমাদের এন্টারটেন করা তো আমার কর্তব্য। আর তাছাড়া সুন্দরীদের সঙ্গে আলাপ না করে তোমাদের যেতে দিলে তো পুরো ফরাসি জাতির অপমান হবে।’ হাসলেন ভাঁল।

‘সে তো নিশ্চয়ই। ওরাও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পেরে খুবই খুশি হবে।’ হেসেই উত্তর দিল রুদ্র।

তাহলে ওদের নিয়ে আজ সন্ধ্যা সাতটায় চলে এস। লে ত্যু প্যারি। পন্তে নিউ-এর কাছে, দেখে নিও। সাত তলায়। আমার নামে টেবিল থাকবে, যদি আগে পৌঁছও।

ভাঁলকে বিদায় জানিয়ে উঠে পড়ল ওরা। অনেক কাজ বাকি। অস্ত্র কেনার জন্য অবশ্য বিজয়ের কন্ট্যাক্ট আছে। পারমিট সঙ্গে থাকলেও যে বন্দুক-পিস্তল কারও খাতায় চড়েনি সে জিনিসই প্রশস্ত। এছাড়া আরও কিছু আছে যার পারমিট হয় না। একটা ক্যাফেতে বসে বিয়ার খেতে খেতে লিস্ট বানাল বিজয়। রুদ্রকে দেখাল। সামান্য একটু রদ-বদল করে দিল রুদ্র।

রুদ্র গেল অন্যান্য জিনিস জোগাড় করতে। একটা ‘ব্রিকো’-র বড়ো দোকান দেখে ঢুকল। হার্ডওয়ার সুপার মার্কেট। হাই স্ট্রেংথ নাইলনের

দড়ি, পাহাড়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম, কম্যাণ্ডো নাইফ আর ক্যাম্পিং নাইফ, বেল্ট থেকে ঝোলানো যায় এমন টর্চ, ব্যাটারি ইত্যাদি। আর একটা দোকানে গিয়ে মিনিয়েচার ওয়াকি-টকি, থ্রোট মাইক ইত্যাদি। নিজের আর বিজয়ের জন্য স্নো-গগল্স কিনল। মেয়েদের গগলস্ ওরাই কিনুক—প্যারিস বলে স্নো-গগলসেরও ফ্যাশন, ও ঝামেলায় না পড়াই ভালো। সব কিছু দুটো বড়ো ক্যারি-অল্ এ ভর্তি করল।

ব্যাগগুলো কাঁধে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল। ওরা ইচ্ছা করেই শাঁজে লিজের পাশের একটা গলিতে একটা 'পেনসন'-এ ঘর নিয়েছে। এখানে সিকিউরিটি স্ক্যানিং নেই, সেটাই বড়ো কথা, নইলে বিজয়ের কেনাকাটা দেখলে সিকিউরিটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। বিজয় আগেই পৌঁছেছে। কিন্তু ওর কেনাকাটা দেখা হল না। বিজয় বলল দু'একটা জিনিস বাকি আছে, আগামীকাল পাওয়া যাবে। ঘড়িতে একটা।

মেয়েদের বলা আছে দেড়টার সময় শাঁজে লিজের একটা ক্যাফেতে সবাই একসঙ্গে লাঞ্চ খাবে। পৌঁছে দেখা গেল শর্মিলা আর সুস্মিতা আগেভাগেই এসে ওয়াইন খাচ্ছে। সকাল থেকে ওদের সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। রুদ্ররা ছিল লিসে প্যালেসে, ভাঁলর ঘরে। মোবাইল মানা। আর তারপর দৌড়-ঝাঁপে আর হয়ে ওঠেনি। ওরা দুজনেই খুব উৎসাহিত। তার ওপর রুদ্র একটা সুখবর দিল। ব্রিগেডিয়ার কিছু শপিংয়ের পারমিশন দিয়েছেন। ক্রিসমাস ট্যুরিস্টের ছদ্মবেশ।

'দেখো, আবার দোকানগুলোই কিনে আনতে যেও না। আর আজ রাতের জন্য একটু ফর্ম্যাল ড্রেস কিনো। ভাঁলকে ইম্প্রেস করা দরকার।' বিজয় বলল।

আমাদেরও কিছু কিনতে হবে। সবথেকে দরকার হবে ওয়েদার-প্রুফ ট্রাউজার আর জ্যাকেট, গরম মোজা আর হেভি বুটস্—ক্রেপ সোলের। তবে শর্মিলার দরকার নেই। ও-তো আর পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছে না। তবে জন্‌কে বলে দাও ও যেন তৈরি হয়ে আসে। ওরা যেখানে থাকে সেখানে এসব তো রোজকার কাপড়-জামার মধ্যে পড়ে।

লান্চ হল শ্নিৎজেল দিয়ে—বিজয় আর রুদ্র। মেয়েরা স্মোক্‌ড স্যালমন স্যালাড। লান্চের পরে শপিং। মেয়েরা এত জোর করল যে বিজয় আর রুদ্রকে যেতেই হল। হোটেলে ফিরতে ফিরতে বাজল সাড়ে চারটে। এবার তৈরি হবার পালা—প্রধানত মেয়েদের। বিজয় আর রুদ্র অস্ত্রের ব্যাগ খুলল। চারটে ব্রাউনিং নাইন এম এম পিস্তল, দুটো পয়েন্ট থ্রি-টু ক্যালিবারের বেরেটা—ডেরেক আর শর্মিলার জন্য। এছাড়া একটা বেরেটো স্নাইপার রাইফেল, আর দুটো বুলপাস মেশিন কারবাইন। কিছু আর ডি এক্স আর ডেটোনেটারের অর্ডার দিয়ে এসেছে বিজয়, সেগুলো পরের দিন পাওয়া যাবে। আর সবশেষে দুটো স্টান গ্রেনেড আর চারটে হ্যান্ড গ্রেনেড। ওয়েবিং বেল্ট, যাতে ম্যাগাজিন এবং ওয়েবিং বেল্ট, যাতে ম্যাগাজিন এবং গ্রেনেড ঝোলানো যাবে, এবং প্রত্যেকটা অস্ত্রের দুটো করে একস্ট্রা ম্যাগাজিন। খতিয়ে দেখছে, দরজায় নক্। সুস্মিতা ঘরে ঢুকল। বিছানার ওপর ছড়ানো জিনিস দেখে বলল, 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে নাকি?'

'হতেও পারে', গম্ভীর মুখে বিজয় উত্তর দিল।

'তোমার জন্য একটা স্পেশ্যাল জিনিস আছে', বলে বিজয় ব্যাগের সাইড পকেট থেকে একটা ছোটো পিস্তল বার করল—.২৫ এ সি পি বেবি ব্রাউনিং, ছয় রাউণ্ডের ম্যাগাজিন। চার ইঞ্চি লম্বা। যদি হাইবুট পরো, তার মধ্যে ঢুকে যাবে। আর নয়ত, এই নাও অ্যাংকল হোলস্টার। গোড়ালির ঠিক ওপরে বাঁধবে। ট্রাই করো', পিস্তল আর হোলস্টার ধরাল সুস্মিতাকে। সুস্মিতা হোলস্টারটা বেঁধে একটু হাঁটল। না, অসুবিধা হচ্ছে না।

খুব ভাল।

'থ্যাংকস্। এটাকে আমরা বলি 'অ্যাশ-ইন-দ্য-হোল।' যখন আর কিছু থাকে না। তখন এটাই ভরসা। আসলে বস্ সারাক্ষণ তোমার সেফ্‌টি নিয়ে ভাবে কিনা, সেজন্য নিয়ে এলাম।' খুব মিষ্টি গলায় বিজয় বলল। রুদ্র একটা পিস্তল ছুঁড়েই বিজয়কে মারতে যাচ্ছিল, শেষে বালিশ দিয়ে কাজ সারল। সুস্মিতা হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাত্রে 'ত্যু পারী'-তে ডিনার ভালোই হল। ভাঁল মুডে ছিলেন। প্যারিসের ইতিহাস আর বিভিন্ন রইসি পরিবারের স্ক্যাণ্ডাল ব্যাখ্যা করতে করতে সন্ধ্যা পার করে দিলেন। তার আগে অবশ্য ফরাসি কায়দায় মেয়েদের গালে চুমু খেতে আর তাদের সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করতে ভোলেননি। তবে দুজনকে লাগছিলও ভালো। সুস্মিতা একটা কালো রঙের ট্রাউজার-স্যুট আর লাল রঙের হাই-নেক সোয়েটার, আর শর্মিলা ডিপ-গ্রিন জ্যাকেট আর স্কার্ট, ক্রিম সিল্কের স্পটি।

একসময় সুস্মিতা বলল, প্যারিসের ক্রিসমাস দেখা হল না। রুদ্র উত্তর দিল, 'যদি অক্ষত দেহে ফিরতে পারি তাহলে তোমাকে নিউ ইয়ার দেখাব প্যারিসে।' রুদ্রর পা-টা বোধহয় একটু ব্যথা করছিল, মুখটা একটু কুচঁকোল। সেটা লক্ষ্য করে ভাঁল বললেন, 'এনিথিং রং?'

'না। হি হ্যাড আ শার্ক বাইট আ ফিউ ডেজ্ এগো', উত্তর দিল শর্মিলা।

'আঃ। দ্যাট শেখ এফেয়ার।' ভাঁল অনেক কিছুই জানেন বোঝা গেল।

'এনিওয়ে, হাও আর ইউ নাও?'

'অনেকটাই ভালো। তবে মাঝে মাঝে একটু ব্যথা করে।' সুস্মিতা একটা হাত রাখল রুদ্রর হাতের ওপর, 'ওষুধ খাচ্ছ তো?' মাথা হেলাল রুদ্র।

ঘড়িতে যখন দশটা বাজে, উঠে পড়ল সবাই। ডেরেক আর জন সকালেই আসবে, ওদের নিয়ে আবার সুরেটে যেতে হবে।

২

পরের দিন প্ল্যান মাফিক ডেরেক আর জনকে নিয়ে রুদ্র সুরেটে ঘুরে এল। ফর্মে সই করিয়ে নেবার জন্য। দুপুরবেলা ওদের রেস্ট দিয়ে সন্ধ্যাবেলা রুদ্র-র স্যুইটে বসা হল। ডেরেক আর জন কিছুই জানে না। অন্ধের মতো শুধু শর্মিলার কথা শুনে চলে এসেছে। সমস্ত শোনার পর এবার কীভাবে এগোনো হবে জন জানতে চাইল। ওর গ্লাসে রাম,

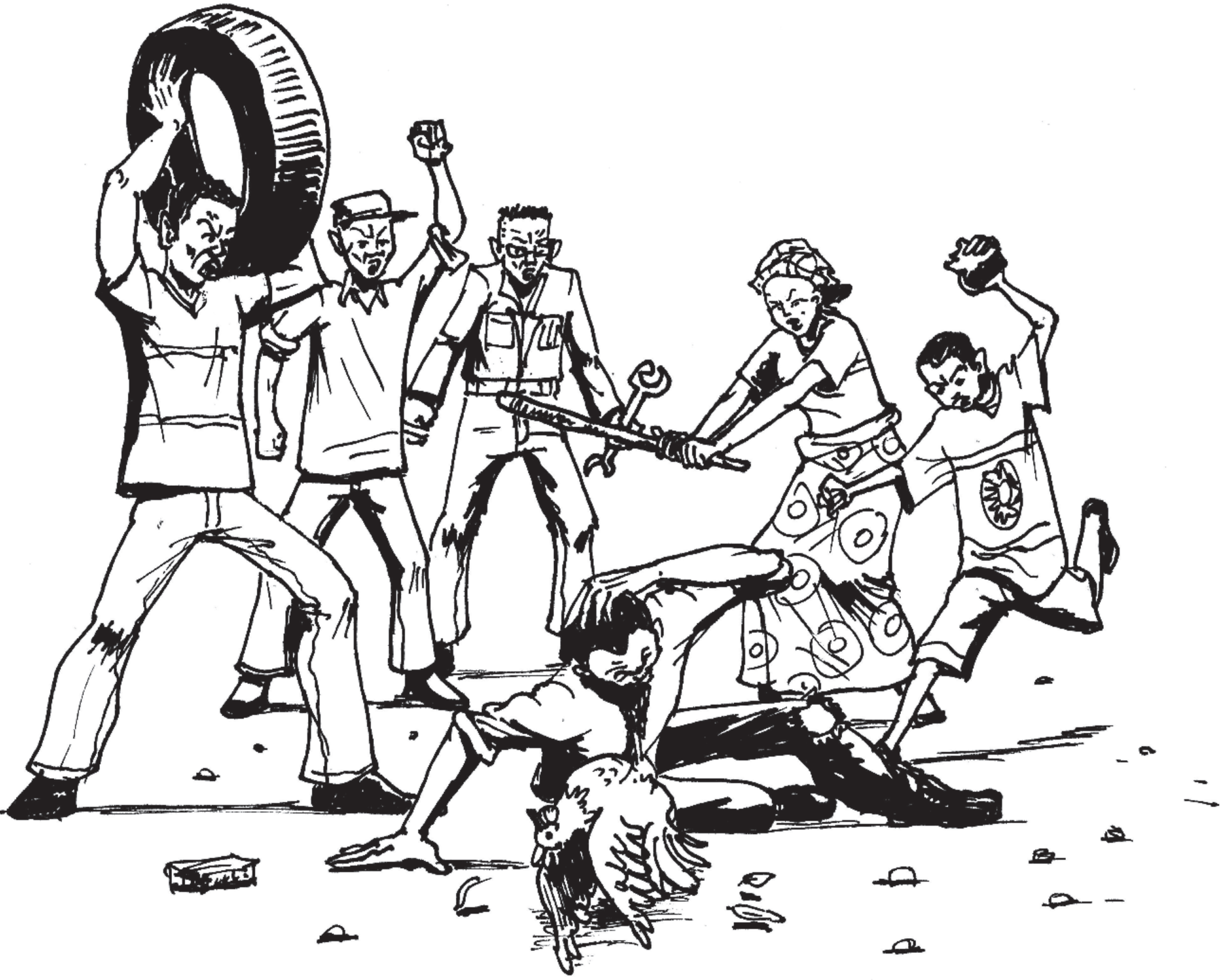

বাকিরা যে যার মতো ড্রিংক নিয়েছে।

‘আমরা তিনদলে ভাগ হব। প্রথম হচ্ছে স্কাউটিং পার্টি। প্রধান দায়িত্ব শাতো সম্বন্ধে খবর জোগাড় করা, শাতোর চার পাশটা সরেজমিনে দেখে আসা।’ রুদ্র বলল। ‘এটা করবে বিজয় আর জন্‌।’

দেন?

সেকেন্ড পার্টি আর আমি সুস্মিতা। আমরা টুরিসেটর মতোই ঘুরে বেড়াব। উই শ্যাল বি ভিজিব্‌ল। কেউ আমাদের পিছনে লেগেছে কিনা, সেটা দেখব। আর জন আর বিজয়ের সঙ্গে মিলে অ্যাটাকের প্ল্যান তৈরি করব, আর অ্যাটাক করা। যেটা আমরা করব ক্রিসমাস ইভ্‌-এ।

গো অন্‌।

থার্ড পার্টি হচ্ছে ডেরেক আর শর্মিলা। ওরা আমাদের ব্যাকআপ। তবে আপাতদৃষ্টিতে ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ওরা অন্য হোটেলে থাকবে, নিজেরা ঘুরে বেড়াবে, যদিও আমাদের কাছাকাছি। কিন্তু ইমার্জেন্সি না হলে ফিজিকালি কন্ট্যাক্ট করবে না। আমাদের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখবে মোবাইলে। এমনকি এখান থেকে কোলমার যাবার সময়ও ওরা আলাদাই থাকবে। বাই দ্য ওয়ে, ডেরেক তুমি নিজের আর শর্মিলার জন্য অ্যামোনিয়া স্প্রে কিনে নিও।

‘দারকার নেই’, বিজয় ওর রুকস্যাক থেকে দুটো স্প্রে বার করে দিল। সেফ্‌টি ক্যাচ দেখিয়ে দিল। রুদ্রর দিকে ফিরে বলল, ‘সাত পাঁচ ভেবে আজ নিয়েই এলাম।’

ভালো করেছ। এনিথিং মোর?

মাথা নাড়ল সবাই। ডিটেল কিছু জানা নেই, সুতরাং কোনো স্ক্রিপ্ট তৈরি করা যাবে না। যা ঘটবে, সময় বুঝে মোকাবিলা করতে হবে। বিজয় আর জন্য গাড়ি নিয়ে বেরোবে সকালেই। সঙ্গে যে সব জিনিস আছে, তা নিয়ে ট্রেনে না ওঠাই ভালো। ওরা সকাল ন’টা নাগাদ বেরিয়ে বেলা তিনটে নাগাদ পৌঁছবে। পাঁচশ’ কিলোমিটার। সোজা

চলে যাবে হোটেল লে মারেশাল, যেখানে আগেরবার রুদ্র ছিল। রুদ্ররা ধরবে সমকাল দশটা চারের টি.জি.ভি, গার দু' লে' থেকে। স্ট্রাসবুর্গে ট্রেন বদলে মালহুসের ট্রেন ধরবে, সেটা কোলমার পৌঁছবে বেলা বারোটা তিপ্পান্নয়ে। ওরাও যাবে লে মারেশাল হোটেলে। শর্মিলা আর ডেরেক ধরবে বেলা একটা পঞ্চান্ন'র ট্রেন। এটা সোজা কোলমার যাবে। পৌঁছবে চারটে একুশ। ওদের হোটেল পিতি ভেনিস। রুদ্ররা একটা গাড়ি ভাড়া নেবে নিজেদের জন্য। ডেরেকরাও তাই করবে। একটা ওয়ার্কিং ডিনার আনিয়ে নেওয়া হয়েছিল আগেই। স্যুপ আর স্যাণ্ডউইচ। খেতে খেতেই কথা হচ্ছিল। খাওয়া শেষে কনিয়াক আনানো হল। ধীরে সুস্থে কনিয়াক শেষ করে উঠে পড়ল সবাই। রাত্রে ভালো করে ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্। কাল থেকে অপারেশন শুরু।

৩

কিছু লোকের অবশ্য ঘুমোতে যাবার দেরি আছে।
উইন্টজারহেমের শ্যাতোতে রবার্ট রেডভিল জেগে। সান্টো ডোমিঙ্গোতে অবশ্য এখন বিকাল, তবু পিটার ফিট্‌জপ্যাট্রিক খাঁচা বন্দি বাঘের মতো পায়চারি করছে।
আর দিল্লিতে বেজেছে রাত তিনটে। কানাড নিজের বেডরুমে। একটার পর একটা ফোন করছে। কলকাতায়, মুম্বাইতে।
ব্রিগেডিয়ার নিজের নতুন বাংলোয়। ঘুম আসছে না, হুইস্কি নিয়ে বসেছেন। রুদ্রদের অপারেশনটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। নিশ্চয় কানাড ছাড়া অন্য কেউ আছে, নইলে পুরো অংকটা দাঁড়ায় না। কিন্তু কে হতে পারে। ব্রিগেডিয়ারের মনটা অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

আর একজন। সেও নিজের বাংলোয়। অনেকগুলো সুতো ফেলেছে চার দিকে। ক্রমশ মনে হচ্ছে হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। বাঘের লেজ ধরে টানলে এরকমই হয়। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। বেডরুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল সে। দিল্লির ডিসেম্বর মাসের শীত। একটু কড়া-ই। মিনিট দশেক দাঁড়িয়েও কোনো লাভ হল না। ঘরে ফিরে এসে একটা সোফার ওপর বসে পড়ল। অবসন্নতা। প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে এপথে পা বাড়িয়েছিল। অন্য সবার মতোই ভেবেছিল, 'লেট্ মি প্লে দিস গেম অলসো।' প্রবাদের বাকি অংশটা ভুলে গিয়েছিল—অ্যান্ড দেন দ্য গেম স্টার্টস প্লেয়িং ইউ।' ওর যখন সেই অবস্থা। বেরবার পথ নেই। যা করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে নিজের জীবন দিয়েই করতে হবে। অতটা সাহস কি আছে ভাবতে ভাবতে সোফাতেই মাথাটা এলিয়ে পড়ল।

৪

রবার্ট রেডভিল। বয়স পঁচাত্তরের ওপর। হাইট সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়ো। মাথাভর্তি সাদা চুল। তীক্ষ্ণ নাক। চোখ দুটো একটু বসা। এখনো ডিনারের ড্রেস বদলানো হয়নি। পুরোনো ব্রিটিশ ফ্যামিলির ছেলে। হ্যারো আর কেমব্রিজ। ডিনারের জন্য ড্রেস করার অভ্যাস যায়নি। কড়া মাড় দেওয়া শার্ট, সাদা বো-টাই, কালো ডিনার স্যুট। আরাম কেদারায় বসে সিগার খাচ্ছে। পাশে টেবিলে রাখা কনিয়াকের গ্লাস। ফিট্‌জপ্যাট্রিকের হাত ঘুরে যে খবরটা আজ ইন্ডিয়া থেকে এসেছে সেটাই রেডভিলের সামান্য চিন্তার কারণ। ইন্ডিয়ানরা নাকি একটা 'হিট-টিম' পাঠিয়েছে—টার্গেট রেডভিল। কী করে ওরা রেডভিলের সম্পর্কে জানতে পারল সেটা পরে ভাবলেও চলবে। মোদ্দা কথা—ওরা জেনেছে। অবশ্য ওদের 'হিট-টিম'কে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত হবে না। আফটার অল্, ইন্ডিয়ান তো! ইজরায়েলি বা রাশিয়ান হলে ভাববার বিষয় হত বইকি। পাশে রাখা একটা মোবাইল তুলে নিল রেডভিল্।
মারসেল?
উই। বঁ সোয়া মঁসিয় রেডভিল। সা ভা?
সা ভা বিয়ঁ। শোনো কয়েকজন ইন্ডিয়ান আমার পিছনে লেগেছে। যতদূর জানি ওদের দলে তিনজন আছে, তার মধ্যে একটা মেয়ে। ব্যবস্থা করতে হবে।
এ আর বড়ো কথা কী! ইন্ডিয়ান তো, সহজেই আইডেন্টিফাই করা যাবে।
তবে সাবধান। ইন্ডিয়ান টুরিস্টও থাকতে পারে। পুলিশের ইনসিডেন্ট না হয়ে যায়।
সেসব কিছু হবে না। ভালো করে বাজিয়ে তবে অ্যাকশন নেব। ওরা কি এসে গেছে?
কাল পরশুর মধ্যে এসে পড়বে মনে হয়।
ঠিক আছে। আপনি ভাববেন না। আর, ও হ্যাঁ, পঞ্চাশ হাজার ইউরো লাগবে। ফিফটি পারসেন্ট কাল পাঠিয়ে দেবেন। রাখছি। বঁ নুই।
ফোনটা পাশে রেখে একটু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রেডভিল। দলে যারা আছে সবাই প্রায় খুনে। ওরা ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। আর পঞ্চাশ হাজার ইউরো তো হাতের ময়লা। সস্তাতেই হয়েছে। ফায়ার প্লেসের আগুনটা নিভে এসেছে। রেডভিল এক চুমুকে কনিয়াকটা শেষ করে উঠে পড়ল।

৫

রুদ্র কোলমারে পৌঁছে একটা নীল রঙের ফোকস্‌ওয়াগন ভাড়া করেছে। সেটাই স্টেশন থেকে চালিয়ে হোটেলে এসেছে। হোটেলের পাশের সরু রাস্তায় রেখেছে। এটার কারণ আছে। হোটেলের পার্কিং-এ গাড়ি ঢোকার এবং বেরোবার রেকর্ড থাকে, সেটা অটোমেটিক। আর অ্যাটেনেডেন্টকে একটু টিপ্‌স দিলেই দেখিয়ে দেবে। নিজেদের স্ট্রলার আর রুকস্যাক নিয়ে চেক-ইন করল। তিনতলায় পাশাপাশি ঘর, ৩০৫ আর ৩০৭। জন আর বিজয়ও এই তলাতেই—৩১১ আর ৩১৩। রুদ্রর প্রথম কাজ সি আর এস-এর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করে আসা। ক্যাপ্টেন রেভোয়া। জাঁদরেল লোক। রুদ্রর কথা শুনলেন, ভাঁলর পাঠানো চিঠি দেখলেন, তারপর

ভাঁলকে ফোন করলেন। আধ মিনিটও কথা হল না, ফোন রেখে দিলেন।

‘ওয়েলকাম টু কোলমার, মঁসিয়। বলুন কী করতে পারি।’ গলার স্বর অনেক নরম। ভাঁলর যে কতটা ক্ষমতা, সেটা বোঝা গেল।

‘এখুনি আমার কিছুই চাই না, তবে আগামী দিন দুয়েকের আপনার সাহায্য দরকার হতে পারে। ছ’সাতজনের একটা স্কোয়াড হলেই হবে। SWAT টিম হলে আরো ভালো।’ রুদ্র বলল। SWAT মানে স্পেশ্যাল ওয়েপনস্ অ্যান্ড ট্যাকটিকস। এরা ট্রেনড্ কম্যান্ডো, হোসটেজ রেসকিউ কিংবা এন্টি-টেররিস্ট অপারেশনে সিদ্ধহস্ত।

পাবেন। আমাকে আধ ঘন্টা সময় দেবেন। এই আমার ফোন নম্বর। পার্সোনাল।

‘মার্সে বুক মঁসিয়।’ রুদ্র আর সুস্মিতা ক্রিসমাস মার্কেট দেখতে বেরোল। কানালের ধারে ধারে স্টল লেগেছে। কোথাও হ্যাণ্ডিক্রাফট্, কোথাও গরমাগরম সসেজ, কোথাও ওয়াইন, কোথাও আবার হাতে বোনা সোয়েটার। বরফ পড়েনি, তবে বেশ ভালো ঠান্ডা। আশা করা যাচ্ছে আগামী দু’তিনদিনে পড়বে। তাহলে সত্যিই হোয়াইট ক্রিসমাস হবে। রুদ্র সুস্মিতাকে বলল, ‘কী করে এই হোয়াইট ক্রিসমাস ব্যাপারটা এল জানি না। বেথলেহেমে তো বরফ পড়ে না।’

‘কে জানে’, সুস্মিতার উত্তর, ‘যীশু যে ওই দিনই জন্মেছিলেন তার কোনো প্রমাণ আছে? অর্থডক্স ক্রিশ্চানরা তো জানুয়ারির সাত তারিখে ক্রিসমাস মানে।’

কথা বলতে বলতে একটা ‘মাল্ড ওয়াইনের’ স্টলের সামনে এসে পড়ল ওরা। মাল্ড ওয়াইন মানে মশলা দেওয়া গরম রেড ওয়াইন। সুস্মিতা চারদিকে দেখছে। আজকে ও পুরোপুরি ট্যুরিস্ট। গায়ে মোটা রঙচঙে নরওয়েজিয়ান প্যাটার্নের পুলওভার, কালো স্ল্যাকস্ আর হাঁটু অবধি বুট। রুদ্র জ্যাকেট, জিনস্ আর পুলওভার। জ্যাকেটের তলায় শোল্ডার হোলস্টারে ব্রাউনিং। সুস্মিতাই খেয়াল করল লোক দুটোকে। কালো জ্যাকেট আর কালো প্যান্ট পরা। দাড়ি কামায়নি মনে হয়। একজন ষণ্ডামার্কা, আর একজন বেঁটে, একটু রোগা মতো। দুজনেরই মুখ কীরকম চোয়াড়ে। সুস্মিতা রুদ্রকে একটু ঠেলা মেরে বলল, ‘লোক দুটোকে দেখেছ?’

‘দেখেছি’, লোক দুটোর দিকে না তাকিয়েই বলল রুদ্র, ‘আরো দুটো আছে।’ ইতিমধ্যে স্টলের সামনে ভিড় একটু বেড়েছে। ভিড়ের চাপে একটু পাশে সরে যেতে বাধ্য হল ওরা। এ লাইনে এটাই শেষ স্টল। এরপর একটা আধা অন্ধকার গলি, তারপর আবার স্টল। এরপর একটা আধা অন্ধকার গলি, তারপর আবার স্টল। পুরো ক্যানালের ধারগুলো আলো দিয়ে সাজানো। ফলে যেখানে আলো পড়ছে না, সেখানে অন্ধকার আরো গাঢ় মনে হচ্ছে। অন্য দুটো লোক খানিকটা এগিয়ে। রুদ্র জায়গাটা ঠাওর করার চেষ্টা করল—কোনো একটা ল্যাণ্ডমার্ক। দেখল অন্য লোকদুটো যেখানে তারপাশেই একটা বিস্ত্রো (রেস্টুরেন্ট)। নাম লেখা—‘লে পিতি বিস্ত্রো’। রুদ্র ওয়াকি-টকির বোতাম টিপে বিজয়কে নির্দেশ দিল। হোটেল থেকে ওরাও বেরিয়েছে, এখন এই লোক দুটোকে ফলো করবে।

কথা শেষ করে পিছন দিকে ঘুরে দেখে সুস্মিতা নেই। পাশের গলির ভিতরে ঢুকল দৌড়ে।

সুস্মিতা রুদ্রকে কথা বলতে দেখে সামনের স্টলটার দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ পিছন দিক থেকে একজন ওর মুখটা চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওকে গলিতে ঢোকাল। ততক্ষণে পাশের লোকটা একটা ছুরি বার করেছে। সুস্মিতাকে সামনের দিকে ঘোরাতে যেতেই সুস্মিতা বাঁ হাতের আঙুল সোজা ঢুকিয়ে দিল ষণ্ডা মার্কা লোকটার চোখে। লোকটা একটা অস্ফূট আর্তনাদ করার আগেই ডান পায়ে লোকটার দু’পায়ের মাঝখানে একটা লাথি। রোগা লোকটা এগিয়ে এসেছে, ছুরিটা বাগানো, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চাপা গলায়, বলল, ‘আই উইল গেট ইউ ফর দ্যাট, বিচ্।’

‘নো ইউ ওন’ট।’ লোকটা যতক্ষণে কথাগুলো বলেছে, ততক্ষণে সুস্মিতা অ্যাংকল হোলস্টার থেকে পিস্তল বার করে লোকটার প্রায় মাথায় ঠেকিয়ে একটা ফায়ার। ছোটো ক্যালিবারের পিস্তল হলে কী হবে, লোকটার কপালটা ফেটে চৌচির। রক্ত ছিটকে পড়ল চারদিকে। নিজের দিকে তাকাল সুস্মিতা। ছুরিটা বিঁধেছে বুকের ঠিক নীচে। ভাগ্যিস পুলওভারটা খুব মোটা। বেশি ঢুকতে পারেনি মনে হয়, অন্তত কিছু মনে হচ্ছে না। ষণ্ডা মার্কা লোকটা এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। নিজের পিস্তলটা সবে বার করেছে, ওর পাশ থেকে রুদ্রর গলা, ‘ড্রপ দ্য পিস্তল অর ইউ আর ডেড্।’ লোকটার হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে গেল। লোকটা তখনো একটু টলছে। রুদ্র এক পা এগিয়ে নিজের পিস্তলের বাঁট দিয়ে লোকটার মাথায় এক বাড়ি। লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সুস্মিতার দিকে তাকিয়ে রুদ্র বলল, ‘সরি, তোমার দিক থেকে চোখ সরে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। লেগেছে কোথাও?’

ঠিক বুঝতে পারছি না। ছুরি তো মেরেছে, কিন্তু ঠিক কতটা...

ঠিক আছে, দেখছি। কিন্তু আগে এদের একটা ব্যবস্থা করি...

মরা লোকটার হাতে তখনো ছুরিটা ধরা। রুদ্র সাবধানে ওদেরই রুমাল দিয়ে ছুরিটা ধরে সেটা বসিয়ে দিল ষণ্ডাটার পেটে। ষণ্ডা লোকটার পিস্তলটাও ওই একই রুমালে ধরে ক্যানালের ধারে গিয়ে রুমাল দিয়ে পিস্তলটা জড়িয়ে দুটোকেই জলে ছুঁড়ে ফেলল। ফিরে এল সুস্মিতার কাছে। সুস্মিতা ততক্ষণে গলির আরো ভিতরে একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে গিয়ে সোয়েটার তুলে নিজের ক্ষত দেখছে। রুদ্র দেখল, তারপর নিজের পার্স থেকেএকটা স্টিকিং প্লাস্টার বার করে লাগিয়ে দিল।

থ্যাংক গড্। খুব বেঁচে গেছ। এবার থেকে আরো সাবধান হতে হবে আমাদের।

আমার একটা ব্যাপারে খট্কা লাগছে। এটা কি সিম্প্‌ল অ্যাটেম্পটেড্ রেপ আর মাগিং? না অন্য কিছু?

বলতে বলতে ওরা বডি দুটোর কাছে চলে এসেছে। রুদ্র ষণ্ডা লোকটার গলায় পালস্ দেখল। চলছে। বাঁচা গেল। ঠাণ্ডা মাথায়

লোকটাকে মেরে ফেলার ইচ্ছা ছিল না রুদ্রর। কাছেই সুস্মিতার হ্যান্ডব্যাগটা পড়েছিল। ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় ছিটকে গেছে। সেটা তুলে নিয়ে সুস্মিতার হাতে দিতে দিতে বলল, 'আমার মনে হয় অন্য কিছু। একটা বা দুটো লোক রেপ করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু চারটে লোক একসঙ্গে—নাঃ, অংক মিলছে না।'

এর মানে কী বুঝতে পারছ? দিল্লি থেকে আমাদের আসার খবর লিক্ হয়েছে। ব্রিগেডিয়ারকে ইমিডিয়েটলি জানানো দরকার।

একবার পিছনে তাকাল রুদ্র। ভাগ্য ভালো থাকলে পুলিশ ভাববে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরেছে। সুস্মিতার হাতটা ধরল রুদ্র। একটু কাঁপছে। স্বাভাবিক রিঅ্যাকশন। ভালো। সুস্মিতা প্রফেশনাল কিলার নয়। সেও ভালো। রুদ্র হাতটা একটু জোরেই চেপে ধরল। সুস্মিতা কিছু বলল না। একটু হাসবার চেষ্টা করল, ঠিক হল না।

হোটেলে ফিরে চলল ওরা। রুদ্র অলার্ট। চোখ সারাক্ষণ ঘুরছে। একসময় ওয়াকি-টকি অন্ করে বিজয়কে বলল, 'টু ডাউন। তোমার কি খবর?'

আমরা লোকদুটোকে খুঁজে পেয়েছি। আগ্‌লি কাস্টমার্স। লোকদুটো এগিয়ে গিয়েছিল। এখন ফিরে আসছে। কী করব?

ফলো করো। দ্যাখো কোথায় যায়। দরকার হলে অ্যামবুশ করবে। রজার অ্যাণ্ড আউট।

রুদ্র একবার ভাবল ডেরেক আর শর্মিলাকে পুরো ঘটনাটা বলবে। কী ভেবে বলল না—এখুনি বললে ওরাও চিন্তিত হয়ে পড়বে। কোনো লাভ নেই। শুধু মোবাইলে ওদের বলল, 'সাবধানে থাকো। একদল লোক জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোধহয় আমাদের খুঁজছে। চোখ-কান খোলা রেখ।'

মোবাইল বন্ধ করে দেখল সুস্মিতা অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। হোটেলে পৌঁছে সুস্মিতাকে বলল, 'যাও, চেঞ্জ করো, সোয়েটারে রক্ত লেগে থাকতে পারে। অ্যান্ড টেক আ শাওয়ার। ভালো লাগবে।'

মাথা হেলিয়ে সুস্মিতা নিজের ঘরে ঢুকে গেল। কী ভেবে দরজার চেনটা লাগিয়ে দিল।

রুদ্র নিজের ঘরে গিয়ে ব্রিগেডিয়ারকে ফোন করল, 'স্যার, একটা ঘটনা ঘটেছে', বিবরণ দেবার পর নিজেদের সন্দেহটা বলল, 'আমাদের মধ্যে কেউ তো কিছু বলেনি, তাহলে হয় অফিস থেকে কোনোভাবে লিক হয়েছে অথবা...' কথাটা উহ্যই রাখল রুদ্র। ব্রিগেডিয়ার যা ইচ্ছা ভাবতে পারেন, কিন্তু এটা ওদের জীবননাশের ব্যাপার। চাগিয়ে রাখলে বস্ নিশ্চয় কিছু একটা করবেন। হঠাৎ একটা কথা মনে হল। ব্রিগেডিয়ার তখনো ফোন ছাড়েননি, 'স্যার, একটা পসিবিলিটি আছে।'

'বলো।' ব্রিগেডিয়ারের গলাটা গম্ভীর। খবরটা যে ওঁকে আঘাত দিয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহ।

'হুঁ।' তবে এবারের হুঁটা অনেক নরম। একটু শান্ত হয়েছেন মনে হল। তারপর বললেন, 'খুব ডেলিকেট ব্যাপার। তোমরা যে যাচ্ছ সেটা পি এম বা হোম মিনিস্টারও জানেন না। যাক্...দেখছি আমি কী করা যায়। ডি-ডে কবে?'

'পরশু। কাল সুস্মিতা আর আমি হেলিকপ্টার থেকে সার্ভে করব, জন আর বিজয় গ্রাউন্ড লেভেলে।'

'ও-কে। টেক কেয়ার।' ফোন কেটে গেল।

দরজায় নক্ পড়তে উঠে দরজা খুলল। সুস্মিতা।

কী ব্যাপার?

সুস্মিতা সোয়েটার বদলেছে। এখন একটা নীল রঙের সোয়েটার, ওপরে জ্যাকেট।

বসতে পারছি না। অস্বস্তি লাগছে। চল, একটু বাইরে যাই।

'ঠিক আছে। ভিতরে এস। ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে। বলছি। একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। বাথরুমে ঢুকল রুদ্র। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ও ডি কলোন লাগল। ওর খুব পছন্দের 'নং ৪৭১১', সব জায়গায় পাওয়া যায় না। গন্ধটা খুব ভালো, কিন্তু মিনিট পনেরোর বেশি থাকে না। ঘরে এসে দেখল সুস্মিতা জলের জাগ্‌টা প্রায় শেষ করে ফেলেছে। স্ট্রেসের আর একটা চিহ্ন।

'চলো', বলে দরজাটা খুলল। সুস্মিতা এলে দরজাটা টেনে দিল। লবি থেকে বেরিয়ে কাছের একটা বিস্ত্রোতে গিয়ে বসল ওরা। কফি আর ব্র্যান্ডি এল। আটটা বাজে। ডিনারও করা দরকার। প্রথম কফিটা শেষ হবার পর সুস্মিতা আর এক রাউন্ড কফি আর ব্র্যান্ডি চাইল। রুদ্র একবার আড়চোখে দেখল ওকে। একটু পরে দেখা গেল বিজয় আসছে। খুবই সাধারণভাবে, যেন এরকম জায়গায় একটা ভারতীয় কাপ্‌লকে দেখতে পেয়ে ভারতীয় হিসাবে খুব খুশি হয়েছে, ওদের টেবিলের কাছে এসে 'মে আই?' বলে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

একটু পরেই জনকে দেখা গেল। বেশ একটু দূর থেকেই, 'হাই দেয়ার, মেট্', বলে চেঁচাল। বিজয় হাত তুলে ডাকল ওকে, 'কাম ওভার, অ্যাম সিটিং উইথ দিজ্ গুড পিপ্‌ল।' জন এল, সবাই উঠে হাত মেলাল, যেমন প্রথম পরিচয়ে হয়ে থাকে। বিজয় সবার জন্যে ড্রিংকস্ অর্ডার করল, 'দিস ইজ্ অন মি ফোকস্।' জোর গলাতেই বলল। তারপর গলা নীচু করে রুদ্রকে বলল, 'তুমি ইনস্ট্রাকশন দেবার পর কী হল? কথাই তো হল না।' কী ঘটেছে সেটা শোনার পর জন বলল, 'ব্যাক-আপ হিসাবে আমাদের একটু কাছাকাছি থাকা উচিৎ ছিল।'

সে যাকগে। লেট ইট বি। তোমরা কি করলে সেটা বল।

'আমরা বিস্ত্রোটার সামনে পৌঁছে দেখি কেউ নেই। কী করব ভাবছি, এমন সময় দেখি লোক দুটো আসছে। উই ডিসাইডেড টু ট্যাকল্ দেম্ সেপারেটলি।' জন বলল।

'হ্যাঁ। ওরা তো তোমাদের ফলো করছিল। আমাদের তো দেখেনি। সেই সুযোগটাই নিলাম আমরা। জন একটু এগিয়ে গেল, আমি পিছনে। লোকদুটো ঠিক পাশাপাশি হাঁটছিল না। একজন আগে ভিড় দেখতে দেখতে যাচ্ছিল, আর অন্যজন বেশ কয়েকটা পা পিছনে, সব স্টলগুলোতে উঁকি মারছে। জন প্রথম লোকটার পিছনে গেল, আর আমি দ্বিতীয় লোকটার পিছনে।' বিজয় থামল। অর্ডার এসে গেছে।

জনের জন্য রাম, রুদ্র আর বিজয় হুইস্কি আর সুস্মিতার আইরিশ কফি। এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে বিজয় আবার শুরু করল, ‘ওই গলিটার কাছে এসে লোকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, তারপর গলিতে ঢুকল। পিছন পিছন আমিও। দেখি দুটো বডি পড়ে আছে। সেটা যে তোমাদের কাজ সেটা জানতাম না। যাই হোক্ লোকটা নীচু হয়ে কাছ থেকে দেখতে গেল। আর আমিও ওর ঘাড়ে আমার কম্যাণ্ডো নাইফ। কোঁক করার সময় পায়নি।’ বিজয়ের মুখে একটা বিজয়ীর হাসি।

‘কখনো কাউকে জ্যান্ত বন্দি করার কথা ভেবেছ?’ সুস্মিতা মন্তব্য করল।

কী লাভ? খাই খরচা দিতে হয় তাহলে।

রুদ্র তাকাল জনের দিকে। জন এমনিতে কম কথার লোক। কিন্তু বাকিরা ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, ‘আমার ঘটনা আরো ছোটো। আমার লোকটা একটু ক্যানালের ধারে চলে গিয়েছিল। একটু ধার দিয়ে হাঁটছিল। মোবাইল বার করে রিং করল। বোধহয় উত্তর না পেয়ে হঠাৎ ঘুরে এল। আমার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল।’

‘তারপর?’ সুস্মিতার হাতে কাপ ধরা। কফি একটু ছলকে গেল মনে হল।

‘তারপর আর কী? আমার হাতে আমার সেলরস্ নাইফটা ছিল।’

জনের সে লরস্ নাইফের কথা সবাই জানে। বছর কুড়ি আগে লিভারপুলের একটা বারে আর একজনের সঙ্গে হাতাহাতি করে তার নাইফটা কেড়ে নিয়েছিল। আধ হাত লম্বা, তিমির হাড়ের বাঁট। একমাত্র নাবিক ছাড়া আর কারো কাছে থাকা বে-আইনি। রামটা শেষ করে আর একটা অর্ডার দিল জন। ‘নাইফটা সোজাই ধরা ছিল, লোকটা তার ওপর ঝাঁপিয়েই পড়ল বলা যায়।’ হাত নেড়ে সবাইকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, ‘আমি আমার নাইফকে বলেছি, তোমার কোনো দোষ নেই। কেউ যদি তোমার ঘাড়ে এসে পড়ে, তুমি আর কী করবে। কেউ যদি সাপের ল্যাজে পা দেয়, সাপ তো তাকে কামড়াবেই। সাপের কী দোষ, বলো?’

‘সে তো বটেই। তোমার নাইফের কোনো দোষ নেই। তা বডি কী করলে?’ শুকনো গলায় রুদ্র বলল।

‘আস্তে করে প্যারাপেটে উল্টো করে শুইয়ে দিলাম। এমনিতে দেখলে মনে হবে মাতাল।’

ফোর ডাউন। কোলমার পুলিশের ক্রিসমাস ভালোই হবে। চার চারটে ক্রিমিনাল একসঙ্গে।’ বিজয় হেসে ড্রিংক শেষ করল। ‘চলো, লেট আস গো ফর ডিনার। ন’টা বাজে।’

‘আমার মনে হয় আমরা হোটেলেই ফিরে যাই। ওখানেই সবাই থাকি, সুতরাং একসঙ্গে ডিনার করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।’ সুস্মিতা সাজেস্ট করল।

হোটেলে রওনা হল ওরা।

৬

মার্সেল চিন্তায় পড়েছে। পিয়ের, টম, স্যাভঁ আর জ্যঁ, কারোরই কোনো খবর নেই। ঘন্টা তিনেক হল। সবারই মোবাইল বেজে যাচ্ছে। একজনের মোবাইলের ব্যাটারি ডাউন হতে পারে, সবার তো হবে না। উত্তরটা পেল আরো এক ঘন্টা পরে।

মাঝ রাতের টিভি বুলেটিন। পুলিশ পেট্রল ক্যানালের পাশের একটা গলি থেকে তিনটে বডি উদ্ধার করেছে। একজন মরেছে গুলিতে আর বাকি দু’জন ছুরিতে। একটা লোকের একটু জ্ঞান ছিল, কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই মারা গেছে। লোকগুলোর নাম জানা গেছে—পিয়ের র্মাতঁ, ফ্রেঞ্চ। টম মিলার, ব্রিটিশ, ফ্রাসোঁয়া স্যাঁভ, ফ্রেঞ্চ। তিনজনেই ঘাগু ক্রিমিন্যাল। পুলিশের সন্দেহ দুটো গ্যাংয়ের মধ্যে শত্রুতাই এর কারণ। আরো পরে একটা বুলেটিন, জ্যাঁ এস্কেরিয়ো বলে একজন ক্রিমিনালের বডি পাওয়া গেছে ক্যানালের প্যারাপেটের ওপর। পেটে ছোরা মারা হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েক ঘন্টা আগে। পথযাত্রীরা মাতাল ভেবে কেউ কিছু বলেনি। রাত বারোটার পর একজন পেট্রোরলম্যানের সন্দেহ হওয়াতে ওটা যে মার্ডার সেটা জানা যায়।

মার্সেলের মনে এই প্রথম একটু ভয় হল। আর বাঘের ভয়ের সময়ে সন্ধে হওয়ার মতো তখনই ফোনটা বাজল।

রেডভিল।

বঁ সোয়া, মঁসিয়।

নট্ সো মাচ ‘বঁ’ এ্যাবাউট ইট্। দেয়ার ইজ্ নাথিং গুড্ অ্যাবাউট দিস্ ইভনিং। নিউজ দেখেছ?

দেখেছি।

আমার পঁচিশ হাজার ইউরো জলে গেল।

না, না। আমার আরো লোক আছে।

থাক, তোমার লোকেদের দৌড় বোঝা গেছে। এবার যা করার আমি নিজেই করব। বোঝাই যাচ্ছে এই হিট স্কোয়াডকে আমরা আণ্ডন্ডার-এস্টিমেট করেছিলাম।’ দেবার মতো কোনো উত্তর মার্সেলের নেই। শুকনো গলায় বলল ‘গুড্ নাইট, মঁসিয়।’

‘অ্যান্ড ব্যাড নাইট্মেয়ারস্ টু ইউ, ডিয়ার বয়’, সবথেকে শ্লেষাত্মক অক্সব্রিজ অ্যাকসেন্টে বলল রেডভিল।

ফোন কেটে গেল।

৭

ক্রিসমাস ইভ্। সারা শহর আনন্দে মেতে উঠেছে। ক্যানালের ধারের স্টলগুলোতে অসম্ভব ভিড়। এই শহরে আরো ক্রিসমাস মার্কেট আছে—অন্তত গোটা পাঁচেক—কিন্তু এখানেই সবথেকে বেশি ভিড়। খাবারের স্টলগুলোতে বেশি। জার্মান শ্নীৎজেল, স্প্যানিশ পাইয়া, পোলিশ সসেজ—কী নেই। হরেক রকম চিজ্ আর সসের সম্ভার। গ্রামের বানানো চিজ্ নিয়ে এসেছে কেউ, কেউ বা গরম ওয়্যাফ্ল, আর কেউ সদ্য রোস্ট করা মুরগি পরিবেশন করছে। লোকদের জামাকাপড়েও আজ রঙের বাহার। যখন সাতটা বাজে, বরফ পড়তে শুরু করল। লোকেদের আনন্দ যেন তিনগুণ বাড়ল। রুদ্র হোটেলের

জানলা দিয়ে বাইরের বরফ পড়া দেখল। প্রথমটা সি.আর.এসের মঁসিয় রেভোয়াক। দ্বিতীয়টা বিজয়ের ঘরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বিজয়, জন আর সুস্মিতা এল। ডেরেক আর শর্মিলাকে আগেই ফোন করা হয়ে গিয়েছিল, ওরাও কিছুক্ষণের মধ্যে এসে হাজির। সবাই বসলে রুদ্র শ্যাম্পেন খুলল, 'হিয়ারস্ টু আ হোয়াইট ক্রিসমাস, অ্যান্ড আ হ্যাপি ওয়ান।'

গেলাস তুলল সবাই।

'ওকে, পিপল। হিয়ার ইজ্ দ্য প্ল্যান। সুস্মিতা আর আমি শ্যাতোর মেন গেট দিয়ে ঢুকব। কীভাবে ঢুকব সেটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়। আশা করছি অক্ষত শরীরেই ঢুকব। কেননা রেডভিলের যেমন জানা দরকার আমরা ওর অপারেশন কতটা পেনিট্রেট করেছি, আমরাও ওর কাছ থেকে একটা কনফেশন চাই। সুতরাং সামনা-সামনি হওয়া দরকার। বলাই বাহুল্য রেডভিলের সিকিউরিটিতে কোনো কমতি থাকবে না। সেটা বুঝেই আমাদের এগোতে হচ্ছে। গার্ড ডগ তো থাকবেই, নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণে আর্মড্ গার্ডও থাকবে। আমাদের সৌভাগ্য যে বরফ পড়ছে। ওয়েদার রিপোর্ট বলছে একটু রাতে আরো বেশি পড়বে। যত জাঁদরেল গার্ডই হোক, এত তুষারপাতের ভিতর পেট্রলিং-এর উৎসাহ খুব বেশি থাকবে না।

জন আর বিজয় এই সুযোগটাই নেবে। ওরা শ্যাতোর পিছন দিকের পাহাড় থেকে শ্যাতোয় পেনিট্রেট করবে। ওরা আজ গিয়ে সব সার্ভে করে এসেছে। তবে এই বরফে...' ওদের দুজনের দিকে তাকাল রুদ্র।

'চিন্তা কোরো না। আজকের জন্য আমরা একটা ফোর বাই ফোর ভাড়া করেছি। স্নো-চেন লাগানো। আমরা ঠিক পৌঁছে যাব।'

শ্রাগ করল রুদ্র। শর্মিলা বলল, 'আর আমরা?'

'তোমাদের আর আলাদা থাকার প্রয়োজন নেই। আজই শেষ রাত্রি। তোমরা নিজেদের গাড়ি নিয়ে এইখানে পৌঁছবে...' ডেরেকের হাতে একটা ম্যাপের প্রিন্ট আউট দিল। এক জায়গায় ক্রস মারা। 'তোমাদের সামনে দিয়ে একটা পুলিশ ট্রাক যাবে। তোমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আর বিজয়কে ওয়াকি-টকিতে বিপ করবে। দুটো বিপ্। মাইকের স্যুইচ দুবার অন্-অফ্ করবে, ব্যাস।' জনের দিকে ঘুরে বলল, 'তোমরা যখন পেনিট্রেট করবে তখন আমাকে আর ডেরেককে বিপ্ করবে। এখন টাইমিং ঠিক করো, ঘড়ি সিনক্রোনাইজ করো। আমার ঘড়িতে এখন সাতটা বাইশ...।'

সবাই নিজেদের ঘড়ি সেট করল।

আশা করছি সাড়ে দশটা নাগাদ জন আর বিজয় শ্যাতোতে ঢুকতে পারবে। দশ-পনেরো মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে। ওদের প্রধান কাজ হচ্ছে রেডভিলের স্টাডি লোকেট করা। আমরা স্টাডিতে ঢোকার পর যদি গার্ড আসে তাদের শেষ করা। বাকি তো আমি তোমাদের বলেইছি। তোমাদের পিস্তলে সাইলেন্সার আছে তো? সরি ফর আস্কিং আ স্টুপিড কোয়েশ্চেন।

'আছে।' সংক্ষিপ্ত উত্তর বিজয়ের।

গুড্। এই নাও শ্যাতোর ফ্লোর প্ল্যান। রেভোয়া পাঠিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে নিয়ে। স্টাডি ইট। অবশ্য কোনটা রেডভিলের কাজের ঘর সেটা জানা নেই।

আমি আর শর্মিলা কি শুধুই দর্শক? সব রিস্ক তো তোমরাই নিচ্ছ।

'না, তোমরা শুধু দর্শক নও। তোমার নিজস্ব একটা রোল আছে। মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। তোমাকে গেটের সেন্ট্রিদের শ্যুট করে গেট খুলে দিতে হবে, যাতে সি.আর. এস যখন আসবে, সোজা ভিতরে ঢুকে যেতে পারে, সময় নষ্ট না করে। আর যদি কোনো কারণে আমাদের প্ল্যানে গণ্ডগোল হয় তাহলে আমাদের এক্সফিলের (পালানোর) একটা রাস্তা খোলা থাকবে। তোমরা অপারেশন করবে সুস্মিতা আর আমি শ্যাতোর ভিতরে যাবার পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট পরে। পাঁচ মিনিটের মার্জিন এ জন্য রাখছি যে বেশি বরফ পড়তে পারে, তোমাদের গাড়ি লুকিয়ে রাখতে সময় লাগতে পারে, আনসীন ফ্যাক্টর...। তুষার পাতের মধ্যে শ্যুট করা অবশ্য সহজ হবে না, তবে বিজয় তোমাকে স্নাইপার রাইফেল আর নাইট-সাইট দেবে। এনিথিং মোর?'

নো রুডি। দ্যাট ইজ ক্লিয়ার এনাফ। কনসিডার ইট ডান্। আর বরফ পড়া নিয়ে ভেবোনা। এরকম ওয়েদার কন্ডিশনে নেকড়ে মেরেছি। ডেরেক পাকা হান্টার। নিউফাউণ্ডল্যান্ডে অনেক জন্তুই ওর শিকার হয়েছে।

ফাইন, লেট আস্ হ্যাভ আ লাস্ট ড্রিংক টুগেদার।

৮

উইন্টারজহেম থেকে বাঁদিক ঘুরে যখন পাহাড়ি রাস্তায় পড়ল জন আর ডেরেক তখন আটটা। ওই রাস্তায় পড়তেই গাড়ির স্পিড কমাতে হল। রাস্তা সরু, তার ওপর অন্তত ছ'ইঞ্চি বরফ। ভাগ্যিস সদ্য পড়েছে, এখনো জমেনি, তাই গাড়ি স্কিড করছে না। দুপাশে পাইনের গাছগুলো ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এ রাস্তায় এমনিতেই খুব কম গাড়ি চলে। দশ-বারো কিলোমিটার আগে গিয়ে রাস্তাটা ডি ৪১৭ নম্বর লোকাল হাইওয়েতে পড়েছে; সে রাস্তায় অবশ্য গাড়ি যাতায়াত করে, তবে কম। বিজয়দের যেতে হবে অন্তত পাঁচ কিলোমিটার। তারপর আবার বাঁদিক ঘুরে যেতে হবে শ্যাতোর পিছনে। সে রাস্তা আবার আরো সরু। কতটা বরফ জমেছে কে জানে। গাড়ির চাকায় স্নো-চেন জড়ানো, তাই খুব একটা ভয় নেই। নিজেদের মধ্যে কথা কম-ই হচ্ছে। বিশেষ কিছু বলারও নেই। হেডলাইট জ্বালায়নি বিজয়, ফগ্ লাইট জ্বালিয়েই চলছে।

শ্যাতোর বাঁকটা আরো এক কিলোমিটার আগে। উইন্টারজহেম থেকে পাঁচ কিলোমিটার চলে এসেছে। গাড়ির স্পিড একটু বাড়াল বিজয়। জনকে বলল, 'তৈরি থাক। এর পরের মোড়ের পরই শ্যাতোর টার্ন-অফ্। শত্রু ওখানে কিছু করেও থাকতে পারে।'

'রাইট ইউ আর', বলে নিজের জানলাটা একটু খুলল। বুলপাপের ব্যারেল একটুখানি বার করে রাখল।

এতক্ষণ হিটার চলছিল, জানলা খুলতেই ঠান্ডা হাওয়া একেবারে হাড়

কাঁপিয়ে দিল। মোড় ঘুরতেই দু'শ মিটার মতো আগে দেখা গেল একটা টেম্পোরারি ব্যারিকেড। মধ্যিখানে একটা অরেঞ্জ কালারের রিভলভিং লাইট।

হেডলাইট জ্বালাল বিজয়। রাস্তার দু'দিকে দু'জন ইউনিফর্ম পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে, দু'জনেরই হাতে মেশিন-কারবাইন।

'রং রোড, রং ইউনিফর্ম। এরা রেডভিলের লোক।' বলল জন, 'তুমি তোমার দিকের লোকটাকে ওড়াও, আমি আমার দিকেটাকে দেখছি।'

'রজার। গেট রেডি ফর আ বাম্প', জনের দিকে না তাকিয়েই বিজয় বলল।

গাড়ি আস্তেই আসছিল। লোক দুটো ভাববে গাড়ি থামবে। বিজয় হঠাৎ একটা গিয়ার নিচে গিয়ে অ্যাকসিলারেটর প্রায় পুরোটাই চেপে দিল। গাড়িটা দু' সেকেণ্ডের মতো ইতস্তত করে হঠাৎ একেবারে স্পিড নিল। ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ করে শব্দ করছে। বিজয়ের দিকের লোকটা সরবার চেষ্টা করল, কিন্তু বরফে বোধহয় পা আটকে ছিল। গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ন্যাকড়ার পুতুলের মতো। জন গাড়ি স্পিড নিতেই ফায়ারিং শুরু করেছে। অন্য লোকটাও খুব একটা সাবধান ছিল না, কিছু বোঝবার আগেই শরীরটা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে প্রায়।

বিজয় একটু দূরে গিয়ে গাড়ি থামাল। দু'জনে গাড়ি থেকে নেমে ফিরে গেল ব্যারিকেডটার কাছে। জনের গুলিতে যে লোকটা মারা গেছে তার বডিটা একটু দূরে টেনে নিয়ে গেল পাইনের জঙ্গলে।

বরফ পড়েই চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বডি টেনে নিয়ে যাবার সব দাগ মুছে যাবে। বুলেটের কেসিংগুলোও বরফে চাপা পড়বে। রক্তের দাগও থাকবে না। এটার দরকার ছিল। যদি কেউ চেক্ করতে আসে—আসবেই, কেননা এরা তো আর সময়মতো রিপোর্টিং করবে না। ধরে নেবে অ্যাকসিডেন্ট, হিট-অ্যান্ড রান্। অন্য লোকটাকে খুঁজলেও খুঁজতে পারে, তবে এই তুষারপাতের মধ্যে রাত্রিবেলা তার চান্স কম। এরা প্রফেশনাল সোলজার নয়, মার্সেনারি। সুতরাং খুব একটা উৎসাহ এদের না থাকাই সম্ভব।

আবার গাড়িতে গিয়ে বসল ওরা। বিজয় ঘড়ি দেখল—আটটা বেজে তেইশ। এখনো তো আসল কাজই বাকি। কোনো কথা না বলে গাড়ি চালাল। একটু পরেই শ্যাতোর পিছনের রাস্তার মোড়। টার্ন করে দাঁড়াল বিজয়। কোনো চান্স নেওয়া নেই। ওরা যে এখান থেকে ঘুরেছে তার চিহ্ন মুছে দেওয়া দরকার। গাড়ির চাকার দাগ গভীর। বরফ দিয়ে ভরাট হতে সময় নেবে। পিছনের দরজা খুলে দুটো বড়ো বড়ো পাইনের ডাল বার করল জন। ক্রিসমাস-ট্রি দুটো আজকেই বাজারে কেনা হয়েছে ঠিক এই কথা ভেবেই। ডাল দুটো পিছনের বাম্পারের সঙ্গে বাঁধা হল রাস্তা ঝাড়ু দিতে দিতে যাবে। আলগা বরফ, চাকার দাগ ঢেকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। গাড়ি চলল। এবার খুব সাবধানে। একে রাস্তাটা সরু, অর্ধেক কাঁচা, তার উপর বরফ। উপরন্তু একদিকে গভীর খাত। একটু অসাবধান হলেই...

গুছিয়ে নিজের পাইপ ধরাল জন্। গাড়ির জানলাটা খোলাই আছে তখন থেকে, বাইরের ঠাণ্ডার সঙ্গে নিজেদের অ্যাডজাস্ট করার জন্য। অসুবিধে নেই। আরো দু'বার দাঁড়াতে হল। গাড়ির বনেটের ওপর জমা বরফের জন্য। ওয়াইপার দুটো প্রাণপণ লড়াই করছে, কিন্তু খুব একটা পেরে উঠছে না বরফের সঙ্গে।

'আমাদের জাহাজই ভালো', কথাচ্ছলে বলল জন্।

কেন?

জাহাজের যে কেন্ট রিভলডিং স্ক্রিন থাকে, ওই একটা কাচের ডিস্ক হাই-স্পিডে ঘোরে, বরফ জমতে পারে না।

'ঠিক বলেছ।' নিজের নেভির দিনগুলোর কথা মনে পড়ল বিজয়ের। জীবন বোধহয় একটু–বেশি নয়—সহজ ছিল।

শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাল বিজয়। বাঁ দিকে খাড়াইয়ের ধারে দাঁড়িয়ে নাইট-গ্লাস দিয়ে নীচে দেখল। এ জায়গায় পাশ দিয়েই ওরা আগে গেছে, নীচে শ্যাতো দেখা যাচ্ছে, তিনশো ফুট মতো হবে। যেটা দেখবার চেষ্টা করলছিল, সেটা দেখল আরো ডানদিকে। একটা শক্তপোক্ত অ্যানটেনার থাম। ওটাই ওর ডানদিকে। গাড়িতে ফিরে এসে গাড়িটাকে আরো শ'খানেক মিটার মতো এগিয়ে নিয়ে গেল। এ-ই ঠিক হয়েছে।

গাড়ির পিছনের দরজা খুলে এবার জিনিসপত্র বার করা। প্রথমেই দুটো স্নো-স্যুট। মাথা থেকে পা পর্যন্ত। সাদা রঙের। আজকের ওয়েদারের পক্ষে একেবারে আইডিয়াল। হুড্টা মুখের সামনে এনে দড়িটা টেনে দিল। মুখটা প্রায় ঢেকেই গেল। তারপর চোখে স্নো-গগ্‌লসস, হাতে মোটা গ্লাভস্। ব্রাউনিং পিস্তল স্নো স্যুটের ভিতর। দু'জনেই কাঁধে বুলপাপগুলো ঝোলাল। নাইট-গ্লাস, দুজনেরই। শ্যাতোর প্ল্যানটা পকেটে ঢোকাতে ভুলল না বিজয়।

এবার বেরল একটা অদ্ভুত দেখতে সিলিন্ডার। সামনে থেকে একটা কাঁটা বেরিয়ে আছে, তার ফলাগুলো এখন ভাঁজ করা। এটা একটা কম্প্রেস্‌ড গ্যাস গান। শ্যুট করলে কাঁটা গিয়ে টার্গেটে আটকে যাবে। পিছনে নাইলনের দড়ি ক্ল্যাম্প করা আছে। টানলেই ফলাগুলো খুল গিয়ে টার্গেটে বসে যাবে। টেনে নিলেই হল। ফলাগুলোতে বরাবের টিপ লাগানো, স্লিপ করবে না। হাঁটু গেড়ে বসে বিজয় তাক করল। অ্যান্টেনার থামটার গায়ে লোহার ফ্রেম আছে, তাতে আটকালেই হল। আবারও দেখল শ্যাতোর ছাতটা। অ্যান্টেনার একটু পরেই একটা ঘর মতো। নিশ্চয়ই সেন্ট্রি আছে। মাঝে মাঝেই টর্চ ফেলছে। এই প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে কী দেখতে পাচ্ছে কে জানে। তবে যখন বিজয় বা জন দড়ির ওপর তখন যদি ওপরে একবার টর্চ ফেলে... জনের সঙ্গে কথা বলল বিজয়। ও-ই আগে যাবে। প্রথম কাজ সেন্ট্রিকে সরানো। সরিয়ে দড়ির কাছে আবার এসে দুবার দড়িটা টানবে। জন তখন দড়িতে হাত দেবে।

অ্যাংকর ফায়ার হল, অ্যান্টেনার লোহার ফ্রেমে আটকেও গেল। দড়িটার অন্য দিকটা একটা আংটা দিয়ে গাড়ির শার্সির সঙ্গে লাগিয়ে দিল জন। দড়িটা একবার টেনে দেখল। স্টিল কোরের নাইলন দড়ি। এক টন অবধি ভার সইতে পারে। বিজয় তৈরি ছিল। ওর রিস্টের

সঙ্গে লাগানো স্টিলের হুক্। বালার মতো। হুক দুটো দড়িতে লাগাতে জন্ বলল, 'অল দ্য বেস্ট।'

একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। দড়িটা দুলছে। তার ওপর এই কয়েক মিনিটের দড়ির ওপর একটা পাতলা বরফের আস্তরণ পড়ে গেছে। বিজয় ঝুলে পড়ল। স্টিলের আংটা স্লিপ করে বিজয়ের স্পিড বেড়ে গেল। নাইট-গ্লাস দিয়ে জন দেখছে। স্পিড যেন একটু বেশিই বেড়েছে। এত জোরে গেলে প্রচণ্ড ভাবে অ্যান্টেনার সঙ্গে ধাক্কা খাবে। দমকা হাওয়া ভালোই এল একটা। জন দেখল বিজয় এদিক থেকে ওদিক প্রায় ৩০ ডিগ্রি দুলল। জনের হার্টবিট বেণেড় গেছে। বিপদ বিজয় ভালোই বুঝেছে। প্রথম থেকেই স্পিড ওর কন্ট্রোলের বাইরে। যখন দমকা হাওয়াটা এল, পুরো শরীরটা দুলতে আরম্ভ করল। আংটা সত্ত্বেও ব্যালান্স রাখা প্রায় অসম্ভব। দুলুনিতে একটা হাতের আংটা দড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। বিজয় এখন একহাতে ঝুলছে। সৌভাগ্যবশত হাওয়াটা থেমে গেল। স্পিড-ও কমেছে। বিজয় এখনো এক হাতে ঝুলছে। অ্যান্টেনা এখনো দশ ফুট মতো দূরে। ওই দশ ফুট যেতে বিজয়ের মনে হল প্রায় দশ ঘন্টা কেটে গেল। অ্যান্টেনার কাছাকাছি দড়িটা ঝুলে আছে। আংটা স্লিপ করে বিজয় নীচের দিকে চলে যাচ্ছে। আর ছ'সাত ফুট। বিজয় পুরো শক্তি দিয়ে নিজের শরীরটাকে বেঁকিয়ে অন্য হাত দিয়ে দড়িটা ধরল। আর আংটা নয় গ্লাভস্ পরা হাতেই। তারপর খুব আস্তে আস্তে অন্য হাতের আংটা দড়ি থেকে খুলে আবার গ্লাভস্ দিয়ে দড়িটা ধরল। অ্যান্টেনার গায়ে আস্তে একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল বিজয়।

হঠাৎ টর্চের আলো। সেন্ট্রি বোধহয় দড়িটা দেখতে পেয়েছে। যদিও দড়িটাও এতক্ষণে সাদা, তবুও ব্যাকগ্রাউন্ডে পাহাড়ের কালো ছায়া থাকায় বোঝা যাচ্ছে ওখানে কিছু একটা আছে।

সেন্ট্রি নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল ভালো করে ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে। বিজয়ের হাতে সাইলেন্সার লাগানো ব্রাউনিং। ফট্ করে একটা শব্দ। সেন্ট্রির চোখের স্নো গগলস্ লাল হয়ে গেল। কপালে একটা লাল ফুল।

বিজয় এক মিনিট সময় নিল ধাতস্থ হতে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দড়িতে দু'বার টান মারল। জন তৈরীই ছিল। সেন্ট্রির পড়ে যাওয়াটাও দেখেছে নাইট-গ্লাস দিয়ে। চার মিনিটের মাথায় জন এসে হাজির হল। ওর কোনো অসুবিধা হয়নি। হাওয়া থেমে গেছে, যদিও বরফ পড়া বন্ধ হয়নি।

দু'জনে ধরাধরি করে সেন্ট্রির বডিটা পাঁচিলের ওপাশে ফেলে দিল। তারপর ছাত থেকে নামবার রাস্তা খুঁজল।

বিজয় একটা পেনসিল-টর্চ বার করল। এক জায়গায় একটা কার্নিস মতো, মনে হচ্ছে একটা দরজা। হয়তো নীচে যাবার সিঁড়ি। কার্নিসের নীচে দাঁড়িয়ে স্নো-স্যুট খুলে ফেলল দুজনেই। ওগুলোর আর দরকার নেই। ওয়াকি-টকিতে একটা বিপ্ করে দিল। ঘড়ি দেখল, দশই বাজতে দশ। টাইমের দিক দিয়ে ঠিক চলছে। দরজাটা খুলল জন। পা বাড়াবার আগে প্ল্যানে দেখে নাও আমরা ঠিক কোথায় আছি।

প্ল্যানটা খুলল বিজয়। পেনসিল টর্চের আলোয় ছাতের দরজাটা আইডেন্টিফাই করল। এরকম আরো দুটো আছে, কিন্তু সেগুলো পাশের দিকে। প্ল্যানটা দেখাল জনকে। জন মাথা নাড়ল। সিঁড়িটা নেমেছে শ্যাতোর তিনতলায়। এটা বোধহয় ব্যবহার হয় না। চারদিকে ধুলো আর ঝুল। এটাই স্বাভাবিক। রেডভিল তো একাই থাকে। সুতরাং একতলা আর দোতলাই নিশ্চয় ব্যবহার হয়। এই তিনতলাটাতে আলোও নেই। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই যে প্যাসেজটা যেখানে এখন ওরা—সেটা সোজা গিয়ে তারপর একটা 'T' এর মতো হয়েছে। আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না যে 'T' এর বাকি দুটো হাত ছাত থেকে নামার বাকি দুটো সিঁড়ির কাছে গেছে। 'T'-জংশনে একটা দরজা। এটা দোতলায় যাবার। জংশনে দাঁড়িয়ে দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর দু'জনে দু'দিকে দৌড় দিল। ওই দু'পাশের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে ফিরে আসতে মিনিট চারেক আরো লাগল। আবারও ঘড়ি দেখল বিজয়। দশটা বাজতে এক মিনিট। সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। জনকে ঘড়িটা দেখাল। এখন দুজনের হাতেই বেরেটা বুলপাপ্। দোতলায় নেমে দেখা গেল সব দরজাতেই তালা মারা, শুধু মধ্যিখানেরটা ছাড়া। রেডভিলের নিজস্ব স্যুইট নিশ্চয়। তার উল্টোদিকেই একতলায় আসার সিঁড়ি। স্যুইটের সামনে একটা গার্ড টুলে বসে ঝিমোচ্ছে। নীচে নামতে গেলে ওর সামনে দিয়েই নামতে হবে।

জনের হাতে ওর সেইলরস্ নাইফ। ফিসফিস করে বলল, 'সদ্ব্যবহার করে আসি।' নিঃশব্দে গার্ডের পাশে গিয়ে ওর গলার ওপর দিয়ে ছুরিটা চালিয়ে দিল। খুব একটা রক্ত বেরোবার আগেই বডিটা টানতে টানতে প্যাসেজের অন্য প্রান্তে নিয়ে গেল, যেখানে আলো নেই। একতলায় নামবার সিঁড়ির দুদিকে দুটো থাম। দুজনে থামের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, কারা যেন কথা বলতে বলতে ওপরে আসছে। ক্রিসমাস ইভ্-এ ডিউটি দিতে হচ্ছে, কারোরই মেজাজ ভালো নয়। একজন স্যুইটের সামনের খালি স্টুলটা দেখিয়ে জার্মানে বলল, 'হাতভাগা নিশ্চয় কোথাও ড্রিংক করতে গেছে।'

আর কিছু বলার সময় পেল না। দু'জনের কানের পিছনেই দুটো পিস্তলের নল। দুটো ফায়ারিং-এর শব্দ যেন একসঙ্গেই হল। বডি দুটো পড়ে যাবার আগেই ধরে ফেলল জন্ আর বিজয়। একটা লোক জনের মতো লম্বা, আর একটা বিজয়ের থেকে সামান্য খাটো। বডি দুটো একপাশে নিয়ে গিয়ে লোকদুটোর ইউনিফর্ম পরে ফেলতে সময় লাগল না। এদের হাতে ইজরায়েলি উজি সাব মেশিন গান। নিজেদের বুলপাপ দুটোকে গুড্ বাই বলে গার্ডদুটোর উজি আর একস্ট্রা ম্যাগাজিন হস্তগত করল।

এবার একতলায় নামা। গটগট করেই নামল দুজনে। এসব শ্যাতোতে সামনের দিকে একটা বড়ো হলঘর থাকে, বাড়ির মাঝামাঝি ডাইনিং হল, তার উল্টোদিকে লাইব্রেরি, স্টাডি ইত্যাদি। কিচেন ইত্যাদি পিছনে। হল থেকে উঠে যাওয়া—যাকে বলে গ্র্যান্ড স্টেয়ারকেস, সেটা এখানে নেই। ছোটো শ্যাতো বলেই হয়তো। দোতলার সিঁড়িটা

নেমেছে ডাইনিং হলের উল্টোদিকে। তার বাঁ পাশে একটা ছোটো ড্রয়িং রুম, আর ডানপাশে তাহলে স্টাডি। সেটা কনফার্ম হল এই কারণে যে তার সামনেই দুটো গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় আর জনকে দেখে একজন বলল 'ওয়াল্টার, হানস্, তোমরা ছিলে কোথায়?' বলতে বলতে ওদের মুখ দেখে বলল, 'হু আর ইউ?'

'সার্টেনলি নট ওয়াল্টার অ্যান্ড হানস্', কথাটা বলতে বলতেই লোকটার থুতনির তলায় পিস্তলের ব্যারেলটা ঠেকিয়ে গুলি করল জন। বিজয় অন্য লোকটাকে সুযোগই দেয়নি। প্রথম লোকটা মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকটার মাথায় ফায়ার করেছে। এবার বডি দুটোকে সরানোর পালা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সিঁড়ির তলায় টেনে নিয়ে গেল। এখানে ঝাড়ু, বালতি রাখার একটা কাবার্ড। তারই মধ্যে বডি দুটোকে ঠুসে দিল। নিজেরা দরজার সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বিজয়। এরা অন্য কোম্পানির গার্ড। ওদের না চেনাই সম্ভব। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইল বিজয় আর জন।

রুদ্র আর সুস্মিতার গার্ডরা দরজায় নক্ করল, ভিতর থেকে কেউ সাড়া দিলে দরজা খুলে ওদের ভিতরে যেতে বলল গার্ড।

রুদ্র ঢোকার আগে একবার বিজয়কে দেখল। মুখের কোনো ভাবান্তর হল না।

৯

রুদ্র আর সুস্মিতা মিনিট দশেক আগে পৌঁছেছে। মেন গেটে এসে হর্ন দিতে বন্দুকধারী একজন গার্ড এসে বলল, 'কেন এসেছ?'

'মিস্টার রেডভিলকে গিয়ে বল ইন্ডিয়া থেকে দু'জন এসেছে সুরেটের মঁসিয় ভাঁলর মেসেজ নিয়ে।

'ওয়েট', বলে গার্ড চলে গেল। গার্ড হাউসে গিয়ে ফোন করল বোধহয়। ফিরে এসে বলল, 'ভিতরে এসো। গাড়িতেই বসে থাকবে যতক্ষণ না আমি বলি।' এতক্ষণে আরো একজন গার্ড এসে হাজির হয়েছে। এ-ও আমর্ড্।

প্রথম গার্ড ভিতরে গিয়ে গেট খুলল। আদ্যিকালের ভারী দরজা। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে খুলল। সুস্মিতা বলল, 'লোকটার এত টাকা, একটা ভালো গেট লাগায়নি কেন কে জানে।'

'খেয়ালিপনা। তবে লাগায়নি সেটা আমাদের সুবিধা। ইলেকট্রনিক রিমোট কন্ট্রোলড্ গেট হলে আমাদেরই অসুবিধা হত।' রুদ্র উত্তর দিল। ডেরেক আর শর্মিলার কথা ভেবে চুপ করে গেল সুস্মিতা। আর গার্ড দুজনের জন্য একটা করুণাও হল। ওরা জানে না ওদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। গাড়ি দাঁড়াল পোর্টিকোতে। গার্ড দুজন গাড়ির দু'পাশে এসে বন্দুক উঁচিয়ে ওদের নামতে বলল। ওরা নামলে পরে সার্চ করা হল। সুস্মিতার ব্যাগে কিছু না পেয়ে—মেয়ে বলেই হয়ত—ওর গায়ে হাত দিল না। রুদ্রকে অবশ্য বডি সার্চ করল। ওর ব্রাউনিং পিস্তলটা কব্জা করল।

সুস্মিতার বেল্টের বাক্লের পিছনে লুকোনো মিনিচেয়ার ওয়াকি-টকি, ওর অ্যাংকল হোলস্টারের পিস্তল, দুটোই বেঁচে গেল। রুদ্রর স্পেশাল বেল্ট, যার ভিতরে একটা পাতলা সেরামিকের ছুরি, সেটাও ধরতে পারল না। হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানার একবার গায়ে বোলাল ঠিকই, কিন্তু সুস্মিতার বুটের জিপ্‌টা মেটালের হওয়াতে স্ক্যানারে কিছু বেরল না। আর এটা তো এয়ারপোর্ট নয়, যে জুতো খুলতে বলবে। একজন গার্ড ওদের নিয়ে ঢুকল। ভিতরে আরো দুজন গার্ড। তারা একবার গেটের গার্ডদের জিজ্ঞাসা করল সার্চ হয়েছে কিনা। ওরা হ্যাঁ বলাতে এরা দুজন বড়ো হলঘর দিয়ে রুদ্রদের নিয়ে গেল। গেটের গার্ডরা ফিরে গেল। একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল গ্রুপটা। দরজার পাশে দু'জন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখ দেখে চমকেই উঠল সুস্মিতা, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ পেল না। ওরা ঘরে ঢুকল। সঙ্গে একজন গার্ডও। সে একটা দূরের দেওয়ালের পাশে নিজের সাবমেশিন গান্ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে একজনই। রেডভিল্। ডিনার জ্যাকেট পরা। টেবিলের পিছনে মোটা গদি আঁটা চেয়ারে বসে আছে। সামনে একটা কনিয়াকের গ্লাস—অন্তত তাই মনে হল—আর হাতে একটা জ্বলন্ত সিগার। নিশ্চয় কিউবান। সুগন্ধে ঘরটা ভরে গেছে।

ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। বাই দ্য ওয়ে, মিস্...

সুস্মিতা।

ভেরি স্যুইট নেম। তা, মিস্ সুস্মিতা, তোমার যদি অসুবিধা হয় আমি সিগারটা নিভিয়ে নিতে পারি। কার্টসি কামস্ ফার্স্ট, কী বল, মিস্টার...

রুদ্র।

গুড্। তাহলে আলাপ পরিচয়ের পালা তো শেষই হল। কনিয়াক খাবে? বাইরের বরফের থেকে এসেছ। আর তাছাড়া আজ তো ক্রিসমাস ইভ্।

না বলবো না। তাছাড়া কার্টসি কামস্ ফার্স্ট। হোস্ট ড্রিংক অফার করলে রিফিউজ করাকে আমি অশালীন মনে করি। তাছাড়া, আজ তো ক্রিসমাস ইভ্।

'দ্যাটস্ দ্য রাইট স্পিরিট।' চেয়ার থেকে উঠে পাশের একটা সাইডবোর্ড খুলে দুটো কনিয়াকের গ্লাস বার করল রেডভিল। একটা ডিকান্টারে কনিয়াক রাখাই ছিল টেবিলের এক পাশে। সেটা থেকে দুটো কনিয়াক ঢেলে রুদ্রর দিকে গ্লাস দুটো বাড়িয়ে দিল। রুদ্র একটা গ্লাস সুস্মিতার দিকে বাড়িয়ে দিল।

সুস্মিতা ঘরটা দেখছিল। বেশ বড়ো ঘর। এক পাশে ফায়াব প্লেসে আগুন জ্বলছে। তার সামনে গোটা তিনেক গদি আঁটা চেয়ার। দেয়াল আলমারিতে বই। যে দেওয়ালটাতে গার্ড দাঁড়িয়ে আছে তাতে একটা বিরাট বড়ো ট্যাপেস্ট্রি ঝুলছে। কাছে গিয়ে দেখল সুস্মিতা। হান্টিং সীন। মুখ চোখ নিখুঁত ভাবে বোনা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে বহু পুরনো। রং ফিকে হয়ে গেছে অনেক জায়গায়। রেডভিলকে বলল ট্যাপেস্ট্রিটা দেখিয়ে, 'গোবেলিন?'

'ইয়েস। প্রাইসলেস। তোমার তো রুচিবোধ আছে দেখছি। বসো,

বসো।' ফায়ারপ্লেসের পাশের সোফা দেখাল।

'এবার বলো কী জন্যে দর্শন দিয়েছ', চেয়ারে বসতে বসতে রেডভিল বলল।

সেটা তো তুমিই ভালো করেই জান রেডভিল। আমার দেশে তুমি বিষ ছড়াবে, আর তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব এটা ভাবলে কী করে?

কি বিষ ছড়াচ্ছি?

এই যে টাকা দিয়ে দাঙ্গা বাধাতে উস্কানি দিচ্ছ, আমি তার কথাই বলছি।

তোমাদের কি উস্কানি দিতে লাগে? তোমরা জাত বিশ্বাসঘাতক, শয়ে শয়ে বছর ধরে নিজেদের মধ্যে মারামারি করছ, নিজের দেশকে বেচে দিয়েছ, তোমাদের কি কিছু বাকি আছে। তোমরা ইন্ডিয়ানরা একেবারেই প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত, নিজেরাই এটা বহুবার প্রমাণ করেছ।

রাগে মাথা গরম হয়ে গেলেও গলার আওয়াজটা ঠাণ্ডাই রাখল রুদ্র, 'ব্রিটিশদের এই কথাটা বলা সাজে না রেডভিল। পারফিডিয়াস এলবিয়ন কথাটা তো ইন্ডিয়ানরা আবিষ্কার করেনি। ইউরোপীয়ানরাই করেছে। আর... যাকগে, বাদ দাও। আমরা এখানে ইতিহাস আর সমাজতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি।' এত কথার মধ্যে সুস্মিতা একসময় ওর ওয়াকি-টকির স্যুইচটা টিপে দিয়েছে। ওটা এখন ট্রান্সমিটার। গাড়িতে বসে সুস্মিতা সব রেকর্ড করে নিচ্ছে।

'আমার কথাটার উত্তর কিন্তু পাইনি।' রুদ্র বলল।

শুধু এইজন্য এতদূর এসেছ?

না। তোমার এই কার্যকলাপ বন্ধ করতে এসেছি।

হা-হা করে হেসে উঠল রেডভিল।

আমার সঙ্গে লড়াই করে আজ পর্যন্ত কেউ জেতেনি। আর তুমি জিতবে? দু'একটা দাবার বোড়েকে সরিয়েছ তাতেই এত বড়ো বড়ো কথা?

বোড়ের পর তোমার মন্ত্রীকেও সরাব। কানাড যে নিছকই একটা কনডুইট, সেটা আমরা জানি।

অনেক কিছুই জেনে ফেলেছ দেখছি। অবশ্য জেনে লাভ? তোমরা তো এখান থেকে বেঁচে ফিরছ না।

অত কনফিডেন্ট হয়ো না রেডভিল। আমরা এখানে এসেছি অনেকেই জানে।

তোমরা আসছ, সেটা জানে। এসেছ সেটা না জানাই সম্ভব। তোমাদের গাড়ি এতক্ষণে গভীর খাদে। এরকম রাতে আর এরকম রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট হতেই পারে। ভেরি স্যাড্। এনিওয়ে, গুড্ বাই।

কনিয়াকটা শেষ করেছ ত'?

'কার্টসি কামস্ ফার্স্ট?' রুদ্র হাসল।

'অফ্ কোর্স', বলে গার্ডকে একটা ইশারা করল, গার্ড বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরল।

তোমাদের বন্দী করতে বাধ্য হচ্ছি। যতক্ষণ না বলছ কানাড ছাড়া অন্য কেউ আছে এটা কি করে জানলে, ততক্ষণ তোমাদের ছাড়া যাচ্ছে না।

গার্ড এক-পা এগোতে রেডভিল্ বলল, 'দাঁড়াও। আরো একজনকে সঙ্গে নাও।' বেল বাজাল। দরজা খুলে যে ঢুকল সে জন। বিজয় যে শ্বেতাঙ্গ নয় সেটা জোরালো আলোতে ধরা পড়তে পারে ভেবে জনকে পাঠিয়েছে বিজয়। জন ঢুকতে রেডভিল বলল, 'টেক দেম টু দ্য সেলারস্ অ্যান্ড লক্ দেম ইন।'

'ইয়েস বস্।' বলে জন একহাতে স্যালুট মারর, আর অন্য হাতে উজিটা দিয়ে অন্য গার্ডটার শরীরটা ঝাঁঝরাই করে দিল প্রায়। গার্ড পড়ে গেল। রেডভিল চেঁচিয়ে উঠল 'হোয়াট দ্য?'

ততক্ষণে রুদ্র গার্ডের মেশিন পিস্তলটা হাত করেছে। সেটা রেডভিলের দিকে বাগিয়ে বলল, 'গেম, সেট, অ্যান্ড ম্যাচ, রেডভিল। তোমার দিন ফুরোলো।'

রেডভিলের মুখে একটা বাঁকা হাসি 'তুমি কি ভাবছ আমি ফাঁকা কথা বলছি? আমি এই শ্যাতোর বিভিন্ন জায়গায় এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে রেখেছি। টাইমার অন করে রেখেছি। আমার পালাবার পথ আঙ্ম ছে, তোমাদের নেই। কাজেই মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও।' হাত বাড়িয়ে একটা লাল বই তুলে নিল। বোধহয় পা দিয়ে কিছু একটা টিপল। ওর পিছনে একটা দরজা খুলে গেল। দরজা দিয়ে একটা গুলি। সুস্মিতার পিস্তল। কখন বুট থেকে বার করেছে কেউ খেয়াল করেনি। রেডভিল্ পড়ে গেল। শরীরের অর্ধেকটা ঘরের ভিতরে আর বাকিটা দরজার ওপাশে। দরজাটা বডিটাতে আটকে আছে। সুস্মিতা গিয়ে লাল বইটা তুলে ব্যাগে পুরল। জন ঘরের দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। হলঘরে ফায়ারিং-এর আওয়াজ শোনা গেল। রুদ্র ধাক্কা দিয়ে সুস্মিতাকে ঘরের বাইরে ঠেলল। পিছনে জন। বিজয় হাঁ করে দাঁড়িয়ে। রুদ্র বলল, 'শিগগির পালাও। দিস্ হাউস ইজ মাইনড্।'

জন আর বিজয় নিজেদের ইউনিফর্মের কোট দুটো ছুঁড়ে ফেলল। চারজনে প্রায় দৌড়ে হলঘরে ঢুকল।

১০

এই ঘটনার মিনিট পাঁচেক আগে। ডেরেকের স্নাইপার ফায়ারে দুজন সেন্ট্রিই ধরাশায়ী হয়েছে। তবে ওদের প্রাণে মারেনি ডেরেক। দুজনকেই বুকের ডানদিকে গুলি করেছে। তারপর দৌড়ে গিয়ে বড়ো গেটটা খুলে দিয়েছে। কালো সি.আর.এস ট্রাকটা গেট খোলা দেখে সোজা ভিতরে ঢুকে গেল। মেন দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারল। সবার আগে মঁসিয় রেভোয়া। হাতে পিস্তল। দরজা খুলল না দেখে একজন এগিয়ে এল, হাতে একটা শট্-গান্ তালাটার ওপর ফায়ার করতে সেটা ভেঙে টুকরো হল। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলতেই ভিতর থেকে ফায়ার করল কেউ। পুলিশরা বডি আর্মার পরা। জনা তিনেকের গুলি লাগলেও কিছু হল না। শুধু গুলির ধাক্কায় পড়ে গেল তারা। ততক্ষণে বাকিরা ঘরের চতুর্দিকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছে। ফায়ারিং বন্ধ হলে দেখা গেল তিনজন গার্ড পড়ে আছে হলের বিভিন্ন জায়গায়। কিছু বোঝার আগেই রুদ্রর আবির্ভাব। সঙ্গে আরো তিনজন, তার মধ্যে একজন মেয়ে। রেভোয়াকে কিছু বলা কওয়ার অবকাশ না

দিয়েই রুদ্র চেঁচাল, ‘গেট আউট্, গেট্ আউট্ এভরিবডি। দিস্ হাউস ইজ মাইনড্। টাইমার ইজ টিকিং।’

হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল পুরো দলটা। ট্রাকের ড্রাইভার ট্রাকের মুখ ঘুরিয়ে বসেইছিল। রেভোয়া ওর পাশে উঠে প্রায় ওর কানের কাছে চেঁচালেন, ‘ড্রাইভ, ড্রাউভ। গো, গো, গো।’ ট্রাক স্টার্ট দিয়ে স্পিডে এগোল গেটের দিকে। দু’একজন ট্রাকে উঠতে পেরেছিল, বাকিরা—রুদ্রর দল শুদ্ধ, গেটের দিকে দৌড়ল। গেটের বাইরে গিয়ে ট্রাকটা দাঁড়াল। বাকিরা ট্রাকে উঠতে যাবে, এমন সময় পর পর অনেকগুলো বিস্ফোরণ। ইঁট-পাথর চারদিকে ছিটকে পড়ছে। সবগুলো বিস্ফোরণ একসঙ্গে নয়, একটার পর একটা। এক সময় মনে হল বাড়ির অর্ধেকটা ছাদ উড়ে গেল। একটা পাথর ছিটকে এসে বিজয়ের কপালে লাগল। রুদ্র ট্রাকে ওঠার আগে বিজয় আর সুস্মিতাকে ঠেলে দিল ডেরেকদের গাড়ির দিকে। গাড়িটার মুখ রাস্তার দিকে ঘোরানো, এঞ্জিন চলছে, হেডলাইট জ্বালানো।

ডেরেক হেডলাইটের আলোয় দেখল বিজয় আর সুস্মিতা ছুটে আসছে, বিজয়ের মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি নেমে পিছনের দরজাটা খুলে দিল। সুস্মিতা বিজয়কে একরকম ধাক্কা দিয়েই গাড়ির ভিতরে ঠেলে দিল। শর্মিলা দরজা বন্ধ করে সামনে বসতে না বসতেই ডেরেক গাড়ি চালাল। ট্রাকটা অনেক দূর এগিয়েছে। পিছনে কী একটা ঝুলছে। রুদ্র। ট্রাকে উঠতে পারেনি, একটা হুক ধরে ঝুলে পড়েছে। শ’খানেক মিটার যাবার পর একজন পুলিশম্যান ওকে দেখতে পেয়ে ট্রাক থামাল। আর একজন ওকে হাত ধরে টেনে তুলল। ট্রাকের পিছন পিছন ডেরেক। পিছনে তখন শ্যাতো দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

সপ্তম চক্র

ওস্তাদের মার

১

ক্রিসমাস ইভের দিন-ই সন্ধ্যাবেলা।

কানাডের প্রাইভেট ফোনটা বাজল। হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলল কানাড। স্ক্রিনে নম্বরটা দেখল। ট্রু-কলার বলছে, ‘কলার আননোন।’ এরকম-ও আবার হয় নাকি? ফোনটা তুলল।

কানাড? দিস্ ইজ্ ব্রিগেডিয়ার পরমজ্যোৎ সিং। আমি ভাবছিলাম ক্রিসমাস ইভে তুমি একা বোর হচ্ছ, আমি এসে তোমাকে সঙ্গ দিয়ে তোমার মনের ভার একটু হাল্কা করি।

কানাড কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ব্রিগেডিয়ার বললেন, ‘থাক থাক... তুমি যে খুশি হওনি সেটা আমি জানি। আমিও যে খুব খুশি সেটা ভেব না। তবে সবসময় কী আর পছন্দের লোক পাওয়া যায় কথা বলার জন্য? ...তোমার বাড়ি কোথায় আমি জানি।’

কানাড আর কিছু বলার আগেই ফোন কেটে গেল। ব্রিগেডিয়ার এলেন আধ ঘন্টা পরে। কানাড নিজেই গিয়ে দরজা খুলল। কানাডের চাকর ক্রিশ্চান। আজ ছুটি নিয়েছে। আগামীকাল সকালে চার্চে গিয়ে তারপর আসবে। ব্রিগেডিয়ারের হাতে একটা ম্যাকএলান ১৫ বছর সিঙ্গল মল্টের বোতল।

‘কাল কী হবে কেউ জানে না। তো ড্রিংক যদি করতেই হয়, তাহলে আজ অন্তত একটা ভালো ড্রিংক করাই ভালো। কী বলো মিস্টার কানাড?’ ব্রিগেডিয়ারের গলার স্বর যেন একটু শ্লেষাত্মক।

‘তা কেন? আপনি এসেছেন আই অ্যাম হ্যাপি। তবে কিনা...’

‘আমাকে এক্সপেক্ট করোনি, তাই তো? তবে কোনো সুন্দরীকে যে এক্সপেক্ট করছিলে না সেটা আমি জানি। পুওর ম্যান, তোমার রাস্তায় যে সুন্দরীদের চলা বিপজ্জনক, সেটাও আমি জানি।’ হো-হো করে হেসে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার। ‘এনিওয়ে, লেট্ আস হ্যাভ দ্যাট ড্রিংক।’ বোতলের ছিপি নিজেই খুলে কানাডের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। কানাড, গিয়ে সাইড বোর্ড থেকে দুটো গ্লাস আর এক ফ্লাস্ক জল নিয়ে এল। চলাফেরাটা অনেকটা রোবটের মতো। ব্রিগেডিয়ার নিজেই ড্রিংক বানালেন। কানাডের দিকে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিলেন। ‘চিয়ার্স।’ জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। কানাডের ফ্ল্যাট জনপথের একটা অত্যন্ত রইসি ফ্ল্যাটবাড়ির টপ্ ফ্লোরে। জানলা দিয়ে শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে বললেন, ‘কী ঠাণ্ডা পড়েছে দেখেছ? নরক নিশ্চয়ই এর থেকে গরম হবে। অগ্নিকুণ্ড ইত্যাদি আছে বলে শুনেছি।’

‘কী বলতে চাইছেন আপনি?’ কানাড এতক্ষণে নিজের গলার স্বর ফিরে পেয়েছে।

‘কিছু না। কী জান, এক্স ডিজিপি পরমানন্দ বিট্‌টল কানাড, তোমার সব কিছুই আমরা জানি, এমনকি তোমার স্যুইস অ্যাকাউন্টের নম্বর আর তার পাসওয়ার্ডও। ও, বাই দ্য ওয়ে, রাজা আর শহীদ দুজনেই এখন এন.আই.এ-র কব্জায়। কেউ জানে না। মিডিয়া তো নয়ই। তারা এখন মিষ্টি সুরে গান গাইছে। আমি ঠিক করেছি ওদের সদ্গতি হবে। তবে এন.আই.এ-র হাতে নয়। ওরা হাত নোংরা করতে চায় না। অগত্যা অন্য একটা এজেন্সি সেটা করবে। কোথায়, কীভাবে, এসব তোমার ভাবার দরকার নেই।’

‘দেশে আইন-আদালত আছে।’ কানাডের গলাটা একটু দুর্বল শোনাল।

নিশ্চয়ই আছে। তবে তোমাদের মতো শয়তানদের জন্য নয়। এখানে বিচার আমার হাতে। আমি জাজ, আমি জুরি আমিই সব।

কী চান আপনি?

‘তোমার ওপরে যে লোকটি আছে, যে পিটার ফিট্‌জপ্যাট্রিককে রিপোর্ট করে, তার নাম জানতে চাই। সে কে, আমি অনেকটা নিঃসন্দেহ। তবে তোমার কনফারমেশনটা পেলে একটু সুবিধা হয়।’

বাঁকা হাসি হাসল কানাড, ‘আপনি জানতে চাইবেন আর আমি বলে দেব, কী করে ভাবলেন আপনি?’

ভাবিনি তো। নিশ্চিত জানি তুমি বলবে।

কেন?

ব্রিগেডিয়ার আর একটা হুইস্কি ঢাললেন, ‘পরমানন্দ কানাড।

মহারাষ্ট্রের এক প্রত্যন্ত গ্রামের দলিত পরিবারের ছেলে। অন্য ছেলেদের সঙ্গে বসতে দেওয়া হত না বলে গাছের তলায় বসে পড়াশুনো করেছে। তা সত্ত্বেও হাল ছাড়েনি। বৃত্তি পেয়ে কলেজ। তারপর আই পি এস। ধাপে ধাপে উন্নতি। শেষে ডি জি পি। তারপর...’

‘গল্পটা শেষ করুন।’ কানাড নিজের হুইস্কি শেষ করে আবার নিল একটা।

যেটা লোকে জানে না। জমি নিয়ে উঁচু জাতের লোকেদের সঙ্গে বচসা হওয়াতে কানাডদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুরো কানাড পরিবার পুড়ে মারা যায়।

‘যে মেয়েটাকে আমি ভালোবাসতাম, তাকে উলঙ্গ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে গ্যাং-রেপ করেছিল।’ কানাডের গলাটা শুকনো।

তার প্রতিশোধ তো তুমি অনেকদিন আগেই নিয়েছ কানাড। এস পি থাকাকালীন একটা মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে ওদের সব কটাকে এনকাউন্টার করে শেষ করে দিয়েছ। তাহলে আবার কেন?

‘কেন? আপনি শিখ। ১৯৮৪ ভুলে গেছেন?’ যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল কানাড। ‘এই পচা সমাজকে ধ্বংস করে দিতে হবে, যেমন হিটলার করেছিলেন। জার্মান সমাজে ইহুদিরাই ছিল ঘুণ, আর এখানে এই ব্রাহ্মণ আর ঠাকুররা।’

তুমিও কি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বসাতে চাও নাকি?

দরকার হবে না। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরবে, মুসলমানদের সঙ্গে লড়ে মরবে, শুধু জায়গা মতো উস্‌কে দিলেই হল।

বুঝেছি। ভালো বুদ্ধি। তা কানাড, অনেক দলিত তো তোমার মতো জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, ভারতের রাষ্ট্রপতিও হয়েছেন, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

‘সে তো হাত গুণে। কোটি কোটি দলিত এখনো নির্যাতিত, সেই সংখ্যার তুলনায় এটা কিছুই নয়।’ ব্রিগেডিয়ার তিন নম্বর ড্রিংক নিলেন, ‘যাক্, তোমার মোটিভেশন তো বোঝা গেল, এবারে নিশ্চয় তোমার বসের নাম বলতে বাধা নেই।’

‘আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি না।’ মাথা নাড়ল কানাড।

‘আমি একটা কাগজে একটা নাম লিখে দিচ্ছি। যদি ঠিক না হয়, তো কাগজটা আমাকে ফেরৎ দেবে।’ পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। কলম দিয়ে খসখস করে লিখলেন। কানাডের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

কানাড কাগজটা দুমড়ে মুচড়ে একপাশে ছুঁড়ে ফেলল।

‘ফ্যান্টাসি।’

ব্রিগেডিয়ার হাসলেন শুধু। উঠে পড়লেন। ‘তুমি তো সান্টো ডোমিংগো যাচ্ছ। ভুয়ো নামের পাসপোর্ট নিয়ে। তা যাও। তবে আর ফিরে এসো না।’

কানাডকে শক্‌টা দিয়ে ব্রিগেডিয়ার বেরিয়ে গেলেন।

ব্রিগেডিয়ার যাবার পর কানাড ছুটল প্যাকিং করতে। রাত তিনটেয় প্যারিসের ফ্লাইট। এখনি বেরোতে হবে। সাড়ে দশটা বাজে। ফোন করল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। কানাডের ড্রাইভারও আজ সন্ধ্যায় ছুটিতে।

ট্যাক্সি এল প্রায় কানাড নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গেই। কানাড বসল পিছনে। ড্রাইভারের পাশে আর একটা লোক। ড্রাইভার বলল, রাত্রে একা ট্যাকিস চালানো আজকাল সেফ্ না, সেজন্য ওকে নিয়ে এসেছে।

জনপথ থেকে বেরিয়ে কন্টসার্কেলে পড়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিট ধরল। গুরুদ্বারার পাশের গলি দিয়ে বেরিয়ে বাবা খড়ক সিং মার্গ দিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের পিছন দিকে চলল। ড্রাইভার বলল, খ্রিসমাসের জন্য পুলিশ ব্যারিকেড লাগিয়েছে সর্বত্র, সেজন্য এদিক দিয়ে গিয়ে সর্দার প্যাটেল মার্গ দিয়ে সোজা এয়ারপোর্ট যাওয়া সহজ হবে।

‘যো ঠিক সমঝে’ কানাড চোখ বন্ধ করল।

হঠাৎ কপালে ঠাণ্ডা কিছু লাগায় চোখ খুলল। .২২ ক্যালিবারের পিস্তলের গুলিটা ওর কপাল ভেদ করে ঢুকে গেছে। রক্ত বেরোল না বিশেষ। ড্রাইভারের পাশের লোকটা পিস্তলটা পকেটে পুরে ড্রাইভারকে বলল চলো। ড্রাইভার একটু অন্ধকার জায়গা দেখে গাড়ি থামিয়ে গাড়ির নাম্বার প্লেট বদলে ফেলল। ট্যাক্সি নম্বরের জায়গায় এখন হরিয়ানার নাম্বার প্লেট। গাড়ি ঘুরিয়ে পশ্চিম দিল্লির দিকে চলল। ওয়েস্টার্ন পেরিফেরালে পড়ে রোহতকের রাস্তা ধরল।

এক জায়গায় হাইওয়ের কাজ হচ্ছে। মাটি ঢিপি করা, ট্রেঞ্চ ভরা হচ্ছে। এখন লোকজন কেউ নেই। একটা জেসিবি অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা ধরাধরি করে বডিটা ট্রেঞ্চের কাছে নিয়ে গেল। জামাকাপড় জুতো সব খুলে ফেলল। বডিটা ফেলে দিল ট্রেঞ্চে। পাশেই একটা কোদাল পড়েছিল—কোনো লেবারার বোধহয় ফেলে গেছে। বডির ওপর বেশ অনেকটা মাটি ফেলল। কোদালটা আবার সাইডে ফেলে গাড়ি নিয়ে চলে গেল ওরা।

রাত এগারোটা নাগাদ ব্রিগেডিয়ার সান্টাকে বললেন, ‘কানাডের বাড়ির আশেপাশে যত সিসি টিভি আছে তার গত দেড় ঘন্টার রেকর্ড মুছে দাও।’

উইল ডু, স্যার।

ব্রিগেডিয়ার ফোন রেখে দিলেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটা স্কচ্ নিয়ে বসলেন।

২

ক্রিসমাসের দিন সকাল। একটা অলস ভাব চারদিকে। আজ আবার শুক্রবার। লম্বা উইকএন্ড। অর্ধেক দিল্লি বাইরে চলে গেছে বেড়াতে। সকালে ব্রেকফাস্ট করে এক কাপ কফি নিয়ে বসলেন। মিষ্টি রোদ্দুর। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ড্রেসিং গাউনটা একটু জড়ালেন ভালো করে। রুদ্রদের কোনো ফোন ফোন আসেনি। শুধু ভোর তিনটের সময় একটা কোডেড মেসেজ এসেছিল। একটাই কাজ বাকি রয়ে গেছে

ব্রিগেডিয়ারের। সেটাই করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি। ড্রেস করলেন। তবে আজ স্যুট টাই নয়। ব্রাউন রংয়ের ট্রাউজার, চেককাটা একটা বেইজ রংয়ের পুলওভার। খানসামাকে বললেন গলফ্ ব্যাগ বার করতে আর ড্রাইভারকে বলতে গাড়ি আনতে। একটু অবসাদ লাগছে। যে কাজটা করতে হবে সেটা নিতান্তই বিতৃষ্ণামূলক কিন্তু উপায় নেই। ব্যাপারটার শেষ দেখতেই হবে। একটা ফোন করলেন।

গুড়্ মর্নিং। পম্মি সিং হিয়ার। মেরি ক্রিসমাস।

মেরি ক্রিসমাস। কী ব্যাপার, এত সকালে?' ওপাশের গলাটা বেশ চিয়ারফুল।

শক্ ট্যাকটিক্সই সবথেকে ভালো।

তোমাকে দুটো খবর দেব আর একটা কাজ করতে বলব।

অ্যাট ইওর অর্ডার, স্যার।

প্রথম খবর, কানাড মারা গেছে।

'হু ইজ্ কানাড?' গলাটা এখন বেশ গম্ভীর।

কানাড কে তা তুমি ভালো করেই জান। সেকেন্ড খবর, রেডভিলও মারা গেছে, ওর সব কাগজপত্র ব্যাংক ডকুমেন্টস্—সব আমার হাতে।

'হু দ্য হেল্ ইজ্ রেডভিল্?' সুরটা এবার আরো একটু চড়া।

মনে মনেই হাসলেন ব্রিগেডিয়ার। ওষুধ ধরেছে।

আর তিন নম্বর, এখন থেকে ঠিক এক ঘন্টা পরে আমি আর্মি গলফ্ ক্লাবে থাকব। তোমার জন্যে ঠিক আধ ঘন্টা অপেক্ষা করব।

উত্তর পাবার আগেই লাইনটা কেটে দিলেন ব্রিগেডিয়ার।

আর্মি গলফ্ ক্লাব দিল্লির ধোলাকুঁয়ায়। ছুটির দিন সকালে ব্রিগেডিয়ারের পৌঁছতে লাগল আধ ঘন্টা। ক্লাব হাউসে গিয়ে ডে-কার্ড দেখলেন। যারা আজকে আসবে সবাই নাম লিখিয়েছে। তবে পুরো সকালটা খালি। একটা কার্টে গল্ফ্ ব্যাগটা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন। একজন জওয়ান এসেছিল—'ক্যাডি চাহিয়ে সার?'

'নেঁহী, নেঁহী, দো-এক প্র্যাকটিস হোলস্, বস্। বার খুলেগা তো?'

'হাঁ সাব। সাড়ে দশ।'

'ঠিক হ্যায়।'

নিজের মনে খেলতে খেলতে তিন নম্বর হোলে যখন পৌঁছলেন, ফোনটা বাজল।

'হোয়ার আর ইউ?'

'থার্ড হোল। কাম আপ্।' ফোন রেখে দিলেন। মনটা বেশ ভালো। আগের ড্রাইভগুলো ভালো হয়েছে। পাটিং-ও ভালো হয়েছে। ড্রাইভ করলেন। বলটা তীর গতিতে দুশো গজ পেরিয়ে সোজা গ্রিন গিয়ে পড়ল। ব্রিগেডিয়ার আন্দাজ করলেন, একটা স্ট্রোক, একটা পাট্। এগিয়ে গেলেন বলটার দিকে। পিছন থেকে গলার আওয়াজ এল, 'ওয়েল প্লেইড্, দ্যাট ড্রাইভ।'

থ্যাংক ইউ।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার হঠাৎ নিজের ম্যাশি সিলেকট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভদ্রলোক আবার হাত গুটিয়ে নিলেন।

সকাল সকাল তোমার রূপকথা শুনে ভাবলাম একবার দেখাই করে যাই। পুরনো বন্ধু বলে কথা!

ব্রিগেডিয়ার পুরনো বন্ধুর দিকে তাকালেন একবার। মাঝারি হাইট, কাঁচাপাকা চুল, পুরুষ্টু গোঁপ। ফগ কালারের ট্রাউজার, নীল রংয়ের পুলওভার, সাদা-নীল পোল্কা ডটের স্কার্ফ। খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন। এক্স আর্মি বলে দিতে হয় না।

পুরনো বন্ধু বলেই তোমাকে নিজের সাফাই গাইবার একটু সুযোগ দিলাম। তুমি এই কাজ কেন করেছ সেটা ভেবে উঠতে পারছি না।

কোন কাজ?

তুমি ভালো করেই জান। এটাও বলে রাখি তোমাকে, ফিটজ্প্যাট্রিককেও শেষ করব। সেজন্য তোমাকে এইটুকু সুযোগ দিলাম।

একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক। একটু ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বললেন, 'সবই তো জেনে গেছ দেখছি, তবে আমার কাছে আর কি জানতে চাও?'

তোমার মোটিভেশনটা কোথা থেকে এল সেটা জানতে চাই।

তা দিয়ে তোমার কী হবে?

ভবিষতে কাজে লাগবে।

তবে শোন, আর্মিকে আমি সব দিয়েছি। আমার রেকর্ড তো তুমি জান। কিন্তু ওপরে উঠে দেখলাম আমার জায়গা নেই। সেই প্রথম বুঝলাম যে আমি অন্যরকম বলে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মনে হল সব জ্বালিয়ে দিই। তখন ঠিক করলাম, আর্মি আমার কোনো ক্ষতি করেনি, বরং আমাকে সুযোগই দিয়েছে। আমাকে এবং আমার মতো অনেককে, আলাদা করে দেখার পিছনে আছে রাজনৈতিক নেতারা আর সমাজ। তখন সুযোগ নিলাম। জানি না তুমি বুঝতে পারছ কিনা।'

ভদ্রলোকের গলায় অনেকটা সহানুভূতি চাইবার সুর।

বুঝতে পারছি। গতকাল এরকম একটা অনুযোগই শুনেছিলাম কানাডের কাছে। তবে একটা কথা আরো। ব্যাপারটা সারা দেশে ছড়ালে কী করে?

দুজন লোকের সঙ্গে আলাপ ছিল। দুজনে দুটো দলের সদস্য। একজন আর একজনের বিরুদ্ধে। আর কী, লাগিয়ে দিলাম। টাকার সাপ্লায়ার ছিলই আমার। ফিটজ্প্যাট্রিককে অনেক দিন ধরেই চিনি, ওর নাৎসি মনোভাবও জানতাম। কোনো অসুবিধা হল না। আমার লোক দুজনেই অসম্ভব করাপ্ট্, যা এক্ষেত্রে সাধারণত হয়ে থাকে। টাকাই কথা বলল।'

কারা তারা?

এই কাগজে লিখে দিচ্ছি, পরে দেখে নিও।

টার্গেট সেট করে কে? মানে কোথায় দাঙ্গা হবে সেটা কে ঠিক করে?

আমি। ওরা মোটা বুদ্ধির লোক। স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালিসিস ওদের মাথায় ঢোকে না।

বুঝলাম।

তবে আমিও এটা কথা জানতে চাই।

বলো।

আমার খোঁজ পেলে কি করে?

হাসলেন একটু ব্রিগেডিয়ার। করুণার হাসি।

একটাই ভুল তুমি করেছ। আর সেটাই তোমার কাল হয়েছে।

অবাক হলেন ভদ্রলোক, ‘ভুল? কই কিছু তো মনে করতে পারছি না!’

করেছ। তুমি ভাঁলকে ফোন করেছিলে। ভাঁল তোমাকে কথায় কথায় বলে ফেলেছিল যে একটা টিম প্যারিস যাচ্ছে। পরে ওর মনে পড়ে যে তুমি আর আর্মিতে নেই। তখন আমাকে ফোন করে।

তা ঠিক। তোমার বাড়িতে ওই স্টুপিড অ্যাটাকটা করিয়ে কানাড প্রায় সব কিছু ভেস্তে দিয়েছিল। তখনই আমি জানি তুমি কিছু একটা করবে। যদি তুমি রেডভিল্ সম্বন্ধে জানো তাহলে নিশ্চয়ই টিম পাঠাবে। সেটাই চেক করতে চাইছিলাম।

ওয়েল, ওল্ড ফ্রেন্ড, দিস্ এণ্ডস্ হিয়ার।’

পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করলেন। ‘একটাই বুলেট আছে। অ্যাজ্ অ্যান্ অফিসার অ্যান্ড আ জেন্টলম্যান, আশা করি সদ্ব্যবহার করবে।’

নিজের গল্ফ্ কার্টে বসে ব্রিগেডিয়ার ক্লাব হাউসের দিকে চললেন। পিছনে ফিরে তাকালেন না।

মিনিট দুয়েক পরে পিছন দিকে একটা গুলির আওয়াজ হল। ফিরে দেখলেন না; শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

বারে গিয়ে একটা জিন-টনিক খেলেন। মুখে একটা বিশ্রী স্বাদ। পুরোটা না খেয়েই উঠে পড়লেন।

দুপুরবেলা টিভি নিউজ বুলেটিনে ব্রেকিং নিউজ, ‘শকিং স্যুইসাইড। মেজর জেনারেল এম এ খান, রিটায়ার্ড, এক্স ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ্ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, পি ভি এম এম, পি ভি সি ইত্যাদি, কোন অজ্ঞাত কারণে স্যুইসাইড করেছেন। বডি পাওয়া গেছে দিল্লির আর্মি গলফ্ লিংকে...’

ব্রিগেডিয়ার খানসামাকে বললেন টিভিটা বন্ধ করে দিতে।

পরিশিষ্ট

১

সাইমন রেডভিল্ ১৭৭৫-১৮৫০
জোনাথান রেডভিল্ ১৮২০-১৮৮৫
গ্রাহাম রেডভিল্ ১৮৫৫-১৯৩০
সেবাস্টিয়ান রেডভিল্ ১৮৮২-১৯৭০
রবার্ট রেডভিল্ ১৯৩৮

‘যা আন্দাজ করেছিলাম তার থেকে রবার্টের বয়স অনেক বেশি।’ সুস্মিতা বলল।

—‘কী পড়ছ, রেডভিলের ডায়রি?’ পাশ থেকে রুদ্র বলল। রুদ্রর চোখ বোঁজা। চেয়ারের ব্যাকটা পুরো হেলানো। পা ছড়ানো সামনের দিকে। হাতলের ওপর একটা হুইস্কি রাখা।

এয়ার ফ্রান্সের দিল্লিগামী প্লেন। প্যারিস থেকে দুপুরে ছেড়েছে, পৌঁছবে রাত সাড়ে বারোটায়। এক্সিকিউটিভ ক্লাসে ওরা দুজন পাশাপাশি জানলার ধারে। একই রো-তে ওপাশের জানলার ধারে বিজয় আর জন্। বিজয়ের মাথায় এখনো ব্যান্ডেজ বাঁধা। বিজয় একটা বেরে পরে বসে আছে। শর্মিলা আর ডেরেক পরের রোতে। গুজগুজ-ফুসফুস করছে।

আজ ডিসেম্বরের আঠাশ। সুস্মিতার আর লন্ডন বা প্যারিসের নিউ ইয়ার দেখা হল না। ব্রিগেডিয়ার ছুটি মঞ্জুর করলেন না। কী কারণে, উনিই জানেন। ডেরেক আর জনকে ডেকে নিয়েছেন নিজে ধন্যবাদ জানাবেন বলে। এত ধন্যবাদ জানাবার লোক ব্রিগেডিয়ার নন, কিছু একটা দুরভিসন্ধি আছে বলে ওদের সবারই মনে হয়েছে। কিন্তু কিছু করবার নেই।

চোখ বন্ধ রেখেই রুদ্র বলল, ‘একটু জোরে পড়। আমিও শুনি।’

‘পড়ছি। রবার্ট রেডভিল্ হচ্ছে রেডভিল্ বংশের ফিফথ্ জেনারেশন। রেডভিল লাল কালিতে লিখেছে, ও ছোটোবেলায় শুনেছিল রেডভিল্রা নাকি আসলে নরম্যান। উইলিয়াম দ্য কন্কোয়ারের সঙ্গে ইংল্যান্ডে এসেছিল। ওরা আগে নাইট ছিল, কিন্তু সাইমন ডে মন্টপোর্ট রাজা হেনরি দ্য এইটথ্ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তখন মন্টফোর্ট-এর পক্ষ নেওয়ায় রাজা ওদের নাইটহুড্, বিষয়-সম্পত্তি সব কেড়ে নেয়।’

‘তারপর?’ রুদ্র এতক্ষণে চোখ খুলে হুইস্কিতে একটা চুমুক দিল। আবার চোখ বুঁজল।

পরের পাঁচশ বছরে বোধহয় বিশেষ কিছু হয়নি। অন্তত এখানে কিছু লেখা নেই।

তাহলে শুরু হচ্ছে সাইমন রেডভিল্ থেকে?

—‘হ্যাঁ। রেডভিল্ লিখেছে সাইমন ভারতবর্ষে এসেছিল সতেরো বছর বয়সে। সেরিঙ্গাপট্টমের পতনের সময় নাকি হীরে জহরত লুট করেছিল। সেগুলো বিলেতে নিয়ে যায়। ফিরে যখন আসে ওর বয়স তখন পঞ্চাশ। ঠগিদের বিরুদ্ধে অভিযানে স্লীম্যানের সঙ্গে ছিল। ও তখন কর্নেল। ঠগিদের কাছ থেকে যা উদ্ধার হয়েছিল, তার একটা অংশও হাতায়।’

বাঃ। সুন্দর ইতিহাস। তবে আর ডিটেলে যাবার দরকার নেই, সংক্ষেপে বলো।

এরপর জোনাথান। অ্যাডভেঞ্চরার। বর্মায় গিয়ে শান স্টেট থেকে রুবি ইত্যাদি লুঠ করে। এরপর গ্রাহাম, চীনের আপিং-এর স্মাগলিং (লুটিং ও বলা যেতে পারে) করে অনেক টাকা করেছিল, সব বিলেতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বলতে গেলে ও-ই বংশের টাকার মূল। ওর ছেলে সেবাস্টিয়ান ছিল ইন্ডিয়াতে সিভিল সার্ভেন্ট। ততদিনে রেডভিলরা ইটন আর অক্সফোর্ড গিয়ে জাতে ওঠার চেষ্টা করছে।

‘হুঁ’। রুদ্র বেল বাজিয়ে স্টুর্য়াডেসকে ডেকে আর একটা ড্রিংক আনতে বলল।

‘কী হচ্ছে কী?’ সুস্মিতা ওর হাতে একটা চড় মারল।

ভাসতে ভাসতে যাব, বুঝলে?

থাক্, আর ইয়ার্কি মারতে হবে না।

তাহলে পড়ো।

সেবাস্টিয়ানের তিন ছেলে। তার মধ্যে দু’জন স্বদেশীদের গুলিতে মারা যায়। ওর বউ কোথা থেকে আসছিল রাত্রিবেলায়, ডাকাতরা অ্যাটাক করে। রেপ্ অ্যান্ড মার্ডার। এরপরেই সেবাস্টিয়ান চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিলেতে ফেরৎ চলে যায়, ছোটো ছেলে রবার্টকে নিয়ে।

হুম্। মোটিভ একটা পাওয়া যাচ্ছে বটে।

হ্যাঁ। এরপর অনেক কিছু হিজিবিজি লেখা দুপাতা ধরে। রবার্ট ওর মা’র মৃতদেহটা দেখেছিল। ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায়। সেটা কোনোদিন ভুলতে পারেনি। এক জায়গায় লিখেছে—সব ভারতীয়দের ঘৃণা করি। করাপ্ট, বদমায়েশদের জাত। আমার মা’র মৃত্যুর জন্যে ওদের কোনোদিন ক্ষমা করবো না।

‘বাঃ। ইন্ডিয়া-হেটিং এর সঙ্গে আবার পরে ফ্যাসিবাদ যোগ হয়েছে। সুন্দর ককটেল।’ রুদ্র বলল।

পরের ড্রিংক এসেছে। বিকালের স্ন্যাকস্ দেবার জন্য ফোল্ডিং টেবলে ন্যাপকিন পেতে দিয়ে গেছে।

‘তাড়াতাড়ি শেষ কর। আর কী লিখেছে?’

আর বিশেষ কিছু নেই। কী করে নিজের বিলিয়ন বানাল, তার ব্যাখ্যা। আমার ইন্টারেস্ট নেই।

শর্মিলা ওয়াশরুমে গিয়েছিল। আবার জায়গায় বসার আগে ওদের কাছে এল।

কী পড়ছিস রে তোরা?

রেডভিলের ডায়রি। তোরাও পড়ে দেখ্, অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

২

‘তিনজন লোক, তিনরকম মোটিভ। তিনজনেই বুদ্ধিমান, আর তিনজনেই নিজেদের অব্‌সেশনের শিকার।’ বললেন ব্রিগেডিয়ার পরমজোৎ সিং সুজন সিং পার্কের সেফ্ হাউসে বসে। ওঁকে ঘিরে ওঁর ‘কোর’ টিম। তবে ডেরেক আর জনও আছে। রুটিন মতো, ব্রিগেডিয়ারের হাতে স্কচের গ্লাস। আর সবার হাতেও কিছু না কিছু। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ দাঙ্গার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। পি এম আর হোম মিনিস্টার আমাকে—মানে তোমাদের—কংগ্রাচুলেট করেছেন।’

‘কংগ্রাচুলেশনসের বদলে ছুটি দিলে...’ বিড়বিড় করে বলল সুস্মিতা।

‘কী বললে?’ একটা কানে হাত দিলেন ব্রিগেডিয়ার। শুনেছেন ঠিকই, একটু মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, তোমাদের ছুটির ব্যবস্থাই করেছি। এই সময়ে ক্যারিবিয়ানের ওয়েদার খুব ভালো। যাও, ঘুরে এস। আর একটা ছোটো কাজও করে এস—টেক কেয়ার অফ্ পিটার ফিট্‌জপ্যাট্রিক।’

‘ও মাই গড্।’ বলল বিজয়।

যেন শুনতেই পাননি এভাবে বলে চললেন ‘তোমাদের যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে মালতী। জন আর ডেরেক এখনো কনসালটেন্ট। ওদের খরচাও আমরাই দেব। হোপ ইউ আর হ্যাপি। আর ডোমিনিক্যান রিপাবলিক থেকে ফেরার পথে ইউ এস বা ইউরোপে কয়েকদিন কাটাতে চাও তো কাটিয়ে আসতে পার।’ দু’হাত ছড়িয়ে দরাজ গলায় বললেন, ‘অল্ অন দ্য হাউস...প্রোভাইডেড...’

‘হোয়াট?’ একটু ভীত গলাতেই বিজয় জিজ্ঞেস করল।

‘প্রোভাইডেড ইউ টাই আপ অল্ লুজ্ এন্ডস।’

রুদ্রর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললেন, ‘তবে আমার কোনো চিন্তা নেই, আই নো ইউ উইল সাকসিড্।’

উঠে দরজা অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলেন, ‘সান্টা তোমাদের সব ডেটা দিয়ে দেবে। কালই তোমরা রওনা হবে।’

বেরিয়ে গেলেন ব্রিগেডিয়ার। সবাই কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইল। সবার হয়ে মনের ভাবটা জনই ব্যক্ত করল। নিজের জন্য একটা বড়ো রাম বানিয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল,

‘হোয়াই ডু উই লুক ফর ডেভিলস্ অল্ ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড হোয়েন উই হ্যাভ ওয়াজ অ্যাট হোম?’

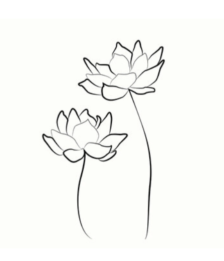

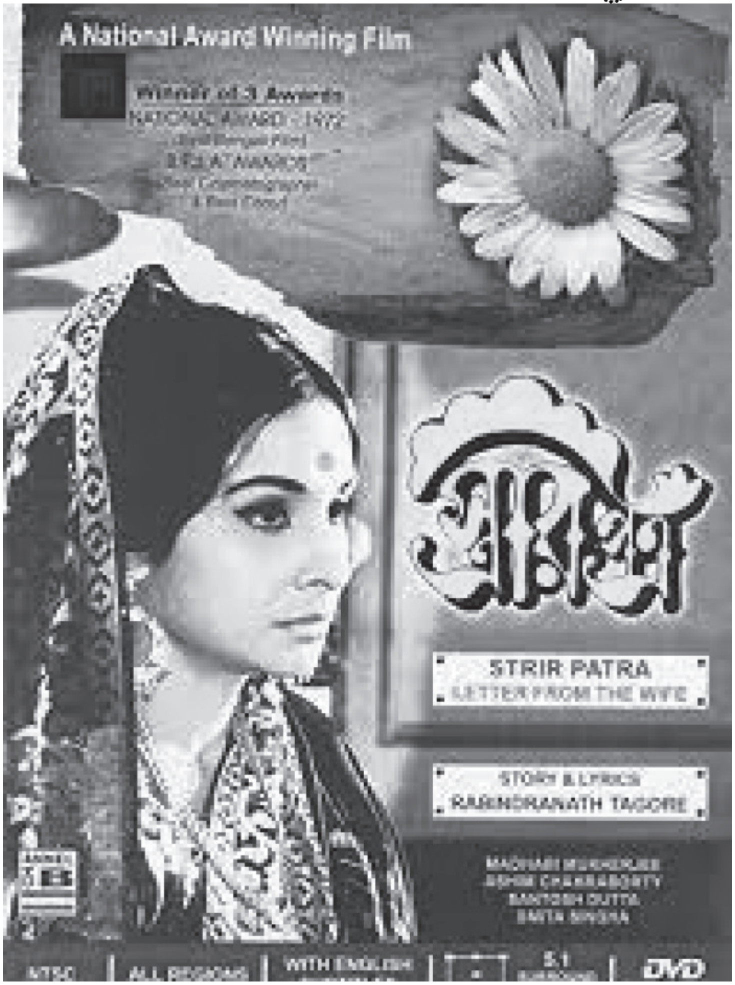
A National Award Winning Film
Winner of 3 Awards
NATIONAL AWARD - 1972
STRIR PATRA
LETTER FROM THE WIFE
STORY & LYRICS
RABINDRANATH TAGORE
MADHABI MUKHERJEE
ASHIM CHAKRABORTY
SANTOSH DUTTA
SMITA SINGHA
NTSC
ALL REGIONS
WITH ENGLISH
5.1 SURROUND
DVD

‘স্ত্রীর পত্র’-র দিনগুলো

পুণ্যব্রত পত্রী

আমার জন্ম, আমাদের দেশের বাড়ি, নাকোল গ্রামে। হাওড়া জেলার বাগনান স্টেশন থেকে সাত মাইল ভেতরে, শ্যামপুর থানার অন্তর্গত, নাউল হাট বাস স্টপেজে নেমে, প্রায় মাইল খানেক হেঁটে পৌঁছতে হত নাকোলে। জন্মের পর প্রায় একনাগাড়ে কেটে গেছে বছর চারেক। স্কুল-কলেজে ভর্তি হয়ে কলকাতায় চলে আসার পরেও আমার সঙ্গে কিন্তু গ্রামের যোগাযোগ ছিল নিবিড়। প্রতি গ্রীষ্মে, শীতে বা পুজোয়, বছরে তিনবার না হলেও অন্তত দুবার তো দেশের বাড়িতে যেতামই। যদি না (একটু বড়ো হবার পর) সপরিবারে কোথাও বেড়াতে গেছি, সে অন্য কথা। ছোটোবেলায় দেশের বাড়ি যাবার আনন্দটাই ছিল আলাদা। বাড়িভর্তি লোকজন, আত্মীয়স্বজন, পরিবেশ সরগরম। গ্রীষ্মে যেমন ছিল হরেক রকম ফল, পুজোর কাছাকাছি সময়ে তেমন থাকত তালশাঁস, তালের বড়া আবার শীতে খেজুর রস, তাল গজল বা তাল ফোঁপড়া সঙ্গে পিঠেপুলি। আর সেই সঙ্গে থাকত, শাসন-বর্জিত দিন আর রাত। সমবয়সীদের সঙ্গে ওঠাবসা, খেলাধুলা, হাসিঠাট্টা। সে এক অনির্বচনীয় আনন্দ।

এতক্ষণ যে দেশের বাড়ির কথা বললাম তার একটা কারণ আছে। এরকমই কোনো এক গ্রীষ্মে দেশের বাড়িতে গেছিলাম আমরা সবাই। যদিও তখনো আমরা সব ভাইবোন ছিলাম খুবই ছোটো । সেটা সম্ভবত ছিল ১৯৭০-’৭১ সাল। আমার বাবা পূর্ণেন্দু পত্রীর দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ‘স্ত্রীর পত্র’র শুটিং শুরু হয়েছিল আমাদের দেশের জমিদার (মিশ্র) বাড়ির পুকুরঘাটে। প্রথম যে শটটা নেওয়া হয় সেটা ঐ পুকুর ঘাটে, সদ্য বিবাহিতা বিন্দু (রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী) আগের রাতের এঁটো বাসন নিয়ে বসে আছে, সেখানে তার শাশুড়ি (সীতা দেবী)র সঙ্গে কথোপকথন, বলা ভালো শাশুড়ির ভর্ৎসনা। এর আগে ক্ল্যাপস্টিক দিয়েছিলেন আমার ঠাকুমা, নির্মলা পত্রী। বাবা চেয়েছিলেন তাঁর মায়ের হাতেই শুভারম্ভ হোক এই চলচ্চিত্রের।

ঐ দৃশ্যের পরবর্তী একটা শটে দেখি যে দূরে (লং শট) পুকুরপাড়ের অপরপ্রান্ত দিয়ে একটি বাউল গান গাইতে গাইতে চলেছে, মনপাখি

বিবাগী হয়ে ঘুরে মোরো না...। গানটি কার কণ্ঠে গাওয়া মনে নেই। কিন্তু বাউল বেশে যিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁর নাম সুধীর মান্না; বাবার তিন বাল্যবন্ধুর একজন। দাদুর (ঠাকুর্দা) কাছে শুনেছি এঁদের কথা। একজনের কথা বললাম সুধীর মান্না, আরেকজন হয় অনাথবন্ধু, অখিলবন্ধু বা অধীরবন্ধু, অন্য আরেকজনের নাম মনে পড়ছে না। এঁরা সকলেই নিতান্তই দুঃস্থ, অসহায়, প্রান্তিক জীবনের মানুষ। গ্রামের সাদামাটা, সরল জীবন থেকে দূরে কলকাতা শহরের ছিমছাম জীবনের মধ্যে বসবাস করেও বাবা কিন্তু এঁদের বিস্মৃত হননি কখনো। দেশের বাড়িতে এলে বরাবর খবরাখবর নিতেন, নিজে দেখা করতেন, কখনো খবর পেয়ে তাঁরাও এসে দেখা করে যেতেন বাবার সঙ্গে। বাউল-বেশী সুধীর মান্না তাঁদেরই একজন, যিনি পেশায় ছিলেন নাপিত।

একটু আগেই বলেছি বিন্দু চরিত্রে অভিনয় করা রাজেশ্বরীর কথা। রাজেশ্বরীর ডাকনাম রাজু, আমরা রাজু বলেই ডাকতাম। বাবার দুই কবি বন্ধু বিমল রায়চৌধুরী এবং কবিতা সিংহের মেয়ে। আমরা ছিলাম সমবয়সী। রাজু ছিল আমার থেকে বছরখানেকের বড়ো আর পড়তও আমার থেকে এক ক্লাস উঁচুতে। মারামারি, চুলোচুলি করে কাটিয়েছি আমারা দুজনে, আক্ষরিক অর্থে। দেশের বাড়ির পুকুরে দুজনের একসঙ্গে সাঁতার শেখা। হাজারো দস্যিপনা। 'স্ত্রীর পত্র'র বেশিরভাগ শুটিং হয়েছে বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপো সংলগ্ন 'ধূর্জটিধাম' বাড়িতে। সেখানে ঐ বাড়ির নায়েব মশাই-এর দোনলা বন্দুক নিয়ে পাখি মারার ব্যর্থ চেষ্টা। ঐ বয়সে টিপ করে পাখি মারা মোটেও সহজ নয়। মারতে পারিনি দুজনের কেউই। কিন্তু রাজু বরাবর দাবি করেছে যে সে নাকি একটা পাখি মেরেছিল।

মনে পড়ছে, একবার শুটিং হচ্ছে উত্তর কলকাতার ঠনঠনে রাজবাড়িতে। শুটিংয়ের প্রয়োজনেই সেখানে ছিল ঘোড়ায় টানা একটা জুড়ি গাড়ি। হঠাৎ সকলের অলক্ষ্যে আমরা দুজনে উঠে পড়েছি গাড়িতে। তারপর একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বলেছি, পারবি তো? কে প্রথম লাগাম টেনেছিল বা ছেড়েছিল মনে নেই, তবে গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। গাড়োয়ানরা তখন শুটিং দেখতে ব্যস্ত। প্রথমে ধীরগতিতে পরে একটু একটু করে বাড়ছে গাড়ির গতি। হঠাৎ গাড়োয়ানদের কারো চোখে পড়ে চলন্ত গাড়ির ওপর। ব্যস। চিৎকার চেঁচামেচি, হৈ-হৈ কাণ্ড। দু-দুজন গাড়োয়ান ছুটছে, ছুটছে ইউনিটের অন্যান্যরাও। থামাও, থামাও রব চারিদিকে। কোনোক্রমে সকলের চেষ্টায় থামানো গেছিল। আর আমরা দুজন বেঁচে গেছিলাম অবধারিত দুর্ঘটনার থেকে। কারণ, অনতিদূরেই ট্রাম লাইন, অগুন্তি যানবাহন। পরে জেনেছিলাম, ঘোড়ার লাগাম আলগা করলে ঘোড়া এগোয়, আর টেনে ধরলে থামে। এসব কিছুই না জেনে আমরা কোনোভাবে ছুটিয়ে দিয়েছিলাম গাড়িটি। আমাদের এরকম দুষ্টুমির কথা বলতে গেলে এই লেখা শেষ হবে না এখানে।

দেশের বাড়ি, নাকোলে শুটিং-এর বেশিরভাগ অংশটিতে অনেকের মধ্যে ছিলেন নিমু ভৌমিক এছাড়া সীতা দেবী আর রাজুর কথা তো আগেই বলেছি এবং আরো অনেকে। এখানে একটি শটের উল্লেখ করব, যা তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ। বিয়ের পরের দিন সকালে বিন্দু খেতে বসেছে। তার স্বামী (নিমু ভৌমিক) কোথাও থেকে ঘুরে এসে, খাওয়ার জায়গা সংলগ্ন দোলনায় বসে তার খাওয়ার তদারকি করছে। প্রথম শটে বিন্দু সলজ্জ মুখে বসে খাচ্ছে, দোলায় বসে দুলছে তার স্বামী। পরের শট নিমু ভৌমিক এর দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ, নিমু ভৌমিক এর জাগায় ক্যামেরা বসানো হয়েছে দোলনয়। দোদুল্যমান শটে কখনো ধরা পড়ছে বিন্দুর মুখ কখনো বিন্দুর খাবার, থালা বাসন। কাট। পরের শটে নিমু ভৌমিকের (বিন্দুর পাগল স্বামী)-র big close up, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ক্যামেরা তখন আর দুলছে

না, স্থির। হঠাৎ সে চিৎকার করে ওঠে একি? মা, আমার বৌয়ের সোনার থালা কৈ? বিন্দুর পাগল স্বামীর স্থির বিশ্বাস তার বিয়ে হয়েছে রানী রাসমনির সঙ্গে। অতএব তার স্ত্রীর খাবার থালাবাসন হবে সোনার এটাই সঙ্গত। এদিকে তার পদাঘাতে চারিদিক তখন লন্ডভন্ড।

আরো একটা দুঃসাহসিক শট হল হ্যাজাকের আলোয় পুকুরঘাটে, সন্ধ্যায় দুই জায়ের গা ধোয়ার দৃশ্য। এই শটের জন্য সকলে বাবাকে জেনারেটর ভাড়া নেবার পরামর্শ দেন, বাবা রাজি হননি। দীর্ঘ দিন ধরে তর্ক চলে বাবা ও তাঁর ক্যামেরাম্যানের শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন অসম্ভব, হ্যাজাকের আলোয় এরকম শট হতেই পারে না। শেষ পর্যন্ত বাবার জেদের কাছে নতি স্বীকার করে, শর্তসাপেক্ষে, শট নিতে রাজি হন শক্তি বন্দোপাধ্যায়। আসলে বাবা চেয়েছিলেন চাঁদের আলোর নরম, স্নিগ্ধ অনুভূতিকে ধরতে। যা, জেনারটর ব্যবহার করে, কৃত্রিম আলোয় সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়েছিল বাবার। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা হ্যাজাক ব্যাবহার করা হয়েছিল শটটির জন্য। ইউনিটের বেশ কিছু লোক, ক্যামেরার ফোকাসের বাইরে, অন্ধকারে, পুকুরে নেমে ক্রমাগত ঢেউ খেলিয়ে গেছে জলে, যাতে চাঁদনি রাতের নরম আলোর একটা effect তৈরি হয়। বলা বাহুল্য, এই শট সাড়া ফেলে দিয়েছিল সমগ্র চলচ্চিত্রপ্রেমী মহলে, এমনকি মুম্বাইতেও।

এরকম আরো একটা দুঃসাহসিক শট হল, ক্রোধান্বিত মৃণাল (মাধবী মুখোপাধ্যায়) যখন চিরকালের জন্য তার বিলাসবহুল বাড়ি ছেড়ে, সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে নেমে গলিপথ ধরে জুড়ি গাড়িতে উঠছে, সেই দৃশ্য। আসলে মাধবী মুখোপাধ্যায় আর শক্তি বন্দোপাধ্যায়ের উচ্চতা ছিল প্রায় সমান। দীর্ঘ দিন বাবার সঙ্গে শক্তি বন্দোপাধ্যায়ের আলোচনার শেষে এই শট তেমনি ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি everlasting– এই শট চিরস্থায়ী হয়ে থেকে গেছে সিনেমা প্রেমিকদের মনে। এই শটটিতে একবারের

জন্যও দেখা যায়নি মাধবী মুখোপাধ্যায়কে, অথচ দর্শকদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে মৃণালই চলেছে। Hand held শট, অর্থাৎ running ক্যামেরা হাতে নিয়ে শক্তি বন্দোপাধ্যায়ের সিঁড়ি দিয়ে নামা এবং গলি পথ দিয়ে জুড়ি গাড়িতে ওঠা। পুরোটা কিন্তু একটাই শট, কোথাও কাট নেই, নেই এডিটিং টেবিলের কোনোরকম কারসাজি বা জোড়া তাপ্পি।

এরপর অবধারিতভাবে যে প্রসঙ্গ আসবে তা হল animation প্রসঙ্গ। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, বাবা নানা ভাবে নানা সময়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন Saul Bass-এর দ্বারা। Animation-এ পৌঁছনোর অনেক আগে থেকেই বাবার করা প্রচ্ছদে দেখতে পাই morphing বা রূপান্তর—যার জ্বলন্ত উদাহরণ হল শিবরাম চক্রবর্তীর ‘মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি’ বইয়ের প্রচ্ছদ। মাত্র পাঁচটি ধাপে একটি ‘ওঁ’-কার রূপান্তরিত হচ্ছে ‘তারা হাতুড়ি কাস্তে’তে। ফলে তাঁর এই রূপান্তরের মধ্যেই হয়তো নিহিত ছিল animation-এর প্রতি উৎসাহ বা উদ্দীপনা। হিচককের একাধিক ছবির টাইটেল করতেন Saul Bass। প্রায়ই তাঁর করা টাইটেলে থাকত animation। হয়তো সেখান থেকেই বাবা পেয়েছিলেন animation-র প্রেরণা।

Animation তো হল, কিন্তু ঘাড় ভাঙল আমার। বৈঠকখানা বাজার থেকে আধ রিম ভ্যান্ট্রিয় কাগজ কিনে, যার ওজন প্রায় কুড়ি-বাইশ কেজির মতো, নিয়ে সমস্ত কাগজকে একটা নির্দিষ্ট মাপেকাটিয়ে আনতে হয়েছিল আমাকে। বাবা তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত। সন্ধ্যায়, কখনো রাতে, বাড়ি ফিরে শুরু হত animation-র কাজ বা আঁকা। প্রতিটি কাগজ নিখুঁতভাবে মেপে বের করতে হত তার centre point। Centre point ঠিক না হলে কোনো একটা জিনিস ছোটো থেকে বড়ো হচ্ছে বা একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সোজাসুজি বা কোনকুনি দ্বদ্রডত্র করছে সেটা সঠিক হবে না। এলোমেলো দেখাবে। আর এই কাজটা করার জন্য টেবিল-চেয়ার নয় আসন পেতে মাটিতে বসে আঁকতেন বাবা। তাঁর বক্তব্য ছিল যে centre point যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ওপর থেকে ঐ centre point দেখা, পাশ থেকে নয়, যা চেয়ার-টেবিলে করা সম্ভব ছিল না। কাজ করতে করতে কোনো কোনো দিন রাত একটা-দেড়টা বেজে যেত। তখন ডাক পড়ত আমার। একটানা পা মুড়ে বসে পা ধরে যেত বাবার, উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকত না, তখন আমি গিয়ে হাত ধরে বাবাকে টেনে তুলতাম।

‘স্ত্রীর পত্র’ তৈরি হয়েছিল বছর তিনেক সময় ধরে। ছবির প্রযোজক, ধীরেন রায়, মাত্র তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন, আর দেননি। বাবা নিজের কাজ, চিত্রনাট্য বা পরিচালনার জন্য কোনো পারিশ্রমিক নেননি, ফলে তিনিও ছিলেন এই ছবির co-producer— এর পর বাবা যখন যেরকম অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাতেই একটু একটু করে ছবি চালিয়ে গেছেন। শেষে ছায়াবাণী এই ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে ছবিটি শেষ করে। আগেই বলেছি এই ছবির দ্বিতীয় বর্ষ নাগাদ বাবা আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত হন। ছায়াবাণী পরিবেশনা নেবার অনেক আগে কতবার বাবার অফিসে গিয়ে দেখেছি মাইনের অধিকাংশ টাকা বাবা টেকনিশিয়ানদের জন্য দিয়ে দিচ্ছেন। কারণ টেকনিশিয়ানরা মূলত daily wager, এঁদের টাকা না দেওয়ার অর্থ এঁদের অনাহারে থাকতে বলার সমান।

তিন বছর সময় ধরে ছবিটা তৈরি হয়েছিল বলে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন এ ছবি কোনোদিনই শেষ হবে না। অনেকেই তাই ধীরে ধীরে সরে গিয়েছিলেন। এঁদের অন্যতম হলেন বাবার দুজন assistant director-এর মধ্যে একজন। তাঁকে সবাই তাঁর পদবী, নিয়োগী বলেই ডাকতেন, তাই তাঁর প্রথম নামটা কী মনে পড়ে না। অন্যজন তপন দাশ অবশ্য শেষ পর্যন্ত ছিলেন। এই নিয়োগী প্রথমে অনিয়মিতভাবে আসা-যাওয়া শুরু করেন, পরবর্তীকালে একেবারে অনুপস্থিত হয়ে যান। তখন অলিখিতভাবে তাঁর গুরু দায়িত্ব এসে পড়ে আমার ওপর। আমার কাজ ছিল continuity maintain করা।

এই continuity প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। কোনো একটা শটে মৃণাল বাড়ির ছাদে উঠবে জামাকাপড় মেলতে। শটটা এই পর্যন্তই ছিল, ছাতে ওঠা দেখানো হয়নি। শটটা নেওয়া হয়েছিল অনেক আগে,

তার প্রায় বছর খানেক ব্যবধানে দেখানো হচ্ছে মৃণাল ছাদে শাড়ি মেলছে। হঠাৎ দেখি তর্ক বেঁধেছে তিনজন—বাবা, মাধবী মুখার্জি আর শক্তি বন্দোপাধ্যায়ের মধ্যে। কেউ বলছে শট শেষ হয়েছিল যখন মৃণাল তখন সিঁড়ির বাঁদিক দিয়ে উঠেছিল, কেউ বলছে না ডানদিক দিয়ে। আমি অনেকক্ষণ ধরে শুনছিলাম, কিছু বলার সাহস হয়নি, বাবার কাছে ধমক খাব ভেবে। শেষে মাধবীদি (মাধবী মুখোপাধ্যায়কে আমি বরাবরই মাধবীদি বলেই ডাকি) ভয়ে ভয়ে মাধবীদিকে বললাম আগের শটে তো দেখানো হয়নি তুমি ছাদে উঠছ, তার আগেই কাট হয়ে গেছে। তো এখানে ডানদিক বাঁদিক না দেখিয়ে straight শটে যদি দেখানো হয় যে দরজার সেন্টার দিয়ে তুমি ছাদে উঠলে তাহলেই তো সমস্যা মিটে যায়। মনে আছে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন মাধবীদি। দেখুন পূর্ণেন্দুবাবু, আপনার ছেলে কী বলছে। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে নিল যে এটাই best solution।

‘স্ত্রীর পত্র’ ছবির সঙ্গে আমার আরো এক বিশেষ যোগ আছে, তা হল এর সঙ্গীত (বলা ভালো effect sound) নিয়ে। ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নাম আছে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। ছবিতে একটি মীরার ভজন আছে যেটি গেয়েছিলেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আছে একটি পুরাতনি টপ্পা—এটি রাকুমার নিজেই গেয়েছিলেন। এসবই তাঁর তত্ত্বাবধানে হয়েছে, শুধু তাই নয় টাইটেলে ব্যবহার করা ওনার তত্ত্বাবধানে হয়েছে বাজানো একটি তবলা লহরি। কিন্তু এ বাদে বাকি সমস্ত sound effects আমাদের পিতা-পুত্রের দেওয়া। মোটামুটি রাত সাড়ে দশটা-এগারোটা নাগাদ, চারিদিক একটু নিশ্চুপ হয়ে গেলে রেডিওতে শর্ট ওয়েভের নানান রকম বিচিত্র sound, tape recorder-এ record করে রাখা হত। আমাদের এই বিচিত্র শব্দ সমারোহে বাদ যায়নি রান্নাঘরের বাসনপত্রও। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, ছবিতে আছে মৃণালের ভাই (শ্যামল ঘোষ) যে বিপ্লবী ছিল, সে তার দিদির অনুপস্থিতিতে, তার গয়নার বাক্স থেকে একটা বাজুবন্ধ সরিয়ে নিচ্ছে এবং মনে মনে কল্পনা করছে তার হাতে বাজুবন্ধ নয় উঠে আসছে একটা পিস্তল। তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে গুলি চলার মত (কর্কশ নয়) কিছুটা সুরেলা শব্দ ভেসে আসে। এই শব্দটা কিন্তু তৈরি করা হয়েছিল একটা এসরাজের চামড়ার অংশের ওপর (ঢাকের কাঠির মতো) ছবি আঁকার তুলির বাঁট পিটিয়ে।

ছবির শেষেও আছে একটা চমক। প্রতিবাদী মৃণাল যখন চিরকালের জন্য প্রাসাদোপম বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তখন তার ঐ বিপ্লবী ভাইকে দায়িত্ব দেয় যে সে যেন বিন্দুকে খুঁজে আনে। শেষ দৃশ্যে দেখতে পাই সমুদ্রতীরে বসে আছে মৃণাল একা, সেখানে উপস্থিত হয় তার ভাই। মৃণাল যখন জানতে চায় বিন্দুর কথা, তখন দেখি তার ভাই বালির ওপর আঁচড় কেটে বিন্দু শব্দটা লিখে, পুরো হাত দিয়ে মুছে দেয় তার নাম। তাকে বলতে শোনা যায় ‘বিন্দু আর নেই’। তখন এক বিন্দু জল পড়ে বালির ওপর, মুহূর্তে সেই জল শুষে নেয় বালুচর। কিন্তু চমকটা সেখানে নয়, চমকটা তার একটু আগে। যখন মৃণালের ভাই এসে বসে তার পাশে তখন তাদের অনতিদূরে দেখা যায় একটা পাকানো খড় বা গাছের শেকড়-বাকড় (যেটা পাকিয়েছিলেন বাবাই) অনেকটা খ্রিস্টানদের ক্রসের মতো কিছু একটা পড়ে আছে। হঠাৎ একটা ক্রস কেন? অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি বাবাকে ক্রসের কথা, মুচকি হেসেছেন শুধু, কোনো উত্তর দেননি কখনো। শুধু বলতেন, এখন নয় বড়ো হলে বুঝবি। আজো এত বছর পরেও সঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না ঐ ক্রসের অর্থ। বাবা কি বিন্দুর মৃত্যু বা মৃণালের sacrifice-কে যিশুর ক্রুসিফিকেশনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন? জানা হল না। আমার আর বড়ো হওয়া হল না।

শেষ করি এই বলে, যা অনেকেই হয়তো জানেন, যে পাঁচটি চলচ্চিত্র বাবা পরিচালনা করেছিলেন তাদের মধ্যে এই দ্বিতীয় ছবি ‘স্ত্রীর পত্র’ শুধু বাণিজ্যিক ভাবেই সফল নয়, দেশে-বিদেশে নানাভাবে সমাদৃত ও পুরস্কৃত।

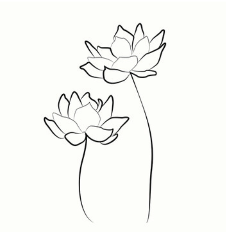

অলকার ডায়েরি

প্রণব দত্ত

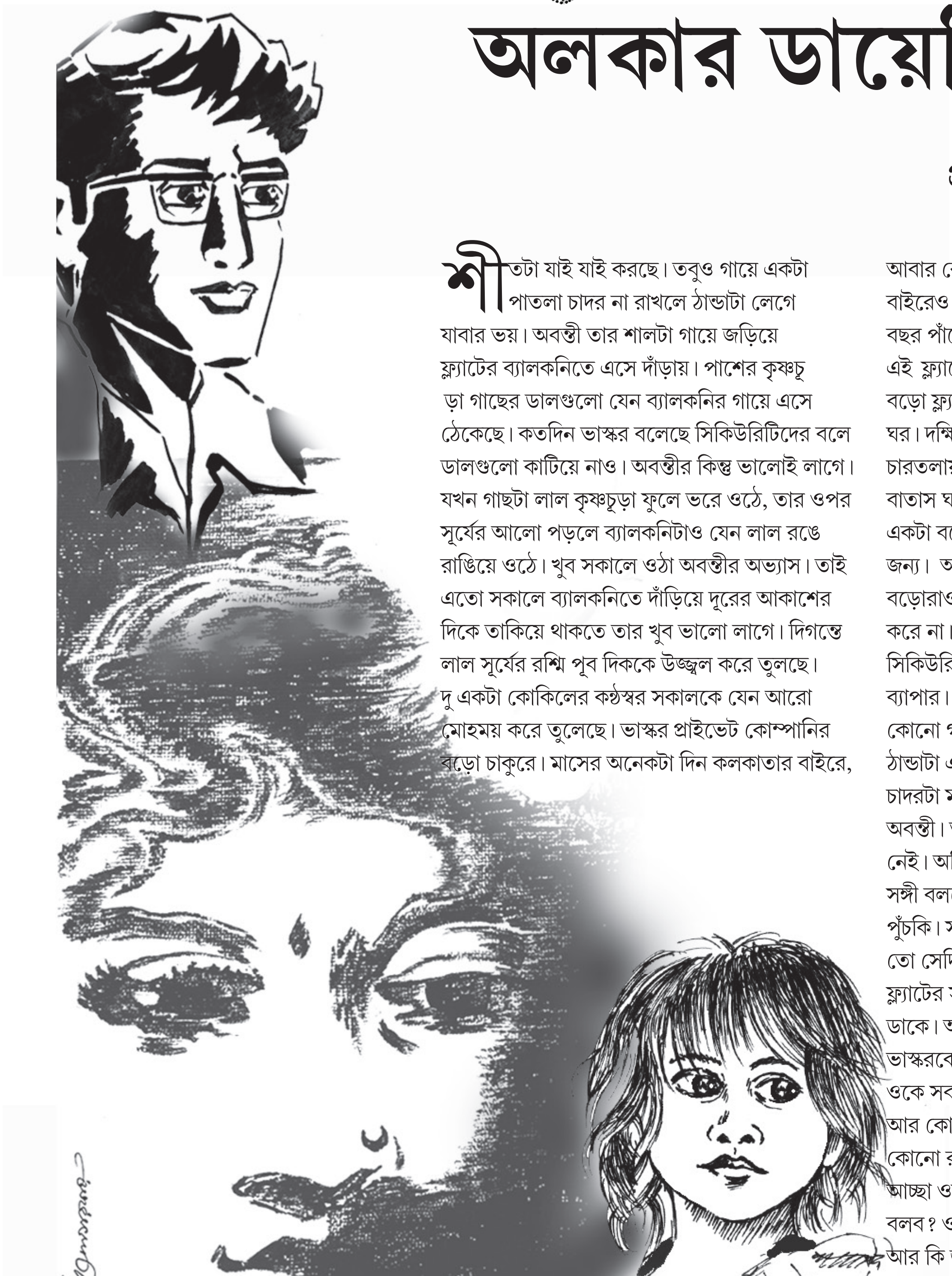

শীতটা যাই যাই করছে। তবুও গায়ে একটা পাতলা চাদর না রাখলে ঠান্ডাটা লেগে যাবার ভয়। অবন্তী তার শালটা গায়ে জড়িয়ে ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালগুলো যেন ব্যালকনির গায়ে এসে ঠেকেছে। কতদিন ভাস্কর বলেছে সিকিউরিটিদের বলে ডালগুলো কাটিয়ে নাও। অবন্তীর কিন্তু ভালোই লাগে। যখন গাছটা লাল কৃষ্ণচূড়া ফুলে ভরে ওঠে, তার ওপর সূর্যের আলো পড়লে ব্যালকনিটাও যেন লাল রঙে রাঙিয়ে ওঠে। খুব সকালে ওঠা অবন্তীর অভ্যাস। তাই এতো সকালে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে তার খুব ভালো লাগে। দিগন্তে লাল সূর্যের রশ্মি পূব দিককে উজ্জ্বল করে তুলছে। দু একটা কোকিলের কণ্ঠস্বর সকালকে যেন আরো মোহময় করে তুলেছে। ভাস্কর প্রাইভেট কোম্পানির বড়ো চাকুরে। মাসের অনেকটা দিন কলকাতার বাইরে, আবার কোনো কোনো সময় দেশের বাইরেও কাটাতে হয়।

বছর পাঁচেক হল ওরা সল্টলেকের এই ফ্ল্যাটে শিফ্ট করেছে। বেশ বড়ো ফ্ল্যাট। তিনটে বড়ো বড়ো ঘর। দক্ষিণমুখী। রাতের বেলায় চারতলায় জানলা দিয়ে হু হু করে বাতাস ঘরে ঢোকে। বাড়ির সামনে একটা বড়ো পার্ক। শিশুদের জন্য। অবশ্য শিশুদের নাম করে বড়োরাও তা ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না। ক্যাম্পাসের ঢোকার মুখে সিকিউরিটি। বেশ আঁটোসাটো ব্যাপার। নিরাপত্তার দিক থেকে কোনো গাফিলতি নেই। আজ যেন ঠান্ডাটা একটু বেশি মনে হচ্ছে। চাদরটা মাথার উপর টেনে দেয় অবন্তী। ভাস্কর দুদিন হল বাড়িতে নেই। অফিসের কাজে দিল্লি গেছে। সঙ্গী বলতে তাদের একমাত্র কন্যা পুঁচকি। সবে নয় মাস বয়স। এই তো সেদিন ওর মুখে ভাত হল। ফ্ল্যাটের সবাই ওকে পুঁচকি বলেই ডাকে। অবন্তী রাগের ভান করে ভাস্করকে বলে তোমার জন্যই ওকে সবাই পুঁচকি বলে। তুমি কি আর কোনো নাম পেলে না। ভাস্কর কোনো রকম ভনিতা না করে বলে, আচ্ছা ওকে পুঁচকি বলব না তো কি বলব? ওইটুকু একটা ছোট্টো মেয়ে। আর কি জানো, ওকে যখন বেড়ে তোমার পাশে শুইয়ে গিয়েছিল। আমরা মানে আমি, আমার বোন,

মা, কাকিমা তখন গিয়ে পড়েছিলাম। কিছুতেই ওর চোখ খুলছিল না। আমি যেই পুঁচকি বলে ডাকলাম ওমনি পিটপিট করে আমার দিকে তাকিয়ে যেন হাতটা নাড়ল। তখনই বুঝলাম ঐ নামটাই ওর পছন্দ। তাই তো ওকে আমি পুঁচকি বলে ডাকি।

না, এটা কিন্তু ঠিক হল না। বড়ো হয়ে যখন শুনবে তুমি ঐ নামটা দিয়েছ তখন দেখবে কী হয়?

কী আর হবে এভিডেবিট করে নামটা বদলে দেব। হাহা করে হেসে ওঠে ভাস্কর।

বড়ো আদরের মেয়ে ওদের। কিন্তু অবন্তীর মাথায় চিন্তার মেঘ। কী করে এই মেয়েকে মানুষ করবে। অবন্তী তো শুধু হাউসওয়াইফ নয়, সে নিজেও তো একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে। মেয়ে হবার সময় প্রায় ছ'মাস মেটারনিটি লিভে ছিল। কিন্তু ওটারও তো সীমা আছে। ভাস্কর বার বার বলে চলেছে আর চাকরি করতে হবে না, চাকরিটা ছেড়ে দাও। চাকরি ছাড়তে মন চায় না অবন্তীর। মধ্যবিত্ত ঘরের আবহে বেড়ে ওঠা অবন্তী মনে করে সমস্ত মেয়েদেরই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকা দরকার। তাই ভাস্করের আবেদনকে মেনে নিতে পারে না অবন্তী।

অবন্তীর শাশুড়ি মা খুবই করিৎকর্মা। মেয়ে হবার সময় অনেকদিন এখানেই ছিলেন। উনিই সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি মেয়েকে কাজে বহাল করে ছিলেন। শান্তশিষ্ট যেন সাত চড়ে রা কাড়ে না। ওকে বিশেষ করে বলে দেওয়া হয়েছিল বাচ্চার দেখভাল করতে। ওর যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। ঐ যাকে আমরা আয়া বলি। তবে ওর সঙ্গে কথা বলে বোঝা গিয়েছিল ও এখনো পেশাদার আয়াতে পরিণত হয়নি। শাশুড়ি মা ওকে পই পই করে বলে গেছেন সকাল আটটার আগে আসতে আর রাত আটটার পরে কাজ সেরে বাড়ি যেতে।

মেয়েটির নাম অলকা। বয়স বড়ো জোর পঁচিশ হবে। অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। ওর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ওরও একটা মেয়ে আছে। ওর স্বামীর কাজ বলতে কিছু নেই। ওই স্টেশনের পাশে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান। কুঁড়ে লোক। কোনোদিন খোলে, কোনো দিন খোলে না। অলকার পয়সাতেই সংসার চলে।

চেনা একটা ইংরেজি গানের সুরে কলিং বেলটা বেজে উঠল। ইলেকট্রিসিয়ান বাবু ঐ বেলটা লাগিয়ে বলেছিল, বৌদি এই বেলটা লাগালাম দেখবেন বাড়িতে কেউ এলে একটুও বিরক্তি লাগবে না। বরং দু-একবার বেল বাজালেও ভালো লাগবে। সত্যি তাই। দরজা খুলতেই অলকার হাসি মুখ। এই ঠান্ডাতেও কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম। শাড়ির আঁচলটা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢোকে, কিগো দিদি, আমাদের সোনাদিদি ঘুম থেকে ওঠেনি? বলতে বলতে মেয়ের শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ মনে পড়ে ডাইনিং-এর বেসিনে হাতটা ধুয়ে নেয়।

দিদি, আমি কাপড়টা চেঞ্জ করে তারপর সোনা দিদিকে ঘুম থেকে তুলব।

ঠিক আছে। তুই আগে আমাকে এককাপ চা করে দিবি। তোর জন্যও করবি। আমি আর একটু এখানে দাঁড়াই।

ঠিক আছে, তুমি দাঁড়াও আমি চা করে আনছি।

যদিও রান্নার মাসিই চা-টা করে। কিন্তু নাতির নাকি খুব শরীর খারাপ তাই দু-দিন হল আসছে না। আর এই জন্য অবন্তীকেও ছুটি নিয়ে রান্নাঘর সামলাতে হচ্ছে। তবে অলকা ওকে খুব সাহায্য করে। মাঝে মাঝে ভাবে অলকা না থাকলে খুব অসুবিধা হত। ভাস্করকে বলেছিল, ওর পারিশ্রমিকটা একটু বাড়িয়ে দিলে হয় না। ভাস্কর কর্পোরেট কর্তার মতো, কেন ও তো আয়া, আর ওদের তো ডেইলি যা চার্জ তা তো আমরা দিচ্ছি, এর ওপর আর কেন বেশি দিতে বলছ!

ও কি শুধু আয়া? ওতো আমাদের পুঁচকির বন্ধুও। ও যে শুধু পয়সার বিনিময়ে আমাদের মেয়েকে দেখভাল করেছে এটা তোমার মনে হচ্ছে আর আমাদের মেয়েকেও দেখো, ওকে দেখলে কেমন যেন আনন্দে নেচে ওঠে।

ভাস্কর চুপ করে যায়। তোমার যা মনে হয় কর। আর কথা বাড়ায় না অবন্তী। বেশি টাকা দিতে গেলেও অলকা নিতে চায় না। তার পর অনেক বুঝিয়ে ওকে নিতে বলেছিল অবন্তী। অলকা লজ্জা লজ্জা সুরে বলেছিল, দিদি, তোমরাও খুব ভালো। রান্নার মাসি অবশ্য খুব বেশি কামাই করে না। বলে, বৌদি আমি তো জানি তুমি চাকরি করো। তোমার রান্না করার সময় কোথায়? এটা যেমন ঠিক আবার বৌদির কাছে আবদার করলে কিছু সাহায্যও পাওয়া যায় সেটাও ঠিক।

অবন্তীর বড়ো ভরসা এখন অলকা। মাসি না এলে রান্নার কাজে অলকাও তাকে সাহায্য করে।

পুঁচকির সঙ্গে ওকে খেলতে দেখে ভাস্করও মাঝে মাঝে বলে, মেয়েটা সত্যিই খুব ভালো।

কাজে নেবার পর অলকাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল ও বারাসাতের কাছে কোনো একটা জায়গায় থাকে। রোজ সকালে ট্রেনে করে উল্টোডাঙায় নেমে তাদের বাড়িতে আসে। ওর বাড়িতেও কেউ নেই। দরমার বেড়া দেওয়া ঘর। জমিটা অবশ্য সরকার থেকে ওর শ্বশুর পেয়েছিল। এখন শ্বশুর-শাশুড়ি কেউ নেই।

তোর মেয়েকে কোথায় রেখে আসিস?

ও থাকে পাশের বাড়ির কাকিমার কাছে। ওনাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। আমার মেয়েকে খুব ভালোবাসে। আমাকে বলে অলকা, তুই কোনো চিন্তা করিস না, তোর মেয়ে আমাদের কাছে ভালোই থাকবে। দেখতে দেখতে তিন বছর হল। পাড়ার প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি ওকে। ওর বাবার একটাই কাজ—স্কুলে মেয়েকে নিয়ে যাওয়া আর নিয়ে আসা। আর সব দায়িত্ব কাকিমার।

ভোর চারটেয় উঠে রান্না করতে বসে অলকা স্বামীর দুবেলা ভাত ফুটিয়ে আর মেয়েকে স্কুলের জন্য রেডি করে বেরিয়ে পড়ে ট্রেন ধরতে। স্টেশনে যাবার পথে মর্নিং ওয়াক করতে বেরোনো অরবিন্দু কাকু, হরিপদ কাকুরা ডেকে বলে, কিরে অলকা তোকে এখন দেখি না যে বড়ো।

কাকু এখন বড়ো তাড়া ট্রেন ধরবার। আমি পরে সব বলব। শুধু বলে রাখি আমি একটা কাজ পেয়েছি।

বেশ বেশ, এতো খুব ভালো খবর রে। তোকে আর দেরি করাব না তুই এগিয়ে যা।

আসলে অলকা এলাকার মানুষের কাছে একটা প্রিয় নাম। অলকার বাবা কোনো দিন কোনো কাজ করেনি। মা গতরে খেটে যা আয় করত তাতেই ওদের কোনো রকমে খাবার জুটত। সরকারি প্রাথমিক স্কুল থেকে মাধ্যমিক স্কুল সব জায়গায় অলকা ছিল বেশ ভালো ছাত্রী। পড়াশুনাতেও অতি মেধাবী না হলেও মোটামুটি ভালোই ছিল। সরকারি বদান্যতায় স্কুলে পড়ার জন্য কোনো টাকা পয়সা দিতে হত না। তাই মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। সহপাঠী বন্ধু আর মাস্টারমশাইদের সাহায্যে বইপত্তর নিয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি। বেশ চলছিল অলকার জীবন। মাধ্যমিক পাশ করার খবরটা পেয়ে আনন্দে দৌড়তে দৌড়তে ঘরে এসে দেখল ঘরে কয়েকজন অপরিচিত লোক বসে আছে। ঘরের বাইরে থেকেই মাকে ডেকে চুপি চুপি বলে,

মা এরা কারা?

মাও আস্তে আস্তে বলে, ওরা তোকে দেখতে এসেছে।

তার মানে?

মানে হল, আমরা আর কতদিন বল। তোর বিয়ে দিতে না পারলে আমরা তো মরেও শান্তি পাব না।

অলকার পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে যায়। ওর হাতের মাধ্যমিক পাশের রেজাল্টটা একেবারে গৌণ হয়ে যায়। মা তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায়। কোনো রকমে একটা কাচা শাড়ি পরিয়ে ঐ লোকগুলির সামনে নিয়ে আসে অলকাকে। বয়স্কমতো একটা লোক প্লেট থেকে একটা রসগোল্লা মুখে পুরে বলে, আর আসতে হবে না। আমাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে। ঘোরের মধ্যে দিয়ে অলকা মায়ের সঙ্গেই ভেতরে ঢুকে যায়। মা-বাবা কেউই একবারের জন্যও জিজ্ঞাসা করে না এতক্ষণ সে কোথায় ছিল বা তার হাতে ঐ কাগজটা কিসের?

জানিস অলকা, ছেলেটা ভালোই। পাড়ার একটা চায়ের দোকানে কাজ করে। তবে বলেছে নিজেই একটা দোকান করবে। মার কথা অলকার কানে ঢোকে না। তার স্বপ্ন সব চুরমার। কত আশা ছিল পড়াশুনো করে সে চাকরি করবে। সেটা আর হল না। মা-বাবা স্থির করে রেখেছে এখানেই বিয়ে দেবে। কারণ ছেলের কোনো দাবি-দাওয়া নেই। মিষ্টি আর কচুরি খেয়ে পাত্রপক্ষ বিদায় নেয়। রাতে মাকে জড়িয়ে ধরে অলকা বলে, মা, তোমরা কি আমার সত্যি বিয়ে দিয়ে দেবে।

মার চোখেও জল। মেয়ের হাতটা জড়িয়ে ধরে বলে, দেখ মা, গরিবের ঘরে তুই জন্মেছিস। আর গরিব বাবা-মার তো আর কিছুই করার নেই। তার ওপর তুই সুন্দর দেখতে। তোকে কী করে আমরা বাড়িতে রাখি বল।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে অলকা। তার বাবা-মা তার জন্য এই ভবিষ্যৎ রেখে যাচ্ছে। রাগে অভিমানে তার চোখ জলে ভিজে যায়।

বিয়ে হয়ে যায় অলকার। বরের নাম সদানন্দ। এখানে এসে বুঝতে পারে সদানন্দ তেমন কিছুই করে না। বাবার হোটেলে খায় দায় আর বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মেরে বেড়ায়। বাবা পাড়ার পোস্টাপিসে সারাদিন বসে চিঠি চাপাটি বা বিভিন্ন ফর্ম ফিলাপ করে কিছু রোজগার করে তাতেই তাদের সংসার চলে। সদানন্দ নাকি গাড়ির ড্রাইভার। মাঝে মাঝে ডাক পেলে যায়, নয়তো বসেই থাকে। মাধ্যমিক পাশ অলকা অথৈ জলে পড়ে। শাশুড়ির বয়স হয়েছে, সারা বছরই অসুস্থ থাকে। সংসারের সমস্ত ভার এসে পড়ে অলকার উপর। প্রতিবেশীরা তাকে দেখে ভাবে ওরা, মানে সদানন্দরা, কীভাবে এই মেয়েকে পেল? পাশের বাড়ির কাকিমাই প্রথম এসে ওকে শুধায়,

বৌমা, এখানে তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে তাই না।

না না, অসুবিধা কিসের? আমার বাবা-মাই তো এই বিয়ে ঠিক করেছে। ওরা যা ভালো বুঝেছে করেছে। না কাকিমা, আমি ঠিক মানিয়ে নেব।

এই ভাবে দিন এগিয়ে চলে। ইতিমধ্যে অলকার পেটে বাচ্চা এসেছে। ডাক্তারবাবু বলেছে এই সময় একটু ভালো খাবার খেতে। বলাই সার। যেখানে দুবেলা খাবার জোটাতেই হিমশিম, সেখানে আবার ভালো খাবার। যথা সময়ে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় অলকা। শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীর ব্যবহার দেখে সে অবাক হয়। যেন সে খুব অন্যায় করে ফেলেছে মেয়ের জন্ম দিয়ে। সরকারি হাসপাতালে মেয়ের জন্ম হওয়ায় কোনো পয়সাই খরচ করতে হয়নি ওদের। তবুও এমন ভাব যেন ছেলে হলে হাতের চাঁদ পেত ওরা।

ওর মা-বাবা অনেকবার পোয়াতি অবস্থায় ওদের কাছে চলে যেতে বলেছিল। রাগে অভিমানে মা-বাবার সেই প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বাচ্চাটাকে তার শাশুড়ি ভালো মনে না গ্রহণ করলেও কাকিমা খুব আদর করে কোলে নিয়েছিল। বলেছিল, ও এখন থেকে আমার কাছেই থাকবে। তোদের কোনো চিন্তা করতে হবে না। ফুটফুটে মেয়ে, ওজনটা একটু কম। তা হবেই বা না কেন। মায়ের যদি সুষম খাবার না জোটে বাচ্চা কীভাবে বেশি ওজন হবে?

যাই হোক কোনো রকমে চলছিল সংসার। একদিন দুপুরে পাড়ার একটা ছেলে সাইকেলে এসে খবর দিল গোবিন্দ জেঠু অর্থাৎ অলকার শ্বশুর পোস্ট অফিসেই মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। মাথা ফেটে একদম রক্তারক্তি ব্যাপার। বাড়িতে অসুস্থ শাশুড়ি। বাচ্চাটাকে পাশের বাড়িতে রেখে ছোটে অলকা। সেখানে গিয়ে দেখে ইতিমধ্যে ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওখান থেকে আবার হাসপাতাল। সেখানে গিয়ে সদানন্দ অর্থাৎ তার বরের দেখা পায়। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে বাবার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে। সদানন্দ কোন উত্তর দেয় না। বার বার বলাতে সদা শুধু একটা কথা বলে, বাবা আর নেই। মাথার ওপর যেন বাজ ভেঙে পড়ে অলকার। সংসারের একমাত্র রোজগেরে লোকটাই আর রইল না।

যতটুকু টাকা জমানো ছিল তাই দিয়ে সংক্ষেপে শ্রাদ্ধশান্তি সেরে ফেলা তো হল। এরপর কী হবে! সদানন্দ মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। এখন গাড়ি চালাবার ডাকও তেমন পায় না। ট্রাভেল এজেন্সির মালিকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে সেই পথটাও বন্ধ করেছে সে। অলকা সদানন্দর কাছে এসে বসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, বাবা তো চলে গেলেন, এবার তো কিছু করতে হবে। চুপ করে থাকে সদানন্দ।

দেখ, কতজনই তো কত কিছু করছে। তুমিও কিছু করার চেষ্টা কর।

কী করব আমি? কিছু করতে গেলে তো টাকা-পয়সা চাই সেইটাই তো আমার কাছে নেই।

আচ্ছা, আমি যদি কিছু করি।

কী করবে?

এই বাবুদের বাড়িতে যদি কাজ ধরি। সদানন্দ বাউণ্ডুলে হতে পারে তবে নিজের শিক্ষিত বউ সম্বন্ধে মনের ভিতর একটা গর্ব পোষণ করত। উঠে দাঁড়ায় সে। না না, তা কী করে হয়। তুমি কখনোই কারো বাড়িতে ঝি-এর কাজ করবে না।

তবে সংসার চলবে কী করে। তোমার মায়ের ওষুধের খরচ, আমাদের মেয়ের খরচ!

চুপ করে থাকে সদানন্দ। অলকা এবার বলে, শোনো একটা কাজ করতে পারবে? ওর দিকে তাকায় সদানন্দ, কী কাজ?

আমি কিছু জিনিস বানিয়ে দেব, তুমি স্টেশনের প্লাটফর্মে সেগুলো বিক্রি করবে।

উৎসুক হয়ে ওঠে সদানন্দ। কী জিনিস বানাবে? না, বেশি কিছু নয়, আমার হাতেও তো বেশি টাকা নেই। এই ঘুগনি বানিয়ে দেব, তুমি ঘুগনির হাড়িটা আর সঙ্গে পাউরুটি নিয়ে বসবে। দেখবে ঠিক বিক্রি হয়ে যাবে।

কথাটা সদানন্দের মনে ধরে। সদানন্দই উদ্যোগী হয়ে দোকান থেকে সামগ্রী আর রুটি নিয়ে পাড়ি দেয় স্টেশনের দিকে। প্লাটফর্মে বসতে গেলে আবার রেলপুলিশের ঝামেলা। কিন্তু দু-একবার স্টেশন মাস্টারবাবুর মেয়েকেও শ্বশুরবাড়িতে গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসার কারণে ওকে পুলিশ বিরক্ত করে না। বিরাট কিছু আয় না হলেও অল্প অল্প লাভ হচ্ছিল। কিন্তু ওই বাউণ্ডুলেপনা যাবার নয়। মাঝে মাঝেই শরীর খারাপের অজুহাতে বাড়ি থেকে বেরোত না সদানন্দ। গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে অলকা। এইভাবে চললে তো সংসার অচল হয়ে যাবে। কোনো রকমে টানতে টানতে দিন এগিয়ে যায়। প্রায় বছর খানেক কেটে যায়। সূর্যের কোনো আলো অলকাকে স্পর্শ করতে পারে না।

অলকা, এই অলকা, ঘরে আছিস?

হ্যাঁ কাকিমা। কিছু দরকার আছে?

তুই একটু আমার কাছে আয় তো।

হ্যাঁ আসি, বলে উঠে দাঁড়ায় সে। বাচ্চা মেয়েটা এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এখনই উঠবে বলে মনে হয় না। আস্তে আস্তে পাশের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায় সে।

কাকু আর কাকিমা দুজনেই একটা সোফার ওপর বসে। কাকু আগে সবকারি অফিসে কাজ করতেন। এখন রিটায়ার করেছেন। কাকুর হাতে সেদিনকার খবরের কাগজ। কাকিমা তাকে বসতে বলে ভিতর থেকে হাতে করে কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে অলকার হাতে দিয়ে বলল, নে বিস্কুটটা খেয়ে নে। মদনের মা চা-টা দিয়ে যাবে। আমরাও এখনো চা খাইনি।

অলকার সত্যি খিদে পেয়েছিল, তবুও বিস্কুট হাতে নিতে লজ্জা পাচ্ছিল। কাকিমা জোর করে হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, নে আর লজ্জা করতে হবে না।

শোন, যেই জন্য তোকে ডেকেছিলাম। বলে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে একটা খবরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, দেখ, তোদের অবস্থা তো আমি সব জানি। তোর শরীর খারাপ হলে কেউ এক গ্লাস জল পর্যন্ত দেবার কেউ নেই। আর সদানন্দটা তো কোনো কাজের নয়। আজকে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম। এক ভদ্রমহিলা তার বাচ্চার দেখাশুনা করার জন্য একজন মহিলা আয়া চাইছেন। পয়সাকড়িও ভালোই দেবেন লিখেছেন। তা, তুই কি একবার গিয়ে দেখা করবি?

অলকা নিরুত্তর থাকে। কাকু বলেন, না না থাক, ওকে ঐ আয়ার কাজ করতে হবে না।

কাজ করতে হবে না তো কী করবে? বাচ্চাটাকে নিয়ে মরবে?

এই ফাঁকে বলে নিই শ্বশুরমশাই দেহ রাখার পাঁচ মাসের মাথায় শাশুড়িও সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে যান। বাবা মারা যাবার থেকেই মা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। অলকা অভাব অনটনের মধ্যেও শাশুড়িকে ভালো রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করেও রাখতে পারেনি।

কাকিমা, কোথায় যেতে হবে?

এই তো ঠিকানাটাও দেওয়া আছে। কলকাতার কাছে সল্টলেকে। তুই যদি রাজি থাকিস কাকু তোকে ঠিকানাটা লিখে দেবে।

অলকা আর কোনো পথ খুঁজে পায় না। বাচ্চা মেয়েটাকে মানুষ করতে গেলে এছাড়া আর কোনো পথের দিশা সে দেখতে পায় না। কি রে যাবি? মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় সে।

তাহলে শুভস্য শীঘ্রম। একটা ডায়রির পাতায় গোটা গোটা করে ঠিকানাটা লিখে অলকার হাতে দেন কাকু। ‘কাল সকালেই চলে যা। দেখ তোর ভাগ্যে কী আছে।’

পরদিন খুব ভোরে উঠে স্নানটান সেরে নেয় অলকা। মেয়ের খাবারটা তৈরি করে আর ওর স্কুলের জামাকাপড় আর বইয়ের ব্যাগটা রেডি করে এসে দেখে বাপ মেয়ে দুজনেই ঘুমে কাতর। সদানন্দকে ঝাঁকুনি দিয়ে তুলতেই, থমমত খেয়ে বলে, ‘ও, সকাল হয়ে গেছে?’

না, এখনো রাত রয়েছে।

তুমি এতো সকালে সেজেগুজে কোথায় চললে?

কেন, তোমাকে কাল রাত্তিরে বললাম না।

না অলকা, আর একবার চিন্তা কর, আয়ার কাজটা তুমি নেবে?

আমার আর চিন্তার সময় নেই। আগে তো আমাদের বাঁচতে হবে।

আর কথা বাড়ায় না সদানন্দ। অলকা বেরিয়ে পড়ে স্টেশনের দিকে। সকালবেলা এত ভিড় থাকে না। ট্রেন বেশ ফাঁকা। লেডিস কামরার এককোণে জানালার পাশে এসে বসে। ট্রেন ছেড়ে দেয়। সে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে। বাড়ি ঘর, গাছপালা সব যেন দ্রুততার সঙ্গে ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে মুহূর্তের বিশ্রাম তারপর আবার ছুটে চলা। অলকাও যেন কোনো সুদূরের পথে ছুটে চলেছে, সে জানে না কোথায় এর শেষ। হঠাৎ সম্বিৎ ফেরে। ট্রেন উল্টোডাঙা স্টেশনে এসে থেমেছে। তাড়াতাড়ি ট্রেন থেকে নেমে পড়ে। নামতে গিয়ে পায়ের চটির একটা স্ট্র্যাপ গেল ছিঁড়ে। ভাবতে বসে তবে কি বাধা পড়ল। তবে কি কাজটা হবে না। ভাবতে ভাবতে আর পা টানতে টানতে স্টেশনের বাইরে এসে দেখে এক মুচি বসে আছে। তার কাছে গিয়ে পাঁচ টাকা

দিয়ে চটিটা মেরামত করার পর মনে একটু জোর খুঁজে পায়। কাকু বলে দিয়েছিল ট্রেন থেকে নেমে অটোতে চেপে ওই কাগজটা দেখালে ওরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে। সেই মতো সারি সারি অটো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন অটোয়ালার কাছে গিয়ে ও ঠিকানা লেখা কাগজটা দেখায়। অটো ড্রাইভারটি খুবই ভদ্র বলে, দিদি এই লাইনে একদম প্রথম যে গাড়িটা আছে ওটাতে উঠে যান। অলকা আস্তে আস্তে ঐ গাড়িতে গিয়ে ওঠে। অটো ভর্তি হতেই ছেড়ে দেয়। অবাক হয়ে যায় অলকা কত বাড়ি, সুন্দর সুন্দর ডিজাইন, এই হচ্ছে সল্টলেক। এর কথা কত শুনেছি, এই প্রথম চোখে দেখলাম।

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে অটো থামে। ড্রাইভার ছেলেটি অলকাকে বলে, সামনে ডানদিকে গিয়ে কাউকে এই ঠিকানাটা দেখাবেন সেই বলে দেবে। মাথা নাড়িয়ে সায় দেয় অলকা। একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই নির্দেশটা পেয়ে যায় অলকা। সে প্রায় বাড়ির নীচে এসেই দাঁড়ায়। বাড়ি সামনেই একটা বড়ো পার্ক। এতো সকালে পার্কটা ফাঁকাই তবে দু-চার জন বয়স্ক মানুষ বেঞ্চের উপর বসে গল্প করছে। চারদিকে সবুজের সমারোহ। কলকাতা শুনেছিল নাকি ইট কাঠ পাথরের শহর, কিন্তু এই সল্টলেককে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। দুরু দুরু বক্ষে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের সামনে এসে বেল বাজায় অলকা। প্রথমবার বাজালেও ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। সে আর একবার বাজায়। এবার দরজার ছিটকিনি খোলায় শব্দ পায়। কোলাপসিবল গেটটা তখনো বন্ধ। দরজার ওপারে এক মহিলা। কি চাই, কাকে চাই? উনি কে বুঝতে পারে না অলকা। আমতা আমতা করে বলে, মানে আমি...

বলি আমিটা কে? তোমাকে তো আগে কোনোদিন দেখিনি। আর এতো সকালেই বা কেন এসেছ? এখন কিছু কেনা যাবে না। বলে অলকার মুখের পর দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে এক মহিলা কণ্ঠ, কে রে রাধা।

জানি না বৌদি।

দাঁড়া আমি আসছি। বলতে বলতে এক সুবেশা মহিলা এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়।

কী ব্যাপার। তুমি কী জন্য এসেছ?

আজ্ঞে, বলে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনটা দেখায় অলকা। বিজ্ঞাপনটা দেখেই মহিলার চোখে যেন একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল।

রাধা, দরজাটা খুলে দে। আর ওকে ভেতরে আসতে বল। তারপর মাকে মানে, ওর শাশুড়িকে ডেকে দেয়।

রাধা মুখ ব্যাজার করে ঘরে ঢুকে যায়। এর মধ্যে অবন্তী ওর নাম ধাম জেনে নিয়েছে। মেয়েটিকে দেখে পছন্দ হলেও তাকে আগেই বলে রেখেছিল আমার শাশুড়ি মায়ের যদি পছন্দ হয় তবেই তুমি চাকরিটা পাবে।

কিছুক্ষণ পর শাশুড়ি মা ঘরে এসে ঢোকে। রাধা আগেই এই ব্যাপারে মুখবন্ধটা করে রেখেছিল। চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে তাকে। না একে দেখে তো শান্তশিষ্ট বলেই মনে হচ্ছে। মুখের মধ্যে একটা লদীশ্রী আছে।

গম্ভীর গলায় বলে, তুমি বিজ্ঞাপনটা দেখে এসেছ। তুমি কি পেপার পড়ো।

আজ্ঞে না, আমার পেপার পড়ার সময় কোথায়। সংসারের কাজ করতে করতে কখন যে সময় কেটে যায় তাই বুঝতে পারি না।

ও, তবে এটা কি করে জানতে পারলে?

আমাদের বাড়ির পাশে যে কাকু আর কাকিমা থাকেন, তাঁরাই আমাকে এই কাজটার খোঁজ দিয়েছেন।

তা তোমার বাড়িতে কে কে থাকেন?

আমার স্বামী আর বাচ্চা মেয়ে।

তা তোমার স্বামী কী করেন?

অলকা কোনো উত্তর দেয় না।

অভিজ্ঞ মহিলা বুঝতে পারেন, ওর স্বামী বিশেষ কিছুই করে না। তবে তোমার বাচ্চা!

আমার মেয়ে তো জন্মের পর ঐ কাকু-কাকিমার কাছেই থাকে।

শাশুড়ি মনে মনে চিন্তা করে একেই রাখা যেতে পারে, কারণ এর টাকাপয়সা দরকার।

ঠিক আছে। তোমার নামটা কী যেন?

আজ্ঞে অলকা।

আমার বৌমা চাকরি করে শুনেছ তো। ওর মেয়েকে দেখাশুনা করতে হবে। সকাল সকাল এসে কাজে লাগতে হবে। সারাদিন ওর দেখাশুনা করে বৌমা বাড়ি ফিরলে তোমার ছুটি। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট শুনে নাও আমার নাতনির যাতে কোনো অযত্ন না হয়। আমি আর কদিন এখানে আছি, তারপর চলে যাব। আমি যাতে তোমার নামে কোনো কমপ্লেন না শুনি। এইসব কথাবার্তার মধ্যেই কখন যেন বৌদি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখতে পায়নি।

মার দিকে তাকিয়ে বলে, মা আপনি তো এমন ইন্টারভিউ নিচ্ছেন যে ওতো ঘাবড়ে যাচ্ছে।

না বৌমা, প্রথমেই সব বলে নেওয়া ভালো। ঠিক আছে অলকা, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

অলকা আস্তে আস্তে অবন্তীর পিছন পিছন তাদের ঘরে এসে ঢোকে। দেখে একটা ফুলের মতো বাচ্চা শুয়ে আছে। তার নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে যায়।

ওকেই তোমাকে দেখতে হবে। মনে রেখো তোমার চাকরি ওর ওপর নির্ভর করছে বলেই হেসে ওঠে। মুক্তোর মতো হাসি। মনটা ভোলো হয়ে যায়।

একটু সাহস করে বলে, বৌদি আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি আপনার মেয়েকে একটুও অযত্ন হতে দেব না।

যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে অবন্তী। বলে তুমি কি আজ থেকেই কাজে লেগে পড়বে?

আপনি যদি বলেন...

ঠিক আছে। আমরা এখন চা খাই। ঐ বারান্দায় বসছি। আচ্ছা আমার স্বামীকে বাবু টাবু বলার দরকার নেই, দাদাই বোলো। বাবু টাবু শুনতে আমার ভালো লাগে না।

ইতিমধ্যে অবন্তীর স্বামী অর্থাৎ ভাস্কর খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে

ঘরে ঢোকে।

এই হচ্ছে তোমার দাদা। হকচকিয়ে যায় ভাস্কর। এরকম কোনো বোনকে তো সে কখনো দেখেনি।

আরে না না, ঘাবড়ে যেও না। ওর নাম অলকা। আজ থেকে ও আমাদের পুঁচকির দেখাশুনা করবে।

অ আচ্ছা। তবে ঐ দাদা ডাকটা পছন্দ করতে পারছিলেন না। অফিসের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। বাড়ির একটা কাজের লোক দাদা ডাকবে এটা কি হজম হচ্ছিল না। তবু অবন্তীর কথাই শেষ কথা।

ভাস্করের অনেক কথা বুঝতে পারে অবন্তী, সে ভাস্করকে বুঝিয়ে বলে দেখো, আমরা পুঁচকির জন্মদাতা অর্থাৎ আমরা ওর গার্জেন। তবে আমরা দুজনই যখন বাড়িতে থাকব না তখন ওর ফ্রেন্ড, ফিলোজফার, গাইড কে হবে? এই অলকা। তাই অলকাকে বলেছি আমার স্বামীকে যে দাদা ডাকার অনুমতি দিয়েছি সেটা তোমাকে তোমার কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমান করতে হবে।

অলকা অবাক হয়ে মাথা নীচু কর ওদের কথা শোনে। অবাক হয়ে যায়, এতো ভালো কথা বলা যায়।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় অলকা। ভাস্কর আর অবন্তী ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে মুখোমুখি বসে।

অলকা পেছন পেছন এসে বলে, বৌদি মামনি তো এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। আমি আপনাদের জন্য চা করে আনব?

কেন রাধা তো আছে?

না উনি দেখলাম অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন।

ঠিক আছে, রাধাকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় কী আছে জেনে নাও।

অলকা ওখান থেকে সরে আসে।

ভাস্কর, মেয়েটিকে কেমন লাগল?

কেমন আবার লাগবে? দেখো বেশি লাই দিও না।

তাই নাকি? তবে ওর মুখের মধ্যে একটা সরলতা আছে। ওর কথা যা শুনলাম। ওর অভাব থাকলেও অভিযোগ নেই। এই কাজটা পাবার জন্য কিন্তু কাকুতি মিনতি করেনি। তোমার মায়ের সমস্ত প্রশ্নের কিন্তু খুব ভদ্রভাবে উত্তর দিয়েছে। দেখো এর কাছে আমাদের মেয়ে খুব ভালো থাকবে।

থাকলেই ভালো। দেখা যাক।

এর মধ্যেই পুঁচকি ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। উঠেই বড়ো বড়ো চোখ করে হয়তো মাকে খুঁজছে। কিন্তু আজ মায়ের জায়গায় কে দাঁড়িয়ে। উস্‌খুস করতে থাকে। অলকা পুঁচকিকে কোলে তুলে নেয়। অদ্ভুতভাবে মেয়ে কোনো কথা না বলে অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এর মধ্যেই অবন্তী চলে আসে। অলকার কোলের থেকে নিজের কোলে নেয় ওকে। আদর করতে করতে বলে, মামনি, এখন থেকে এই আন্টিটা তোমার সবকিছু করবে। তোমায় খাইয়ে দেবে, তোমার সঙ্গে খেলা করবে। পুঁচকির বোঝার মতো বয়স হয়নি। তবুও মুখের ভাব এমন করে যেন সব বুঝতে পারছে। অলকা আবার পুঁচকিকে নিয়ে মুখ চোখ ধুয়ে দেয়। জামাকাপড় ছাড়িয়ে কোলে নিয়ে ঘুরতে থাকে। কী ফুটফুটে মেয়ে, মাথা ভর্তি চুল, বড়ো বড়ো টানা টানা চোখ। ওর ওপর মায়া পড়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু ও যে বড্ড ছোট্টো। ওর নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে যায়। ও কী জানি কী করছে।

যাই হোক অলকাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে অবন্তী আর ভাস্কর বেরিয়ে পড়ে অফিসের দিকে।

প্রায় ছ'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসে অবন্তী। ক্লান্ত শরীরে চেয়ারের ওপর গাটা এলিয়ে দেয়। পাশে ব্যাগটা রেখে একটু চোখটা যেই বন্ধ করেছে।

বৌদি তোমার চা।

অবাক হয়ে যায় অবন্তী। তুই আবার চা করতে গেলি কেন?

না, আমি চা করিনি। রাধাদিদিই চা করে গেছে, আমি ফ্লাস্কে করে রেখেছিলাম।

ও তাই বুঝি। অলকার বুদ্ধির তারিফ না করে পারে না অবন্তী।

আমাদের পুঁচকি কোথায় রে!

ঘরে গিয়ে দেখো। বিছানায় বসে কেমন খেলছে। তোমাদের মেয়ে কিন্তু খুবই ভালো। আর আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। তোমরা যাবার পর আমাকে আর ছাড়তেই চাইছে না।

যাক বাবা, তুই আমাদের সত্যি শান্তি দিলি। অফিসে গিয়েও মনটা বাড়িতেই পড়েছিল।

আর কিছুক্ষণ পর পুঁচকিকে আদর করে বাড়ির দিকে রওনা দেয় অলকা। ট্রেনে বেশ ভিড়। তবুও কোনো রকমে ট্রেনে উঠে পড়ে সে। বাড়িতে ফিরে প্রথমেই সে যায় কাকু কাকিমার বাড়ি। গিয়ে দেখে তার মেয়ের সঙ্গে মেঝেতে বসে খেলা করছে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। চোখের জল সামলে ঘরে ঢোকে সে। কপট রাগের ভঙ্গিতে মেয়েকে বলে, তুমি দাদু-দিদাকে কত কষ্ট দিচ্ছ তাই না! মেয়ে তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে দাদুর দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসতে থাকে।

কিরে অলকা, এই ফিরলি? কেমন লাগল কাজ? বাড়ির লোকগুলো কেমন? এক নাগাড়ে প্রশ্ন ধেয়ে আসতে লাগল, অলকার দিকে।

কাকু কাকিমাকে থামিয়ে দেন, আচ্ছা ওকে একটু হাঁপ ছাড়তে দাও।

কাকিমা লজ্জা পায়। অলকা কাকিমার পাশে এসে বসে, কাকিমা, ওরা খুব ভালো লোক। আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছে। ওনাদের মেয়েও আমার মেয়ের থেকে অনেকটা ছোটো।

যাক বাবা, আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম। এবার অলকা তার মেয়ে হৈমন্তীকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। অলকার একটা নেশা ছিল বই পড়া আর রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ওর ছিল প্রিয় বই। ঐ গল্পেই হৈমন্তীর চরিত্র যে কিনা পাহাড়ি অঞ্চলে মুক্ত পরিবেশে বড়ো হয়েছে। যার প্রাণখোলা হাসি পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হত। সেই নামটা পছন্দ করে ওর মেয়ের নাম রেখেছিল।

হৈমন্তী নাম রাখার পিছনের কাহিনি শুনে কাকিমা বলেছিল, বাবা, নাম রাখার জন্য তুই এইসব বই পড়েছিস?

রবীন্দ্রকাব্যে নারী চরিত্রগুলি সবসময় আমাকে আকর্ষণ করত। হৈমন্তীর স্বামী অপু তাকে ভালোবাসলেও শ্বশুরবাড়ির অবহেলার শিকার ছিল সে। কিন্তু অলকার অবচেতন মন হৈমন্তীর পাশে পাশে থেকে তাকে লড়াই করার অনুপ্রেরণা যোগাত। যদিও সবই কল্পনার জগতে। তবুও অবহেলিত নারীদের যোগ্য সম্মান দেবার লড়াইতে যেন সে অজান্তেই

শরিক হয়ে পড়েছিল। তার স্বামী কিন্তু সদানন্দ এই নাম টাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করত না, তবে বৌয়ের ওপর বেশি কথা বলার সাহস ছিল না। তার মেয়েও দেখতে সুন্দর, তবে রঙটা একটু চাপা। ঠিক ওর বাবার মতো।

এমনি করেই দিন কেটে যাচ্ছিল ওদের। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আবার চৈত্রের শেষে নূতন বছরের শুরু। ফ্লাটের সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুলগুলো কতবার ঝরে পড়ে আবার তাজা হয়ে চারদিক লাল করে তুলেছে। হৈমন্তী আজ পাঁচ বছরে পড়ল।

অবন্তী বৌদির মেয়েরও একটা নাম রেখেছে, তবে সেটা শুধু ওর নিজের জন্য। অপরাজিতা কল্যাণী। কল্যাণী ছিল তার বাবা মায়ের আদরের সন্তান। সুন্দর কল্যাণীর বিয়েতে তার বাবা শম্ভুনাথ পাত্রপক্ষের দাবিমতো যৌতুকের টাকা ও গয়না দেওয়া সত্ত্বেও, পাত্রপক্ষ সেই গয়নার পরিমাপ সঠিক কিনা তা জানবার জন্য উদ্যোগী হন, শম্ভুনাথ পাত্রপক্ষকে বিয়ের আসর থেকে বিদায় করে দেন। কিন্তু পাত্র অনুপম তার অভিভাবকদের আচরণের প্রতিবাদ করে হয়ত আর বিয়ের আসরে আসতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে কল্যাণীকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু কল্যাণী বিয়েতে রাজি হয় না। সে এক মহান ব্রত নিয়েছে তা হল নারীশিক্ষা। এইরকম একটা দৃঢ় চরিত্রের নারীর সঙ্গে মিলিয়ে মেয়েটির নাম রেখে সে যেন তৃপ্তি পায়।

রাতের বেলা শোবার আগে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে অলকা রান্নাঘরের আধো অন্ধকারে তার একটা পুরোনো ডাইরি নিয়ে বসে পড়ে।

ডায়রি লেখা ওর একটা নেশা। স্কুলে অবনী স্যার বলতেন, তোমরা সারাদিনের চিন্তাভাবনাকে খাতার পাতায় যদি ধরে রাখতে পার তবে যে প্রশান্তি লাভ করবে তার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা করা যাবে না। সারা দিনে তোমার কাজের ভালো মন্দ নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করতে পারার নামই রোজনামচা। অবনীবাবুর কথা তন্ময় হয়ে শুনত অলকা। সেই থেকে রোজনামচা লেখা ওর একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পাতার পর পাতা অলকা তার মনের ভাবনা চিন্তাগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখত। যার মধ্যে ওর আনন্দ, দুঃখ অভিমান সব জড়িয়ে ছিল।

আজকের রোজনামচা ছিল অসাধারণ। এক সাধারণ গরিব মেয়ের আত্মসম্মান আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কক্ষে প্রবেশের গল্প। এই সবই তার কাছে গল্পের মতো। যে কোনোদিন তার এলাকার বাইরে বোরোয়নি সে কিনা সল্টলেকের অভিজাত এলাকায় কাজ করতে এসেছে। মনে পড়ে যায় ঘরে বাইরে উপন্যাসের নিখিলেশের উক্তি ‘মনকে যখন মনে মনে যাচাই করতুম তখন অনেক দুঃখ কল্পনা করেছি। কখনো ভেবেছি দরিদ্র, কখনো ভেবেছি জেলখানা, কখনো অসম্মান, কখনো মৃত্যু। কেবল একটা কথা কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি। আজ সেই কথাটা নিয়ে সমস্তদিন বসে বসে ভাবছি।’ আর লিখতে পারে না সে। চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে। ডায়েরিটা সন্তপর্ণে বন্ধ করে ওর একটা টিনের সুটকেসের মধ্যে রেখে দিয়ে তালাবন্ধ করে দেয়।

সদানন্দ অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে, ওই টিনের বাক্সে কী এমন আছে যে এতো যত্ন করে তালা দিয়ে রেখেছ। সে তোমার জানার দরকার নেই। আর কথা বাড়ায় না সদানন্দ।

বৌদির শাশুড়ি মা মাঝে মাঝে টেলিফোনে খবর নেন অলকা ঠিক মতো তার নাতনির দেখভাল করেছে কিনা। অবন্তীর অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে। ফিরতে বেশ দেরি হয়ে যায়। বাড়ি ফিরেই অলকাকে বাড়ি চলে যেতে বলে। তবে মনে মনে ভাবে অলকা যদি ওদের বাড়িতেই থাকত তবে কী ভালোই না হত। যা হবার নয় তার জন্য চিন্তা করে লাভ নেই। পুঁচকিটাও হয়েছে তেমন। অলকাকে কিছুতেই ছাড়বে না। বাড়ি যাবার সময় কান্না জুড়ে দিয়ে ওর কাপড় টেনে ধরে রাখবে। অনেক বুঝিয়ে ওর হাত থেকে নিস্তার পায় অলকা। রাস্তায় বেরিয়ে তাড়াতাড়ি একটা অটোয় ওঠে সে। আজ বেশ দেরি হয়ে গেছে। সাড়ে আটটার ট্রেন টা না ধরতে পারলে অনেক রাত হয়ে যাবে। হৈমন্তী হয়ত তখন ঘুমিয়েই পড়বে। ঘুম থেকে উঠিয়ে ওকে খাওয়ানো খুব কষ্টকর। যাক, উল্টোডাঙা স্টেশনে এসে দেখে ট্রেন এখনো আসেনি। যাক্ বাঁচা গেল। বাড়ি ফিরে দেখে মেয়ে ইতিমধ্যে ওর বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরে এসেছে। কিন্তু এখনো খাওয়া হয়নি। সদানন্দ খাওয়াবার চেষ্টা করলেও মেয়ে নাছোড়বান্দা, মা না এলে সে খাবে না।

বিছানায় মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, মাম্মা, তুমি রোজ আমাকে রেখে চলে যাও কেন? আমার একদম ভালো লাগে না। কী উত্তর দেবে অলকা বুঝে উঠতে পারে না। গালে একটা চুমু দিয়ে বলে, তুমি তাড়াতাড়ি পড়াশুনা করে বড়ো হয়ে যাবে, কত বড়ো চাকরি করবে, তখন আমি আর তোমাকে ছেড়ে যাব না।

মাম্মা, আমার বড়ো হতে আর কতদিন আছে? হেসে ওঠে অলকা। কথা বলতে বলতে কখন যে মেয়ের চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে টের পায় না সে।

পরদিন আবার লিখতে শুরু করে। শেষের দিকে কলম চলতে চায় না, ‘রাত্রির নিকষ কালো রূপ আমার কাছে শুধুমাত্র নিস্তব্ধতা, আর স্মৃতিময়তা নয় রাত্রির অতলে জড়িয়ে আছে কিছু ঘটনা কিছু অনুভূতি, কিছু প্রশ্ন, কিছু কষ্ট, কিছু বেদনা, কিছু আনন্দ। সবকিছু মিলিয়েই স্বপ্ন। নিজের জীবনের পথ নিজেকেই বেছে নিতে হয়। অন্য কেউ চিনিয়ে দিতে পারে না। ছোট্টো মেয়ে হৈমন্তীকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলে দুঃখগুলো হারিয়ে যায়। তবুও মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নে জেগে উঠি। মনে হয় কিছু পাবার আশায় হয়ত অনেক কিছু হারিয়ে ফেলি। নদীর এপারে বসে সবসময় মনে হয় নদীর ওপাটা হয়তো আরো সুন্দর আরো মনোরম। তবুও বলি স্বপ্ন দেখার অধিকার আমার নেই। কারণ, স্বপ্নের মধ্যে কিছু জন হারিয়ে যায়। তাদের জন্য বেদনা আমাকে বিপর্যস্ত করে তোলে।’

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ডায়রিপাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে। তবুও অবসর সময়ে ঐ পাতাগুলোকেই ইতিহাসের এক একটা পর্দা বলে মনে হয়।

পুঁচকির জন্মদিন। বেশ হৈ হৈ ব্যাপার। অন্যান্য ফ্ল্যাটের বন্ধুরা অবন্তীর কাছে আবদার করেছে তার মেয়ের জন্মদিন করতে হবে। অবন্তী এক কথায় রাজি। ভাস্কর একটু গাঁইগুই করছিল। অফিস থেকে ছুটি পাবে কিনা তাই ভেবে। তবে এখন আর চিন্তা নেই। ছুটির ব্যাপারটা মঞ্জুর

হয়ে গেছে।

অবন্তী অলকাকে ডেকে বলে, অলকা তুই কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসিস। আর একটা কথা ঐদিন তোর মেয়েকে সঙ্গে আনবি।

অলকা আমতা আমতা করছিল। অবন্তী চোখ গরম করে, এটা আমার অর্ডার। বলে হাসতে থাকে।

খুব সকালে একটা রঙচঙে ফ্রক পরে হৈমন্তী মার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। ও কোনোদিন ট্রেনে চাপেনি। ও বড়ো বড়ো চোখ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা হাতে মায়ের কাপড়টা চেপে ধরে থাকে। ও কোন অচিন দেশে ছুটে চেলেছ। দিদার কাছে শোনা পক্ষীরাজ ঘোড়া নাকি এটা। অবাক বিস্ময়ে ছোট্টো মেয়েটা কলকাতার রাস্তায় এতো লোকের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখো কোনো কথা নেই।

পুঁচকিদের বাড়ির দরজায় বেল বাজাতেই ভেতর থেকে রাধাদিদির গলা, কে?

আমি অলকা।

ও অলকা, দরজা খোলাই আছে, ঠেলে ঢুকে পড়। ঘরে ঢুকেই হাঁ হয়ে যায়। সারা ঘর বেলুন আর রঙ-বেরঙের কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো। হৈমন্তী মার আঁচলটা চেপে ধরে পিছন দিকে চলে যায়। ওতো কোনোদিন এই রকম অবস্থার মধ্যে পড়েনি। আয়। দেখতো আমাদের পুঁচকি রানিকে কোন ড্রেসটা পরলে ভালো লাগবে। পুঁচকি ততক্ষণে ঘুম থেকে উঠে বাবার বুকের ওপর বসে পা দোলাচ্ছে। হঠাৎ অলকার পেছনে আর একটা বাচ্চা মেয়েকে দেখে দোলানি ছেড়ে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে।

অলকা তোর মেয়ে তো বেশ মিষ্টি। আমাদের এখানে এসে মনে হয় ভয় পাচ্ছে।

না, আসলে কোনোদিন এইরকম সুন্দর সাজানো দেখেনি, তাই...

ও তা তোমার নাম কি?

স্পষ্ট উচ্চারণে বলে 'হৈমন্তী।'

হৈমন্তী? বা বেশ নাম তো। এই নামটা কে রেখেছে?

মার দিকে হাত দেখায় হৈমন্তী। অবন্তী অবাক হয়ে অলকাকে জিজ্ঞাসা করে, অলকা, এতো সুন্দর নামটা তুই কিভাবে রাখলি?

এতো জানি না। নামটা পছন্দ হল তাই রাখলাম। এই নামের উৎস কি তা এখনই জানাবার ইচ্ছে হল না।

তা আমার মেয়ের তো এখনো নাম ঠিক হল না। ওর ঠাম্মি পিসিরা আজ আসছে ওদের সঙ্গে কথা বলে একটা নাম ঠিক করতে হবে।

এই কথাবার্তার মাঝেই পুঁচকি বাবার কোল ছেড়ে মার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মামনি এই হচ্ছে তোমার একটা ছোট্টো দিদি। তুমি কি এই দিদির সঙ্গে খেলবে?

মাথা নেড়ে সায় দেয় পুঁচকি। তুমি আমার দিদি? হৈমন্তী আড়ষ্ট হয়ে মার শাড়ি ধরে দাঁড়িয়েছিল। পুঁচকি ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে বলে, চলো দিদি আমরা খেলতে যাই। আমার কতো পুতুল আছে দেখবে?

পুতুলের কথা শুনে হৈমন্তী চোখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওর পুতুল খেলার কত শখ। কিন্তু ওর সঙ্গে খেলার কেউ নেই।

আত্মীয়স্বজন বা আমন্ত্রিত অতিথিরা এখনো আসেনি। অলকা বুঝতে পারল। বাড়িতে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই। নিশ্চয়ই ক্যাটারারকে বলা আছে।

একটু পরেই একটি লোক একটা ঢাউস কাগজের বাক্স এসে টেবিলের উপর রাখল। অলকা বুঝতে পারল ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কেক আছে। ও জানে আজকাল জন্মদিনে কেক কাটা একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে।

অলকা, তুই কিন্তু ভুলে যাস না।

কি বৌদি?

ওই যে বললাম আমার মেয়ের একটা নাম ঠিক করে দেওয়া।

ও, লজ্জা পায় অলকা। আমি কি নাম ঠিক করব বৌদি। বাড়িতে এত লোক।

তাতে কি হয়েছে? এত দিন ওরা তো একটা নাম ঠিক করতে পারল না। আর তোর দাদা এমন এমন ট্যাফ নাম ঠিক করেছে সেগুলো আমার একদমই পছন্দ নয়। ওর পিসি অবশ্য একটা নামের বড়ো লিস্ট পাঠিয়েছে। তাও তুই দেখনা কি ভালো নাম দেওয়া যায়।

আমি তো একটা নাম ঠিক করে রেখেছি বলেই চুপ করে যায় অলকা।

কি বললি?

না কিছু না। আর কথা বাড়ায় না অলকা।

আজকের দিনটা আমার জীবনে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমার প্রিয় বৌদি সবার সামনে আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছে তা আমি কোনো দিন ভুলতে পারব না। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে উনি আমার মনিব আমি তার কর্মচারী। এই সমাজে মনিবের কাজ তার প্রজা অর্থাৎ কর্মচারীদের শোষণ করে নিজেদের কার্যসিদ্ধ করা। কিন্তু এ যেন এক নূতন দেশ। উল্টোপুরাণের দেশ। এই পরিবার যেন শ্রেণি বিভক্ত সমাজকে খান খান করে সব শ্রেণিকে এক পংক্তিতে বসিয়ে দিয়েছে। ছোট্টো পুঁচকির জন্মদিনে অনেক বাচ্চার সঙ্গে তাদের অভিভাবকরাও এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে যখন সবার সঙ্গে আমাদেরও ফেরার পালা, তখন আমার মেয়েকে ধরে পুঁচকির কি কান্না ও দিদিকে কিছুতেই যেতে দেবে না। সেই কান্না যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে অবন্তীর মধ্যেও দেখা গেছে। বৌদি বার বার বলছিল, অলকা তোর মেয়েকে এখানে রেখে যা। আমাদের এখানে অযত্ন হবে না।

না বৌদি আজ থাক। ও এখনো মাকে ছেড়ে তো থাকেনি। পরে তোমাদের অসুবিধা হবে।

এইটুকু লিখে শুতে যায় অলকা। সারাদিনের ধকলে মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ আর বাড়ি ফিরে রান্না করতে হয়নি। বৌদি টিফিন ক্যারিয়ার ভরে খাবার দিয়ে দিয়েছিল।

নাতনির জন্মদিনে ওর ঠাম্মি শিলিগুড়ি থেকে এসেই মেয়েকে শুধায়, অলকা কেমন আমার নাতনিকে দেখাশুনা করছে?

অবন্তী উত্তর দেবার আগেই পুঁচকি ঠাম্মির কথার জবাব দেয়, ঠাম্মি, অলকা মাসি খুব ভালো। আমিও মাসিকে খুব ভালোবাসি।

যাক বাবা নিশ্চিন্ত হলাম।

সবাই এক মত হয়ে পুঁচকির নাম করা হল অহনা।

অলকা একবারও ওর দেওয়া নামটা সবার সামনে আনতে পারল না।

তবে ওর কাছে পুঁচকি ‘কল্যাণী’ হয়েই রইল। এইভাবে বছর ঘুরে চলে। অহনা আর হৈমন্তী স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। দুজনেই বেশ ভালোভাবেই পরীক্ষায় পাশ করেছে।

একটু বলে নিই। হৈমন্তী তার পাড়ার খুব ভালো ফল করেছিল। বৌদি তো হৈমন্তীর পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে এমন আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল যে অলকার চোখের জল আটকাতে পারেনি। যদিও হৈমন্তী অহনার থেকে বেশ কিছুটা বড়ো তবুও নিজের মেয়ের পরীক্ষায় পাশ করার আনন্দের সঙ্গে হৈমন্তীর পাশ করার আনন্দ যেন একাকার করে ফেলেছে।

তুই কালই তোর মেয়েকে এখানে নিয়ে আসবি।

আমি তো আজই আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কাকু কাকিমা কিছুতেই আসতে দিল না। বলে, মা অলকা, আমরা আর কতদিন; আমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। মনে হয় তোর মেয়ের আনন্দের ভাগীদার হবার জন্যই ভগবান আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাল কিন্তু আনতেই হবে। পুঁচকিও কিন্তু তোর মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

আজকের মতো আনন্দের দিন অনেকদিন পরে এল। আমার দুই মেয়ে আমার আশা পূর্ণ করেছে।

বৌদি, তুমি পুঁচকি সোনার সঙ্গে আমার মেয়ের তুলনা কোরো না। তোমার মেয়ে কত বড়ো ইস্কুলে পড়ে।

তাতে কি হয়েছে। ওর দুজন যখন একজায়গায় বসে গল্প করে তখন দেখেছিস, ওরা কার মেয়ে এসব ওদের কি মাথায় থাকে?

পুঁচকি ওরফে অহনা পেছন থেকে অলকাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর টিপ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

ও কি করছ। ছিঃ ছিঃ।

ছিঃ ছিঃ কি আছে মাসি। তুমি হচ্ছ আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের মা। তোমাকে প্রণাম না করে পারি।

আবার দুচোখ ভিজে ওঠে অলকার। এই মেয়েটা কোন ধাতুতে তৈরি। ওর বাবা-মা অনেক পুণ্য করার ফল এই মেয়ে।

এখন নিজের মেয়ের কথা ভাবতে বসে অলকা। ছোটোবেলা থেকে বাবার স্নেহ কাকে বলে পায়নি। বাউন্ডুলে সদানন্দর মেয়ের প্রতি কোনো হুঁশই ছিল না। তারপর একদিন কোথায় যে মিলিয়ে গেল তার হদিশ আর পাওয়া গেল না। সংসারের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা না থাকলেও স্ত্রী হিসাবে এই চলে যাওয়া মেনে নিতে পারেনি অলকা। অনেক থানা পুলিশ করেও কোনো সন্ধান পায়নি তার। মেয়ে মার বুকে মুখে গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে বলে, মা বাবা কি আর আসবে না। অলকা উত্তর দিতে পারে না।

সংসারের চাকা তো থেমে থাকতে পারে না। কাকু-কাকিমার হেফাজতে রেখেই মেয়ের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে বাধ্য হয় অলকা। অদ্ভুত ব্যাপার তার মেয়ে কিভাবে পড়াশুনায় এত ভালো হল তা সে এখনো বুঝতে পারে না। যখনই অলকা কোনো মাস্টার মশাই রাখার কথা বলত, মেয়েই সঙ্গে সঙ্গে না করে দিত। তার এক কথা স্কুলের দিদিমণিরা তাকে খুব ভালোভাবে পড়া বুঝিয়ে দেয়। আর কথা বাড়ায় না অলকা।

রবীন্দ্রকাব্যে তাঁর সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলির প্রখর পৌরুষত্বর সঙ্গে সঙ্গে নারী চরিত্র চিত্রণেও তাঁর বলিষ্ঠতা ছিল। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে এক অপূর্ব মহিমাময় করে তুলেছে।

ভাবতে বসে অলকা। ছোট্টো হৈমন্তী সহজ সরল হৈমন্তী যে তার মা ছাড়া কাউকে চেনে না। সেই মেয়ে কেমন এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছে থেএক বড়ো হয়ে উঠল। শুধু তাই নয় ওনাদের ভরসায় কেন্দ্রবিন্দু বলা ভুল হবে না।

এক কিশোরীর আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে ওঠার প্রতিটি মুহূর্ত সে উপভোগ করার পাশে পাশে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকার চাঞ্চল্যময় জীবন থেকে আস্তে আস্তে নারীতে পরিবর্তন তাকে তার রোজনামচা লিখতে আরো উদ্বুদ্ধ করত। হৈমন্তী বয়ঃপ্রাপ্তির প্রতিটি মুহূর্ত তার লেখনীর মধ্যে ফুটে উঠত।

পরদিন মেয়েকে নিয়ে অলকা বৌদির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছায়।

হৈমন্তীকে দেখেই অহনা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে। দুই বন্ধুর এই ভালোবাসা অপার্থিব। আজো বাড়িতে প্রতিবেশীদের আনাগোনা। এই ফ্ল্যাট বাড়ির নাকি গর্ব অহনা। এত নম্বর এই পর্যন্ত এখানে কেউ পায়নি।

অহনা হৈমন্তীর হাতটা ধরে বলে, দিদি এবার কিন্তু আমরা এক কলেজে পড়ব।

সে কি? তা হয় নাকি? আমরা থাকি মফস্বলে আর তোমরা থাক কলকাতা শহরে।

তাতে কি। আমি মাকে বলেছি এখন থেকে হৈমন্তী দিদি আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

না না তা হয় না। তুমি কত বড়ো কলেজে ভর্তি হবে।

তা আমি জানি না। আমি বাপিকেও বলেছি আমাদের ভর্তির ব্যবস্থা করতে। বাপিও বলেছে আমাদের যা নম্বর আছে, কলেজে ভর্তি হতে সমস্যা হবে না। দাঁড়াও আমি একটু আসছি, এই কথা বলে অহনা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। একটু পরে ফিরে এসেই বলে, চলো আজ আমরা দুজনে একটু বেড়িয়ে আসি।

হৈমন্তী কোনোদিন কলকাতার রাস্তায় ঘুরতে বেরোবার সুযোগ পায়নি। মায়ের অনুমতি নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ে। এই দুটি মেয়ের উপর সদ্য যৌবনের সমস্ত আলো এসে পড়েছে, কিন্তু তাদের হাবভাবে কিন্তু এখনো কৈশোরের কোন থেকে জেগে ওঠার মতো। ঠিক যেন পাহাড়ের উপর জমে থাকা সাদা বরফের উপর সকালের সূর্য আলো এসে ঠিকরে পড়েছে। কিন্তু সেই আলোর তেজ এতোটা তীব্র নয় যে বরফকে গলাতে পারে।

অলকা অলকা... বৌদির ডাক।

হ্যাঁ আসি বৌদি।

আজ তো আমি ছুটি নিয়েছি। আর রাধাও এসেছে। তুই আমার কাছে এসে বোস।

হ্যাঁ বৌদি। তুমি কি কিছু বলবে?

আচ্ছা তোর মেয়ে যদি আমাদের এখানে থাকে তোর কোনো আপত্তি আছে?

চুপ করে থাকে অলকা। বুঝতে পারে না বৌদি কেন একথা বলছে।

ঠিক আছে তবে শোন আমার মেয়ে কাল তার বাপির কাছে বায়না ধরছে ওরা দুজনে এক কলেজে পড়বে। আর কলকাতার কলেজে ভর্তি হলে অত দূর থেকে রোজ রোজ আসা যাবে না।

এখনো চুপ করে থাকে অলকা। এই রকম কখনোই সে আশা করেনি। টপ টপ করে জল পড়তে থাকে চোখ থেকে। বৌদি তার মেয়ে হৈমন্তীকে তার নিজের মেয়ে অহনার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাতে উদ্যোগী হচ্ছে। সে চিন্তা করতে পারে না।

না বৌদি, তোমরা ওর জন্য যা করেছ তার কোনো তুলনা হয় না, এরপর ওকে তোমাদের মেয়ের সঙ্গে এক কলেজে পড়ানোর মতো ব্যাপার আমার চিন্তার বাইরে।

নে তোকে আর চিন্তা করতে হবে না। তোর দাদাই এই প্রস্তাবটা দিয়েছে। তুই তো জানিস তোর দাদা কোনো কাজ না ভেবে করে না।

সে বিষয়ে অলকার কোনো দ্বিমত নেই। দাদা বৌদি তার কাছে ভগবানের মতো। সদানন্দ নিখোঁজ হবার সময় দাদার মতো ব্যস্ত লোক অফিসের ছুটি নিয়ে ওকে সঙ্গে করে বিভিন্ন থানায় নিয়ে গিয়েছিল। একথা ভুলতে পারে না অলকা।

বৌদি, হৈমন্তী ফিরুক ওর সঙ্গে কথা বলে নিই।

তোকে আর কথা বলতে হবে না। আমার অহনা আমার থেকেও বেশি বুদ্ধিমতী। ও ঠিক ওর দিদির ব্রেন ওয়াশ করে ফেলবে। বলে হা হা করে হাসতে থাকে।

বাড়িতে ফিরে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে অলকা। মামনি তুই আমাকে ছাড়া থাকতে পারবি?

আকাশ থেকে পড়ে হৈমন্তী। হঠাৎ একথা কেন?

অলকা বুঝতে পারে বৌদির প্রস্তাব এখনো মেয়ের কানে পৌঁছায়নি।

না, যদি ভালো কলেজে পড়তে হয় তবে তো এখান থেকে যাতায়াত করা যাবে না।

আমি কলকাতার কলেজে কেন ভর্তি হব? এখানকার কলেজেই তো ভর্তি হতে কোনো অসুবিধা হবে না।

না রে পাগলি, আমার আর এক পাগল মেয়ে পণ করেছে তারা দুজন নাকি এক কলেজেই পড়বি। দাদাই সব বন্দোবস্ত করে দেবে। আর তুই তো জানিস আমি দাদার মুখের ওপর কথা বলতে পারি না।

মা, তুমি ওসব কথা কানে নিও না। কলকাতার কলেজে ভর্তি হলে কত খরচ জানো। না না, তার দরকার নেই।

অলকা মনে মনে ভাবে তার মেয়ে কত বড়ো হয়ে গেছে। মা কষ্ট পায় এমন কাজ করতে চায় না।

আমি তাহলে তোর কথাগুলো বৌদিকে গিয়ে বলি?

এবার অলকার মুখটা চেপে ধরে হৈমন্তী। মামনি আমি জানি তোমার কথা ওরা শুনবে না। তবুও তুমি কিন্তু সুযোগ বুঝে এই কথাগুলো বলো। আর মামনি একটা কথা বলা হয়নি। কাল অহনার সঙ্গে একটু বেরবো।

কোথায় বেরোবি?

জানি না, আমি তো কলকাতার অনেক কিছুই চিনি না। অহনা বলেছে ও আমাকে নিয়ে অনেকগুলো কলেজে যাবে।

ঠিক আছে সাবধানে যাস।

পরদিন মেয়েকে সঙ্গে করে অলকা দাদা-বৌদির বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

স্থির হয় হৈমন্তী অহনার সঙ্গে এক কলেজে ভর্তি হবে। হৈমন্তীও অহনাদের বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করবে। অহনার তো আনন্দের সীমা নেই। হৈমন্ত দিদি আর সে একসঙ্গে কলেজে যাবে।

দুজনেই কলকাতার নামকরা কলেজে ভর্তি হয়। দাদা-বৌদি অফিসে চলে গেলে, মেয়ে দুটিও কলেজে যায়। আর অলকা পথ চেয়ে বসে থাকে। এমনি করে ধীরে ধীরে দিন চলে যায়। প্রতিটি পরীক্ষায় তারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে থাকে। অলকা মাঝে মাঝে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে এরা কত তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে গেল। ছোট্ট অহনা কেমন যে মায়াভরা চোখে যখন তার দিকে তাকায়, তাকে মনে হয় যেন এক নিগূঢ় বন্ধনে সে বাঁধা রয়েছে তার সঙ্গে। তাকে কখনো পর বলে মনে হয় যেন পাহাড়াদারের মতো দাঁড়িয়ে আছে কোনো অজানা মোকাবিলা করার জন্য। গাছে ডালের ফাঁকে চাঁদের আলোয় একটা কাকের বাসা। সেখানে পরিবার নিয়ে বাস করে এক জোড়া কাক পরিবার। চাঁদের আলো পড়ে ছোট্টো বাসাটা যেন অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে গাছের গায়ে আটকে রয়েছে। পাখিটাকে তার মনে হচ্ছে একটা ময়ূরের মতো। যে তার নীলকণ্ঠ পালক দিয়ে তার শিশুটিকে পরম স্নেহে আদর করেছে। হঠাৎ যেন হৈমন্তী তার পাশে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে রেখে ছে, মামনি আর মাত্র কটা তো দিন। আমার পরীক্ষা শেষ হলে তোমার গায়ে লেগে শোওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে পারব ।

দূর বোকা মেয়ে, আমি কি দূরে কোথাও আছি, আমি তো সবসময় তোর সঙ্গেই আছি।

না মামনি, পরীক্ষার কিছুদিন পরই রেজাল্ট বেরোবে, আশা করছি রেজাল্ট ভালোই হবে। আমি কিন্তু আর পড়াশুনা করব না।

কেন রে?

না মামনি, আমি চাকরি করব। চাকরি করে তোমার পাশে দাঁড়াব। তোমাকে আর কষ্ট করতে দেব না।

আমার আবার কষ্ট কোথায় রে। তোর মামা-মামি আমাদের কত ভালোবাসে। আমাদের কোনো কষ্ট করতে দেয় না।

সেটা অবশ্য ঠিক কথা। তবুও রোজ রোজ এতো দূর থেকে তোমার যাতায়াত করা চলবে না।

ঠিক আছে, সেটা দেখা যাবে। তুই শুয়ে পড়। আমি আর কিছুটা লিখে শুতে যাব।

আচ্ছা মা তুমি রোজ এইসব কি লেখ। কোনোদিন আমাকে দেখতে দাও না।

এখন দেখে কাজ নেই, আমি মরে গেলে তার পর দেখিস। যতসব ছাইপাশ লেখা।

মার মুখ চেপে ধরে হৈমন্তী, কপট রাগ দেখিয়ে বলে, তুমি কিন্তু কোনোদিন মরার কথা বলবে না। তোমাকে ছাড়া আমি কিন্তু বাঁচব না।

রাত্রির বেলায় কিসব আজেবাজে কথা বলছিস। নে ঘুমিয়ে পড়। কাল

আবার কলেজ যেতে হবে। আজ তুই জোর করে আমার সঙ্গে চলে এলি। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে।

দরজা খুলতেই সামনে দাঁড়িয়ে অহনা।

কি হৈমন্তী দিদি, মার আদর খাওয়া হল। বলেই জড়িয়ে ধরে হৈমন্তীকে। ওরা দুজনে ঘরে চলে যায়। বৌদির চা খাওয়া হয়ে গেছে। দাদা বৌদি দুজনেই অফিস বেরোবার সময় কিন্তু খেয়ে যায় না। টিফিন নিয়ে যায়। অলকা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢোকে ওদের টিফিনগুলো সাজিয়ে দিতে।

বৌদি আফিস যাবার সময় অলকাকে বলে যায়, অলকা কাল একটু তাড়াতাড়ি আসিস।

কেন বৌদি কোনো দরকার আছে? না আমার কোনো দরকার নেই। তবে কাল আমাদের মেয়েদের ফাইনাল রেজাল্ট বেরবে। মা কে প্রণাম না করে কি শুভ কাজে যাওয়া যায়। তাই বলছিলাম একটু তাড়াতাড়ি আসিস।

অলকা লজ্জা পায়। তার মেয়ের কাল রেজাল্ট সে একদমই ভুলে গিয়েছিল।

পরের দিন হৈমন্তী আর অহনা কলেজে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। অলকার দেখা নেই।

কাল পই পই করে বলে দিলাম একটু তাড়াতাড়ি আসিস। আজই এত দেরি। হৈমন্তীও বুঝতে পারে না। মামনি কেন এত দেরি করে আসছে। আর দেরি করা যাবে না। মামা বারবার গাড়িতে হর্ন বাজাচ্ছে। কলেজে পৌঁছে দিয়ে উনি অফিসে যাবেন। দুজনে কলেজের দিকে পা বাড়ায়। হৈমন্তীর মনে খচখচ করতে থাকে। মামনি আজ এত দেরি করছে কেন? শরীর খারাপ হল না তো। মামি দু-তিনবার ফোন করলেও বারবার নটরিচেবল আসছিল।

যাই হোক কলেজের প্রিন্সিপাল হৈমন্তী আর অহনাকে কলেজের পিওন সত্যেনের মারফত ডেকে পাঠালেন। হৈমন্তী দিদি, অহনাদিদি, বড়দিদিমণি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

দুরু দুরু বুকে দুজনেই প্রিন্সিপাল ম্যাডামের ঘরে গিয়ে ঢোকে। ম্যাম আপনি আমাদের ডেকেছেন।

চশমাটা নাকের উপর রেখে, হ্যাঁ তোমরা বসো। কোনো একটা কাগজের ওপর চোখ রেখে, এইমাত্র তোমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। যত ভালো পরীক্ষাই দিক না কেন। রেজাল্টের কথা শুনলেই কেমন যেন নার্ভাস লাগে। দজুনেরই একই অবস্থা। এইবার প্রিন্সিপাল ম্যাম ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, কনগ্রাচুলেশন অহনা, হৈমন্তী তোমরা দুজনেই আমাদের কলেজের নাম উজ্জ্বল করেছ। আমাদের কলেজের মধ্যে অহনা ফার্স্ট আর হৈমন্তী সেকেন্ড হয়েছে।

দুজনেই তাড়াতাড়ি উঠে ম্যামের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

থাক থাক, আশীর্বাদ করি তোমরা দুজনেই আরো উন্নতি কর। এবার তোমরা যেতে পার। তোমাদের বন্ধুদের রেজাল্টও নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। আনন্দে উত্তেজনায় দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে। এবার হৈমন্তীর তার মামনির কথা মনে পড়ে যায়। মামনি এখনো তো কোনো খবর নিল না।

ইতিমধ্যে শ্যামনগরের দিকে কোনো ট্রেন নাকি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। শিয়ালদা মেন লাইনে তাই সকাল থেকে সব ট্রেন চলাচল বন্ধ।

হৈমন্তীর বুক ছাৎ করে ওঠে। সে তাড়াতাড়ি অহনাকে তার মোবাইলটা খুলে দেখতে বলে। অহনা মোবাইল খুলতেই চোখে পড়ে ভীষণ দুর্ঘটনার খবর। দুটো ট্রেন মুখোমুখি এসে পড়ায় ড্রাইভার প্রচন্ড ব্রেক কষে তার ফলে একটি ট্রেনের কয়েকটি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে পাশে উল্টে পড়ে। এখনো কামরাটি তোলা সম্ভব হয়নি। সাংবাদিকদের মতে কামরার নীচে কোনো মৃতদেহ থাকতে পারে। ইতিমধ্যে মামা-মামী দুজনেই কলেজে এসে পৌঁছে গেছেন। তাঁরাও উদ্বিগ্ন। খবরটা তাঁরা টিভিতে দেখেছেন। হৈমন্তী ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ওকে এখনই যেতে হবে। অহনা বলে, দাঁড়া আমরাও তোর সঙ্গে যাব। অনেকটা পথ পেরিয়ে ওরা অলকার বাড়ির সামনে এসে পৌঁছায়। বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখে বাড়ির সামনে অনেক মানুষের ভিড়। হৈমন্তীর গলা শুকিয়ে আসে। গাড়ি থেকে দৌড়ে নেমে আসে। ছুটতে ছুটতে বাড়ির সামনে এসে দেখে দাদু একটা মোড়াতে বসে আছে। তার দুচোখে জলের ধারা। তার চারপাশে প্রতিবেশীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। হৈমন্তীকে দেখেই দাদু ওর হাতটা ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, দিদিভাই তোমার মা... আর শুনতে পায় না হৈমন্তী। তার দুচোখে অন্ধকার নেমে আসে। চেতনা হারায় সে। তাড়াতাড়ি সবাই ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। চোখে মুখে জল দেবার পর একটু জ্ঞান আসে। সে বুঝতে পারে অঘটন ঘটে গেছে। পাড়ার সবিতা কাকিমা—আহারে অমন তরতাজা মেয়েটাই কিনা চলে গেল।

হৈমন্তী জানতে পারল ট্রেনে চাপা পড়ে যে তিনজন মারা গেছে তার একজন তার মা অলকা। পাগলের মতো ছটফট করতে থাকে হৈমন্তী। তার আর কেউ রইল না। অহনা হৈমন্তীকে জড়িয়ে ধরে থাকে। শোকস্তব্ধ পরিবেশে হৈমন্তীর বুকচেরা আর্তনাদ বাতাসকে ভারী করে তুলেছিল।

মামনি আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি মামনি। আমি চাকরি করব মামনি। তোমাকে আর কাজ করতে দেব না।

অনেক রাতে মার দাহ কাজ সেরে ওদের ছোট্টো ঘরে এসে পৌঁছায় তারা। দাদু-দিদা তাকে ছায়ার মতো আঁকড়ে থাকে। আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। ঘরের কোণে একটা টিনের বাক্স, তাতে আবার তালা লাগানো। মামনি তার লেখা ডায়েরি ঐ বাক্সেই রাখত।

এবার ফেরার পালা। হৈমন্তী বাক্সটা হাতে তুলে নেয়। ফিরে আসে কলকাতায়। সারারাত অহনা আর হৈমন্তী জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। এই বিপদের দিনে অহনা তার দিদিকে একা ছাড়তে রাজি নয়। তার চোখের সামনে যেন তার মামনি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। সারা মুখ জলে ভেসে যায়।

পরদিন নির্বিকার সূর্য তার নিত্যকার কর্তব্যের মতো পৃথিবীকে আলোকিত করার কাজ চালু করতে শুরু করেছে। দূরে কোথাও কোকিলের কুহু স্বর ভেসে আসছে। যেন পৃথিবীতে কিছুই হয়নি। শুধু মাতৃহারা ছোটো বেড়ালটা জানালার পাশে মিউ মিউ করছে। কৌতূহলী

হয়ে বাক্সের তালাটা খোলে হৈমন্তী। মামা-মামী-অহনা সবার নজর এখন বাক্সের দিকে। কারণ তারা শুনেছিল ঐ বাক্স তার প্রিয় মেয়েকেও কোনোদিন দেখায়নি। বাক্স খোলার পর বেরিয়ে এল খান পাঁচেক পুরনো ডায়েরি। তার ছত্রে ছত্রে লেখা রোজনামচা। ডায়রিগুলো হাতে নিয়ে মামির চোখও ছলছল করে ওঠে। কি সুন্দর হাতের লেখা।

হঠাৎ অহনা আবদার করে ওঠে, বাপি তোমার ঐ বন্ধু আছে না, যার প্রকাশনা সংস্থা আছে। ওনাকে এই ডায়েরিগুলো দেখাও না। যদি ছাপানো যায়? হৈমন্তী দিদিও তার মায়ের লেখা দেখে শান্তি পাবে।

মাথা নাড়ে ভাস্কর। পরদিন ডায়েরিগুলো একটা ব্যাগে ভরে প্রকাশক বন্ধুর কাছে যায়।

তিন-চার দিন পর ভাস্করের কাছে ঐ বন্ধুর ফোন আসে। ভাস্কর, ঐ ডায়েরি কে লিখেছে?

কেন? ও আমার বোনের মতো। হৈমন্তীর মা।

অপূর্ব। অসাধারণ লেখা। তোকে আর কোনো চিন্তা করতে হবে না। ঐ বই প্রকাশের পুরো দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।

কিছুদিনের মধ্যেই ঝকঝকে ছাপার অক্ষরে অলকার লেখা বই হৈমন্তীর হাতে এসে পৌঁছায়। বইয়ের প্রথম পাতায় মামনির হাসিমুখের ছবিটা যেন বারবার তাকে বলছে, কি মামনি, বলেছিলাম না, আমি মরে গেলে ঐ ডায়েরি তুই দেখবি। বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে হৈমন্তী।

এইভাবে অলকার স্মৃতিকে বুকে ধরে রেখে দিন এগিয়ে যায় হৈমন্তীর।

হঠাৎ একদিন একটা বেশ রঙিন একটা খাম হৈমন্তীর নাম লেখা পিওন এসে দিয়ে যায়।

হৈমন্তী খাম হাতে পেয়ে অবাক হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি সেটা টেবিলের ওপর রাখে। খুলতে ইচ্ছে হয় না। ভাবে মামী এলেই খামটা তার হাতে দেবে।

খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে... তারপর অতি যত্ন করে খামটা খোলে। খামের ভিতর থেকে একটা কাগজে ছাপানো একটা চিঠি। পড়তে থাকে...। কখন যে কাগজটার ওপর দুফোঁটা চোখের জল এসে পড়েছে সে টের পায় না। চিৎকার করে অহনা আর হৈমন্তীকে ডাকে। ওরা দুজনেই পড়িমড়ি করে ছুটে আসে। ...হাতে চিঠিটা দেখে দুজনেরই বুক ধড়ফড় করতে থাকে, নিশ্চয়ই কোনো খারাপ খবর। তার ওপর...চোখে জল। দুজনে...দুপাশে এসে বসে।

মা কোনো খারাপ খবর? অহনা শুধায়। কোনো উত্তর না দিয়ে অহনার দিকে চিঠিটা বাড়িয়ে দেয়। অহনা চিঠিটা পড়তে পড়তে আনন্দে লাফাতে থাকে। হৈমন্তীকে সপাটে জড়িয়ে ধরে লাফাতে লাফাতে বলতে থাকে, দিদি আজ আমাদের কত গর্বের দিন। অলকা মাসির লেখা বই এ বছরে সেরা বই হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আর একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লেখিকাকে পুরস্কৃত করা হবে। যেহেতু অলকা মাসির পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়, তাই হৈমন্তীকে ঐ পুরস্কার নেবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এতবড়ো একটা সুসংবাদ অলকা শুনে যেতে পারল না। তাদের আনন্দ উৎসবের মধ্যেই টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল অলকার হাসিমুখ। যেন বৌদির পরিবারকে সে তার ঐ কৃতিত্ব উৎসর্গ করছে। হৈমন্তী বাকরুদ্ধ। গলা থেকে কোনো কথা বেরোচ্ছে না। মার একটা বই বুকে চেপে ধরে অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে। অহনা চোখ মোছাতে গেলে, তার হাতটা চেপে ধরে অবন্তী বলে, ওকে কাঁদতে দে। ওর মা তো ওপর থেকে ওর আনন্দের অশ্রুতে মিশে আছে।

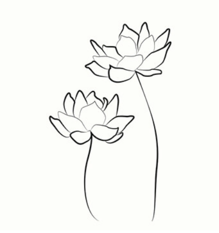

মানস-বিদেশরা ফুটবলের কিস্যু বোঝে না : সুব্রত ভট্টাচার্য

কথা বলেছেন প্রসেনজিৎ মজুমদার

তিনি কলকাতার ময়দানী ফুটবলের বর্ণময় চরিত্র। বিতর্ক তাঁর আজীবন সঙ্গী। স্পষ্ট বক্তা হিসেবে সুনাম (নাকি দুর্নাম?) তাঁর ছিল, আছে, থাকবে। একদা র, ‘অ্যাংরি ইয়ং ম্যান’ এখন ‘অ্যাংরি ওল্ড ম্যান’, যাঁকে এড়িয়ে যেতে চান অনেকেই। তাঁকে পছন্দ করতে পারেন, অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু অস্বীকার করতে পারবেন না কেউই, সেই তিনি এক ও অদ্বিতীয় সুব্রত ভট্টাচার্য, অর্থাৎ ময়দানের বাবলুদা, আবারও বাংলার ফুটবল নিয়ে বিস্ফোরক হলেন।

‘বাংলা স্ট্রিট’-এর সম্পাদকমশাই যখন বাবলুদার সঙ্গে কথা বলার জন্য এই প্রতিবেদকের নাম প্রস্তাব করেন তখন মনে হয়েছিল এই রে বাঘের মুখে পড়তে হবে বুঝি। সঙ্গী পত্রিকার সিনিয়র সম্পাদনা সহযোগী পার্থ মুখোপাধ্যায়। বললেন, ‘চিন্তার কিছু নেই। অ্যাপয়নমেন্ট ফিক্স করা আছে’। এক সিনিয়র ক্রীড়াসাংবাদিকের শরণাপন্ন হলাম। ভদ্রলোক বললেন, ‘ওরে বাবা, বাঘের মুখে পড়বে। আমাকে একবার মারতে এসেছিল।’ আমি বললাম, ৩২ বছর আগে একবার মোলাকাৎ হয়েছিল বইকি। তখন এক বিখ্যাত দৈনিকের তরুণ সাংবাদিক। তবে সেই দিন ওঁর সঙ্গে শুধু খেজুর করতে গিয়েছিলাম। দাদারা সেটা করতেই পাঠিয়েছিলেন, যাতে ময়দানের মহীরূহদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা যায়, যেটা পরে কাজে লাগবে। তা, সেবার উনি আমাকে ট্যাকলই করেছিলেন। নাম কাল স্থান পাত্র জেনে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিজের ডিফেন্স ভাঙতে দেননি। তারপর কত সৌরদিন চান্দ্রমাস পেরিয়ে খবরের কাগজ, সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেল হয়ে চলচ্চিত্র জগতে চলে এলাম সেটা এ গল্পের বিষয় নয়। পার্থদা তো বলেই খালাস সব ঠিক হ্যায়। কিন্তু বসা হবে কোথায়? না মধ্য কলকাতার এক জায়গায়।

কাট টু পার্কস্ট্রিট

বাবলুদার এক বন্ধুর অফিসে বসা হবে। বৃষ্টিবিঘ্নিত পার্ক স্ট্রিটের উনিশ নম্বর বাড়িটা খুঁজে বার করলাম। অফিসটা এই উনিশের ভেতর। পার্থদা ফোনাফুনি করার পর আমরা সেই বিরাট গেটওয়ালা বাড়িটার ভেতর গুটি গুটি পায়ে ঢুকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসলাম নিজেদের পরিচয় দিয়ে। এরপর যিনি সেখানে এলেন তিনি বাবলুদার বন্ধু দীপক দত্ত। ঐ অফিসের মালিক। উনি নিজে মোহনবাগানের সদস্য, সমর্থক, ভোটার। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা খ্যাতনামা মোহনবাগানি। ক্লাবের জন্য একসময়ে মিটিং মিছিলেও হেঁটেছেন। তা আদর আপ্যায়ন তো হল কিন্তু তিনি কোথায়? দীপকবাবু বললেন 'আসবে, একটু ধৈর্য ধরুন'। ধরা গেল। ধৈর্য অবশেষে তিনি এলেন। ততক্ষণে একঘন্টা কেটে গিয়েছে। উনি এসে আমাদের উল্টো দিকে বসলেন। আসার কারণ শুনলেন। তারপর বললেন, 'কিছু লিখতে পারব না কিন্তু । আমি একটি বিখ্যাত দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত।' আশ্বাস দিলাম কিছু লিখতে হবে না। ওটা আমরাই লিখব। উনি একটু সহজ হলেন। প্রথম দিন যাকে বলে এই হল নান্দীপাঠ। কলকাতার ফুটবল নিয়ে আড্ডা। কী করে যেন ঢুকে পড়লেন শ্যামনগরে সেই হারিয়ে যাওয়া পঞ্চাশ, ষাট দশকে। 'আরে আমরা তো বড়ো হয়েছি মহাবীরপ্রসাদ, কেষ্ট পালদের মতো অলিম্পিয়ানদের হাতের সামনে দেখে। এখন কোথায় সেই সব খেলোয়াড়, যারা আইডল হতে পারে?' থামলেন সুব্রত। তারপর একটু থেমে বললেন 'তখন শ্যামনগর কি সব ফুটবলার, কোচের জন্ম দিয়েছিল! মুরারী শূর, অশোকলাল ব্যানার্জি, মহাবীর প্রসাদ, কেষ্ট পাল কী সব নাম!' কথা প্রসঙ্গে উঠল বাংলার ফুটবলের কথা। বললেন 'ভারতীয় ফুটবলে আজ বাঙালি কোথায়? জাতীয় দলে বাঙালির সংখ্যাটাই কমছে। খবরের কাগজের ফুটবল নিয়ে খবরও কমে গেছে।' হয়ত আড্ডাটা চলতই যদি না উনি বলতেন 'আজ একটু কাজ আছে। তাছাড়া বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকের মতটা নিয়ে নিই। তারপর আর এক দিন বসা যাবে।' অগত্যা।

পরবর্তী সাক্ষাৎ পর্ব এবং অপ্রিয় সত্য ভাষণ

আকাশে থম মেরে আছে বাদল মেঘ। আমরা আবার সেই আজ্ঞগের দিনের জায়গায়। বসেও আছি দুঘন্টা। সময় উড়ে যায়, পুড়ে যায়, সিগারেট শেষ হয়। ততক্ষণে তির তির করে একটা উদ্বেগ শুরু হচ্ছে। ভারত বিখ্যাত এক শিল্পীর সাক্ষাৎকার নিতে এসেছেন এক খ্যাতনামা এক বাঙালি সাংবাদিক। সাংবাদিককে বসিয়ে শিল্পী বললেন 'একটু বসুন ভাই। আমি আসছি।' তারপর সাংবাদিক বসে আছেন তো বসেই আছেন। কয়েক ঘন্টা কেটে গেছে। এমন সময় শিল্পীর সেক্রেটারি এসে সাংবাদিককে দেখে বলেন 'সে কী, বসে আছেন কেন?' সাংবাদিক বলেন 'উনি আমাকে বসতে বলে গেছেন। আর আসছি বলেও গেছেন।' এবার সেক্রেটারি বলেন 'স্যার তো প্যারিস চলে গেলেন। দিন পনেরোর আগে আসবেন না।' গল্পটা বললাম এই কারণে যে আমরা তখন নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছি আজ অন্তত আমাদের সঙ্গে এটা হবে না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পার্থদার ফোনে উনি জানালেন সময় দেবেন উল্টোদিকের ম্যানসনের একটি রেস্তোরাঁয়। অতএব গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তা পেরিয়ে অবশেষে আবার ওঁর মুখোমুখি। জায়গাটা খুঁজে বার করতে কিছু সময় লাগল ঠিকই তবে খবর খুঁজে বার করতে গেলে সাংবাদিককে অনেক কিছুই করতে হয়। উনিও আবারও জিজ্ঞেস করলেন কী সাক্ষাৎকার? কী ব্যাপার? কেন? বললাম, কোনো সাক্ষাৎকার নয়, রেকর্ডার চালিয়ে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের ভিত্তিতে আড্ডা মারব। তা এবার দেখলাম উনি অরাজি হলেন না। আবার ধরতাই দিলাম। শ্যামনগর নয়। এবার গল্প গড়াবে উত্তাল সত্তর দশকের দিকে। পিকে, অমল দত্ত ও অন্যান্য আলোচনায়। যে সত্তর দশক এই প্রতিবেদকের শৈশব বাল্যের ফেলে আসা স্মৃতি।

পিকে, অমল দত্ত এবং

'আমরা ছোটোবেলায় প্রদীপদা, চুনিদার খেলা দেখে বড়ো হয়েছি। এখন ঐ রকম প্লেয়ার কোথায়? তখন ফুটবলে বিখ্যাত কোচেরা বিভিন্ন মাঠে মাঠে ঘুরে ইয়াং ট্যালেন্ট তুলে আনতেন। আমি অচ্যুত ব্যানার্জিকে দেখেছি কী ভাবে প্লেয়ার খুঁছে আনছেন । এখন ওরকম কাউকে তো চোখে পড়ে না।' থামলেন সুব্রত। বালি প্রতিভা থেকে শুরু করে নানা ছোটোদল হয়ে যখন বড় ক্লাবে এসে পড়লেন তখন কলকাতা ময়দানে পিকে অমল দত্তর দ্বৈরথ শুরু হয়ে গেছে। সুব্রতর মতে 'প্রদীপদা ছিলেন তৈরি খেলোয়াড়দের নিয়ে সেফ খেলার লোক। ওঁর কাছে খেলার ফলটাই ছিল প্রধান। খুব একটা ঝুঁকি নিতে দেখিনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে বিশেষ যেতেন না। যাকে বলে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড কোচ। ম্যান ম্যানেজমেন্ট ছিল অসাধারণ। বাবলুবাবু বলে ডেকে, এখন বুঝি, বেস্ট আউটপুটটা বার করে নিতেন। নানা আবেগ, নাটকীয়তার আশ্রয় নিতেন। তখন এটা নাটকবাজি বলে মনে হলেও এখন মনে হয় ভালো কোচ হতে গেলে অভিনয় দক্ষতাটাও বোধহয় লাগে যেটা আমার একদমই নেই। আমি সোজা সাপ্টা কথাই বলি। খেলোয়াড়দের মোটিভেট করতে গেলে কোচের ভূমিকা বিরাট।' থামলেন সুব্রত। বড়ো ক্লাবে খেলার স্বপ্ন সবারই থাকে, সুব্রত ভট্টাচার্যেরও ছিল। শোনা যায় এক ভোরবেলায় স্বয়ং চুনি গোস্বামী মোহনবাগানে খেলার অফার নিয়ে শ্যামনগরে সুব্রতর বাড়িতে যান। সুব্রতর বাবা ছেলেকে বলেন 'ঘুম থেকে ওঠো, চুনিবাবু এসেছেন'। ছোটোবেলার হিরোকে ফেরাতে পারেননি বাবলু। যোগ দেন মোহনবাগানে।

আবার স্মৃতির সরণী বেয়ে অমল-প্রসঙ্গ। 'অমলদা ভালো লোক। সোজা কথা বলতেন। সেই জন্যই হয়ত জীবনে ওঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। যাক সে কথা। অমলদা পণ্ডিত মানুষ। ফুটবলটা গুলে খাওয়া। অঙ্ক করে ছোটো ঝুঁকি উনি নিতে পারতেন। অনেক খেলোয়াড় ওঁর হাত ধরে ময়দানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।' হয়ত আরও অনেক কিছুই বলতে পারতেন, কিন্তু বললেন না। তবে অমল দত্ত যে অচ্যুত ব্যানার্জির মতো ক্রিয়েটিভ কোচ সেটা বলতে ভুললেন না। আরও বললেন, 'ক্রিয়েটিভ কোচ দরকার, বিশেষ করে জুনিয়র স্তরে। কোচ তো তিনিই হবেন যাঁর প্রতিভা চেনার জহুরির চোখ থাকবে। ফুটবলার তৈরির আসল কারিগর তো কোচই।'

সুব্রত, বিপ্লব ও রাজনীতি

সবাই জানেন অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের

একজনের নাম সুব্রত ভট্টাচার্য। এবং বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল। সেটা হল একটু বাম দিক ঘেঁসে হাঁটা। সে যুগের প্রায় সব আদর্শবাদী যুবকরাই মনে মনে বামপন্থী ছিলেন। বিপ্লব-বন্ধু সুব্রতও কি তাই? কী বলেন বাবলুবাবু। সুব্রত বললেন, 'আমি কোনো রাজনৈতিক দলের অন্ধ সমর্থক ছিলাম না সেই অর্থে। রাজনৈতিক দলগুলোর আশ্বাস পেলেও আশ্বস্ত হইনি কখনও। আমার ঘরের লোকই বামফ্রন্টের মন্ত্রী ছিলেন। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিদ্যুত গাঙ্গুলির নাম শুনেছেন তো? তিনি ছিলেন আমার মামা। রাজনীতি করার সুযোগ আমার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু করিনি কখনও। আমার কাছে ফুটবলই সব। ফুটবলার হতে চেয়েছিলাম, হয়েছি' বললেন ময়দানের বাবলুদা।

তৎকালীন ভারতীয় দল ও তিনি, সুব্রত ভট্টাচার্য যখন কেরিয়ারের মধ্যগগনে তখন জাতীয় দলে নিয়মিত খেলছেন জি এস পারমার, শেখরন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এমনকী সুদীপ চ্যাটার্জি, তরুণ দে-রা। অথচ সুব্রত সেই সময়ে দুরন্ত ফর্মে থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত হতে পারেননি ভারতীয় দলে। বলা দরকার সেইসময় পাঞ্জাব তনয় গুরদেব সিং ১৯৭৮ সালের ব্যাঙ্কক এশিয়াডে ভারতের অধিনায়ক হন। অর্জুন পুরস্কার পান। কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলতে এসে 'রীতিমতো লোক হাসানো ফুটবল খেলেন' বলে অভিযোগ। কিন্তু এতৎসত্বেও ভারতীয় দলে সুব্রত ভট্টাচার্য যে নিয়মিত জায়গা পাননি তার জন্য তাঁর আপশোস হয় না? বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ম্যাচে অনেক চাপের মুখে খেলোয়াড়দের সেখানে খেলতে হয় সেখানে মনোরঞ্জনের পাশে সুব্রতরই তো হওয়া উচিত ছিল অটোমেটিক চয়েস। আপশোস হয় না? । সুব্রতর সটান জবাব 'হয় তো নিশ্চয়ই, তবে সেটা ভেবে বসে থাকলে তো চলবে না।' তারপর একটু সময় নিলেন ও তির্যক ভাবে বললেন 'আসলে সে সময়ে দেখা যেত যে যখন ভালো ফর্মে থাকত সে তখন জাতীয় দলের বাইরে থাকত।

অ্যাংরি ইয়ং ম্যান থেকে অ্যাংরি ওল্ড ম্যান

এই প্রজন্ম জানে না সুব্রত ভট্টাচার্য কতখানি দোর্দণ্ডপ্রতাপ খেলোয়াড় ছিলেন তাঁর জমানায়। তাঁকে সেই সময়ে অ্যাংরি ইয়ংম্যান বলতেন অনেকেই। এই বিষয়ে নানা কাহিনী কিংবদন্তি জনশ্রুতি আছে। কী মত খোদ বাবলুদার? দেখুন, আমি বরাবরই স্পষ্ট বক্তা এটা সবাই জানেন। সেই জন্য শত্রুর সংখ্যাটা বেশি। অনেকেই আমাকে এড়িয়ে চলে। আবার অনেকেই স্পষ্ট কথার জন্যই ভালোবাসে' বললেন সুব্রত। তারপর বললেন 'এখনই আমার সঙ্গে মোহনবাগান ক্লাবে চলুন, দেখবেন অনেকেই আমাকে দেখে এড়িয়ে যাবেন। অনেকেই আমার পেছন পেছন ঘুরবে। এই যে খাবাজী, সানজারি থেকে মজিদ, জামশিদ চিমা, চিবুজার, ক্যামিনো স্যান্টোস কত প্লেয়ার এল গেল। আমাকে কেউ টপকাতে পেরেছে? পারেনি তো। এটা বলব না? তেমনি মোহন কর্তারা যখন পয়সার বিনিময়ে নিম্ন মানের প্লেয়ার এনেছেন তখন প্রতিবাদ করেছি।' এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঢুকব বলে একটু সময় নিলাম। তারপর বললাম '১৯৮৯ সালে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ম্যাচে রেফারি প্রদীপ নাগকে চড় মেরে সেই আমলে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছিলেন আপনি। সেই জন্য কোনো অনুশোচনা হয় না?' জবাবে সুব্রতর ডিফেন্স মচকালো কিন্তু ভাঙল না। উনি বললেন 'ওটা কম বয়সের ভুল। জরিমানা দিয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু রেফারিকে আমি মারিনি! মানে স্লাপ করা বলতে যা বোঝায় তা করিনি। তবে এখনও কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করতে ভয় পাই না।'

স্টপার সুব্রত...ইস্টবেঙ্গলের ছেলে?

হে ধীমান মোহন-পাঠক আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাদের প্রিয় বাবলুদা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক বা খেলোয়াড় বা কর্মকর্তা কোনোটাই ছিলেন না; কিন্তু জানেন কি তিনি একটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন যার নাম, না, 'মোহনবাগানের মেয়ে' নয়, বরং ইস্টবেঙ্গলের ছেলে। সেই ছবিতে সুব্রত ভট্টাচার্য নিজের চরিত্রে নিজেই অভিনয় করেছিলেন। ওনার সঙ্গেই অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং পিকে ব্যানার্জি সহ আরও অনেক খেলোয়াড়। নায়ক ছিলেন চিরঞ্জিৎ। ১৯৮৮ সালে এই ছবিতে অভিনয় করার পর নব্বই দশকের প্রথম দিকে মতি নন্দীর বিখ্যাত উপন্যাস 'স্টপার' অবলম্বনে দূরদর্শনের 'স্টপার' সিরিয়ালে অভিনয় করেছিলেন এবং কী আশ্চর্য আবারও সুব্রত ভট্টাচার্য অর্থাৎ নিজের ভূমিকায়। কেমন ছিল সেই অভিজ্ঞতা? সুব্রত বললেন 'কেমন আবার কী? যে রকম করতে বলল করে দিয়েছি। একটা অভিজ্ঞতা হল। এই পর্যন্ত'। ছেলে সাহেব তো অভিনয়কে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন, প্রতিবেদককে মাঝপথে কেটে উনি বললেন 'তা নিয়েছে নিয়েছে, সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।' প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অভিনয় লুকিয়ে থাকে। কেউ অভিনয় করেন

কেউ করেন না।

কোচ সুব্রত এবং কিছু কথা

নব্বই দশকের একেবারে গোড়ার দিকে এফ সি আই দলের কোচ হিসেবে ময়দানে বাবলুর অভিষেক। তখন একটা বিতর্ক ছিল অফিস বনাম ক্লাব। ক্লাবে খেললে অফিসের হয়ে খেলা যাবে না, আবার অফিসের হয়ে খেললে ক্লাবের হয়ে খেলা যাবে না। ফলে, পড়তি ফর্মের অনেক ফুটবলারই ক্লাব ছেড়ে অফিসের হয়ে খেলাকে বেছে নেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় অলোক মুখার্জি, অতনু ভট্টাচার্যরা এফ সি আই-এর হয়েই খেলতে বাধ্য হন। সেই এফ সি আই-এর কোচ ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য। এয়ার লাইনস কাপে বড়ো দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেও ফাইনালে ১৬ গোলে হারেন আর এক বড়ো দলের কাছে। সে বছর লিগের শুরুতে এফসিআই-কে চতুর্থ প্রধানের তকমা দেওয়া হলেও লিগ যত গড়িয়েছিল পিছিয়ে পড়েছিল এফসিআই। তবু কোচ হিসেবে চোখে পড়লেন এবং একদিন বড়ো দলের কোচ হলেন। সাংবাদিকদের মতে কলকাতা ময়দানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোচের নামই সুব্রত ভট্টাচার্য। কিন্তু সুব্রত নিজে কী বলেন? 'সে তো বটেই। কোচ হিসেবে আমার মতো সাফল্য প্রদীপদারও নেই, অন্তত ট্রফি দেওয়ার নিরিখে। কি জিতিনি। লিগ শিল্ড ডুরান্ড রোভার্স আই লিগ, ফেড কাপ।' থামলেন সুব্রত। এইবার সেই অনিবার্য প্রশ্ন। ছিলেন কট্টর মোহনবাগানী, একটানা সাতের বছর মোহনবাগানের জার্সিতে কী করে উজ্জ্বল ছিলেন সুব্রত? পদস্খলন হয়েছিল আর-এক ভট্টাচার্য মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে। একটানা ষোল বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলে শেষ বছর ১৯৯৩ সালে একটাকার বিনিময়ে মোহনবাগানে খেলে অবসর নেন ইস্টবেঙ্গলের ছেলে। তাহলে সুব্রত ভট্টাচার্য কেন ক্লাব বদল করেননি? তাঁর কাছে তো অফার তো ছিলই। সুব্রত জানালেন 'আসলে সেই অর্থে পেশাদার হতে পারিনি তো, তাই আবেগ কমিটমেন্ট গুরুত্ব পেয়েছে বেশি।' তাহলে কোচ হিসেবে মোহনবাগানের ছেলে কী করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোচ হলেন? কমিটমেন্ট, আবেগ কোথায় গেল? কী বলবেন সুব্রত? তিনি বললেন 'আরে যে স্কুলের ছাত্র ছিলাম সে স্কুলেরই শিক্ষক হতে হবে এটা কে বলল! আমি ছোট্টবেলা থেকেই মোহনবাগানে খেলতে চেয়েছিলাম। খেলেছি। ব্যাস।' কোচ সুব্রতর জামানা কি তবে শেষ? যাঁর হাত ধরে সুনীল ছেত্রী,সুব্রত পালরা উঠে আসেন সেই কোচ স্রেফ এ লাইসেন্স কোচের ডিগ্রি নেই বলে ব্রাত্য হয়ে যাবেন কেন? সুব্রতর দাবি এশিয়ার ৪৩টা দেশের মধ্যে ৩৮টা দেশেই নাকি এ লাইসেন্স ডিগ্রি ছাড়াই কোচিং করানো যায়। তাঁকে আর জিজ্ঞেস করিনি ভারত ছাড়া আর কোন চারটি দেশে এ লাইসেন্স লাগে না যদি একটু বলেন! তবে এটা জিজ্ঞেস করা হল ওঁকে যে কোচ নয় টিডি বা টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবেও আই লিগের দলগুলো ডাকে না কেন? সেখানেও কি ডিগ্রির দরকার আছে? উনি এক্ষেত্রে প্রশ্নটি ডাক করলেন।

এবং রিমুভ এটিকে আন্দোলন

গত একবছর ধরে মোহন-সমর্থকরা মোহনবাগানের নামের আগে এটিকের নাম বাদ দেওয়ার আন্দোলন করছেন। মলয় গুপ্ত নামে উত্তর কলকাতার এক মোহন-সমর্থক জানাচ্ছেন 'মোহনবাগান নিজেকে এটিকের কাছে বেচে দিয়েছে।' পাশাপাশি পড়শি ক্লাব ইস্টবেঙ্গল কিন্তু নিজের নামেই আইএসএল খেলছে। এই প্রতিবেদন যখন বের হবে তখন এটা হয়ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে মোহনবাগানের নামের আগে এটিকে থাকল কিনা। দক্ষিণ কলকাতার জনৈক সমর্থক নিলয় বরাট বললেন, '২০১৯-'২০র আই লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের মাত্র দুজন খেলোয়াড় শেখ সাহিল ও কিয়ান নাসিরি তার পরের বছর এটিকে মোহনবাগানের দলে সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ক্লাবের ৮০ শতাংশ শেয়ার এটিকে কে বেচে দেওয়ার জন্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরসে ক্লাবের মাত্র দুজন ছিল। অর্থাৎ এটিকে সেদিনকার প্রোডাক্ট হয়ে মোহনবাগানকে গ্রাস করল। টাকার বিনিময়ে মোহনবাগানের ফ্যানবেস কিনে নিল।' এক্ষেত্রে কী বলবেন মোহনবাগানের 'ঘরের ছেলে'?। সুব্রত ভট্টাচার্য কিন্তু বললেন 'আরে ওরা ইনভেস্টার। এখন সিস্টেম পাল্টে গেছে। মোহনবাগানের উন্নতির জন্য টাকা লাগবে। কে দেবে? দেবেটা কে? ফলে ওদের সাহায্য নিতে হবে। আগেও তো স্পন্সররা ছিল। অর্থাৎ উনি ক্লাবের সমর্থনেই দাঁড়ালেন। এবং নিজের নামে খেলার জন্য পড়শি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের গত দুবছরের লড়াই নিয়ে কিছু বলতে রাজি হলেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মোহনবাগানের সমর্থক সুব্রত ভট্টাচার্যের এ হেন উত্তর শুনে বলেছেন, হয়ত এটা ওঁর ব্যাক্তিগত মতামত। উনি মোহনবাগানের ঘরের ছেলে হিসেবে এটা ভালোই জানেন এই আন্দোলন আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। তবু ওঁর কাছে এই উত্তর প্রত্যাশিত ছিল না'।

নবান্নর খপ্পরে মোহনবাগান?

মোহনবাগানের কর্মসমিতি বা গুরুত্বপূর্ণ পদে সম্প্রতি এসেছেন ঘটনাচক্রে রাজ্যের শাসক দলের প্রভাবশালী নেতা যেমন মলয় ঘটক, কুনাল ঘোষ প্রমুখ। এছাড়াও কর্মকর্তাদের মধ্যে বহুদিন ধরেই আছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। যদি টুটু বসুকে রাজ্যের শাসক দলের প্রাক্তন রাজ্যসভার সদস্য বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে একমাত্র দেবাশিস দত্তই হলেন সেই লোক যাঁর সেই অর্থে কোনও স্পষ্ট রাজনৈতিক পরিচয় নেই; যদিও খবরে প্রকাশ তিনি সরকার বিরোধী নন। এমতাবস্থায় ঐতিহ্যশালী মোহনবাগান ক্লাব কি তাহলে বকলমে, পরোক্ষে, ঘুরিয়ে, কার্যত নবান্নের খপ্পরে পড়ে গেল না? সুব্রত ভট্টাচার্য অবশ্য সেটা মানতে নারাজ। তাঁর মতে 'রাজনীতির লোকেরা মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে আগেও যুক্ত ছিলেন। যেমন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লোকেরা। তাতে কিছু এসে যায়নি। তাঁরা থাকতেই পারেন। অনেক সময়েই তাঁরা ক্লাবের পাশে এসে দাঁড়ান। এতে দোষ কোথায়?' না, তাতে দোষ হয়ত নেই তবে গত এক দশক ধরে ক্লাবের বিভিন্ন কাজে রাজনৈতিক গন্ধের সন্ধান পেয়েছে কয়েকটি মহল এ নিয়েও সন্দেহ নেই। আমরা এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থেকে নীরব অবস্থানই নিলাম।

কর্মকর্তা, স্পটার এবং এক প্রাক্তন ফুটবলার আমাকে কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'ওরে বাবা বাবলুদা!' বাবলুদার কাছে যাচ্ছি শুনে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রাক্তন ফুটবলার যখন এই কথা বললেন তখন

জিজ্ঞেস না করে পারলাম না কেন এই কথা বলছেন? ভদ্রলোক বললেন 'বাবলুদার মুখে কিছুই আটকায় না।' ওঁর এই অমোঘ ভবিষ্যত বাণী যে কী ভাবে মিলল এটা তারই গল্প। কলকাতার তথা বাংলার ফুটবলকে এগোতে হলে কী করা উচিত—আপনার মতে মুখ খুললেন বাবলুবাবু 'জেলায় জেলায় স্পটার নিয়ে জেলা থেকে ফুটবলার তুলতে হবে। আমাদের আগে বলাই চ্যাটার্জি যেভাবে চুনিদাকে খুঁজে বার করেছিলেন সেই রকম স্পটার আজ কোথায়? চুনিদা খুব কম বয়স থেকেই মোহনবাগানে খেলছেন। ল্যাংচা মিত্র, বাঘা সোমদের মতো স্পটার লাগবে এখন। কর্মকর্তাদের টাকা খেয়ে নিম্ন মানের বিদেশি আনা বন্ধ করতে হবে।' দেখলাম অন্য দিকে আলোচনাটা ঘুরে যাচ্ছে। ওঁকে আবার আলোচনায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বললাম আইএফএ প্রেসিডেন্ট অনির্বাণ দত্ত কিন্তু জেলা ফুটবলকে তুলে ধরার উদ্যোগ নিচ্ছেন এবং সাবেক আইএফএ প্রেসিডেন্ট জয়দীপ মুখার্জি পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় ডিভিশন পর্যন্ত কলকাতা লিগকে বিভিন্ন এজ গ্রুপের লিগে রূপান্তরিত করেছেন। প্রতিবেদকের কথা মাঝখানে কেটে সুব্রত বললেন 'কেউ কিস্যুই করতে পারবে না। লোকে বলে সেরকম ভালো বাঙালি প্লেয়ার কোথায়, যার খেলা দেখতে লোক যাবে?' বললাম মোহনবাগান ক্লাবের তো অ্যাকাডেমি আছে। সেখান থেকেও প্লেয়ার ওঠেনি বলছেন। 'কোথায় উঠেছে বলুন?' পাল্টা প্রশ্ন সুব্রত ভট্টাচার্যের। আপনাকে ক্লাব তো এই দায়িত্বটা দিতে পারে? এই প্রশ্নের সরাসরি কোনো উত্তর না দিলেও তাঁর নীরবতাই অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল।

প্রসঙ্গ পাল্টে ওঁকে জানালাম সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব এসেছে প্রিমিয়ার ডিভিসন বি তে। সেই দলের কোচ মোহনবাগানের আই লিগ জয়ী কোচ কিবু ভিকুনা। সেই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন মানস, বিদেশরা। এছাড়াও জেলা থেকে ফুটবলার তুলে আনার ক্ষেত্রেও অনেক প্রাক্তন ফুটবলার যুক্ত হচ্ছেন বইকি! কথাটা শেষ করতে দিলেন না বাবলুদা। মাঝখান থেকে কথা কেটে বললেন 'কে মানস-বিদেশ? ওরা ফুটবলের কী বোঝে? ওরা ফুটবলের কিস্যুই জানে না। মানস-বিদেশ দেখাচ্ছে। ওরা দালাল।' বলে কী লোকটা! আমরা তো স্তম্ভিত। বললাম, এটা কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে। এটা ছাপা যাবে তো? স্বমহিমায় সপাটে কড়া ট্যাকলই করলেন সুব্রত ভট্টাচার্য। বললেন 'হ্যাঁ যাবে। আমি কাউকেই ভয় পাই না।'

ওল্ড ইজ গোল্ড

ময়দানের বাবলুদার সম্পর্কে জনৈক প্রাক্তন খেলোয়াড়ের মত, 'উনি নিজের জগতেই পড়ে আছেন। সমকালীন ভারতীয় ফুটবল যে কত পাল্টে গেছে উনি মানতে নারাজ। ওঁর জগৎ শুরু সেই পঞ্চাশ দশক থেকে। আর শেষ এই শতাব্দীর প্রথম দশকে এসে, যখন উনি দাপুটে কোচ ছিলেন'। তবু বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের সুব্রত ভট্টাচার্যের মতো ব্যতিক্রমী চরিত্রের দরকার আছে বলেই অনেকে মনে করেন। কারণ অবক্ষয়ের এই সময়ে বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যেও এমন একজনকেই দরকার। বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার জন্য অসম সাহসী ঋজু মেরুদণ্ডেরই আজ বড়ো প্রয়োজন। তাই না?

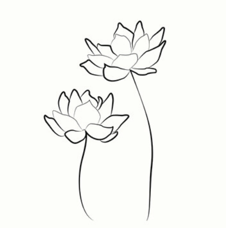

প্রকাশিত হল

মুক্তিযুদ্ধের
পঞ্চাশ বছরে

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর
অমূল্য স্মৃতিকথা

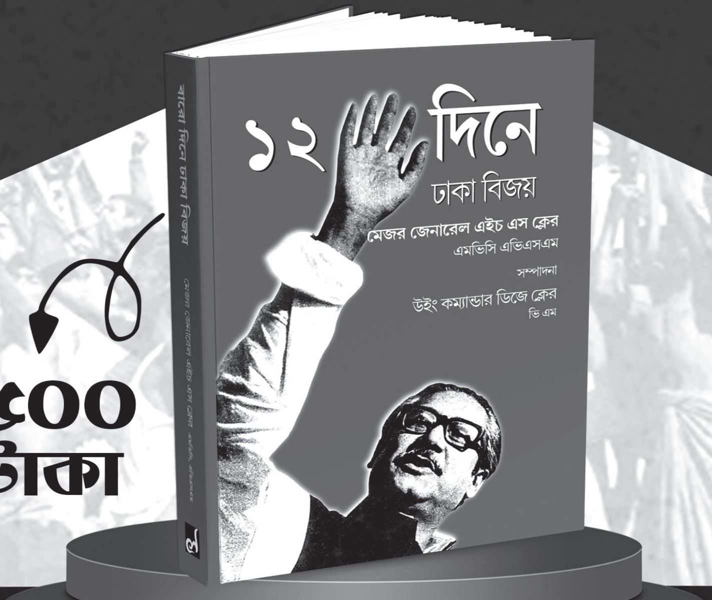
১২ দিনে
ঢাকা বিজয়
মেজর জেনারেল এইচ এস ক্লের
এমভিসি এভিএসএম
সম্পাদনা
উইং কম্যান্ডার ডিজে ক্লের
ভি এম
বারো দিনে ঢাকা বিজয়

৫০০
টাকা

লুক ইস্ট মিডিয়া প্রা. লি
সি ই ১৭, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৬৪

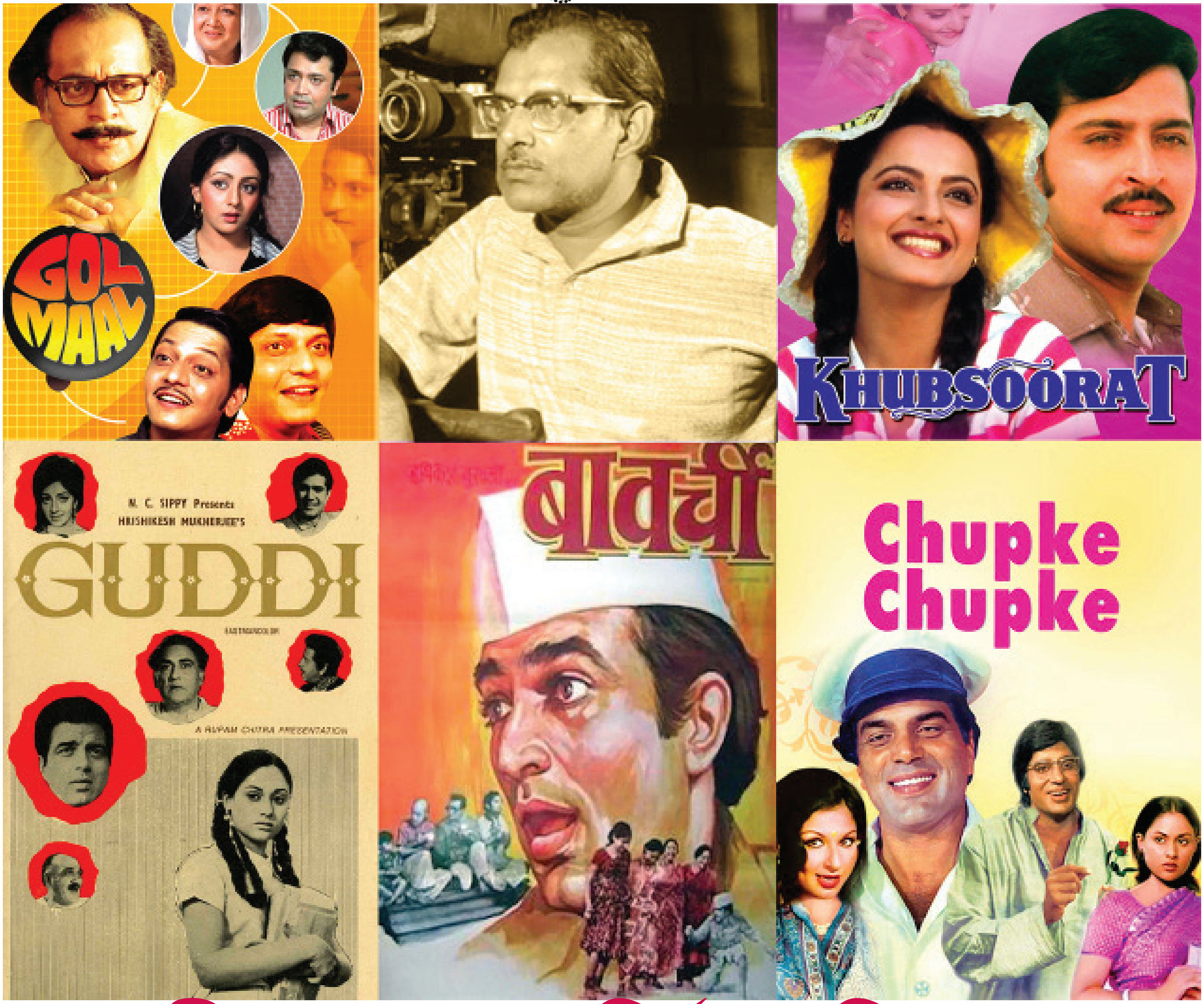
GOL MAAL
KHUBSOORAT
N. C. SIPPY Presents
HRISHIKESH MUKHERJEE'S
GUDDI
A RUPAM CHITRA PRESENTATION
বাবর্চী
Chupke Chupke

হৃষীকেশ মুখার্জির ছবিতে সিনেমার প্রসঙ্গ

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বছর দশেক আগের কথা, এক পাঞ্জাব প্রবাসী দাদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। দেখা হতেই বললেন ‘এখন বুঝছি হৃষীকেশ মুখার্জি (১৯২২-২০০৬) কত বড়ো পরিচালক।’ ভদ্রলোক একটি ভারত বিখ্যাত পোশাকনির্মাণ সংস্থার বিপণন শাখার বড়োকর্তা। তাঁর এহেন মন্তব্যে আমি স্বভাবতই অবাক। জানা গেল তাঁর শ্যালিকার স্কুল পড়ুয়া কন্যা বাংলা ছবির এক নায়কের প্রেমে উন্মাদ। তার বাবা-মা নরমগরম নানা পন্থা প্রয়োগ করেও সেই ‘ভূত’ ছাড়াতে ব্যর্থ। শুনে ভারী অবাক লাগল। যখন প্রথমবার ‘গুড্ডি’ (১৯৭১) দেখি তখন আমার কিশোরবেলা কাটেনি। মজাদার এই ছবি দারুণ উপভোগ্য লেগেছিল। সেদিনের দূরদর্শন নিবেদন আমার সঙ্গে বসে আর যাঁরা দেখছিলেন

তাঁরাও সেই জমাটি ছবির মজা নিচ্ছিলেন চেটেপুটে। সেই ছবি যে কারোর জীবনে এমন হানা দিতে পারে কে জানত? হৃষীকেশ মুখার্জি যখন ‘গুড্ডি’ নির্মাণ করছেন তখন চলচ্চিত্র জগতে তিনি প্রায় আড়াই দশক কাটিয়ে ফেলেছেন। তখনও হিন্দি ছবির বিষয়বস্তু রূপে হিন্দি সিনেমার প্রসঙ্গ ছিল এক বিরল ঘটনা। গুলজারের কাহিনির ভিত্তিতে নির্মিত ছবির কেন্দ্রিয় চরিত্র কুসুম (জয়া ভাদুড়ী) এক প্রাণবন্ত স্কুল ছাত্রী, যার কাছে চিত্রতারকা ধর্মেন্দ্র এক যুগপুরুষ। যে কোনো অন্যায় করতেই পারে না। কুসুম বা গুড্ডির ধারণায় ধর্মেন্দ্রের প্রতি কুসুমের ভালোবাসা যেন কৃষ্ণের প্রতি মীরার শর্তহীন প্রেম। কুসুমের প্রতি অনুরক্ত যুবক নবীন (সমিত ভঞ্জ) এ কথা জানায় তার মামাকে (উৎপল দত্ত)। তার উদ্যোগে ও অবশ্যই ধর্মেন্দ্রের সহায়তায় কুসুমকে সিনেমার পর্দার জীবন ও বাস্তব জীবনের ফারাক বোঝানো সম্ভব হয়। সমস্তটাই ঘটে রোম্যান্টিক কমেডির জমজমাট আবহে। সিনেমায় সিনেমার প্রভাব নিয়ে পরিচালক মশাই যাই আলোচনা করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত এই ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় চলচ্চিত্র একটি পণ্য। সেই পণ্যের বিক্রিবাটা ভালো হলে অন্য বিনিয়োগকারীরা সেই রকম ক্ষেত্রেই লগ্নি করবেন। সিনেমায় এটাই ‘রিমেক’। ‘গুড্ডি’র সাফল্য পরিচালক মুক্তা শ্রীনিবাসনকে উৎসাহিত করল তার তামিল রিমেক ‘সিনেমা পারিথিয়াম’ (১৯৭৫) নির্মাণে। যেখানে তামিল সুপারস্টার জয়শংকর পর্দায় হাজির হলেন স্বনামে। সিনেমা নিয়ে তোলা হৃষীকেশবাবুর প্রশ্ন হয়ত ঢাকা পড়ল বাণিজ্যের জৌলুষে, কিন্তু সুদীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবনে জনপ্রিয় ও শিল্পসম্মত সুস্থ মনোরঞ্জনের ভারসাম্য রক্ষার মধ্যপথে স্থিত পরিচালক নিজের প্রিয় মাধ্যম নিয়েও প্রশ্ন তুলতে পিছপা ছিলেন না। বাবা শীতলচন্দ্র মুখার্জি রসায়নে স্নাতকোত্তর। তিনি বিজ্ঞানের কৃতি ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সরকারি আমলার উচ্চপদে কর্মজীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হন। তিনিই চাইতেন তাঁর সন্তান বিজ্ঞানে কৃতি হোক। রসায়নের উজ্জ্বল ছাত্র হৃষীকেশ কিছুকাল বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করলেও একদিন এসে হাজির হলেন ‘নিউ থিয়েটার্স’-এ। ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে স্টুডিয়োতে প্রবেশ। সম্পাদনায় তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক দেখে প্রবাদপ্রতিম বিমল রায় নির্দেশ দিলেন ফিল্ম এডিটিং-এর কাজে যুক্ত হতে। নিউ থিয়েটার্স-এর বিখ্যাত চলচ্চিত্র সম্পাদক সুবোধ মিত্রের অধীনে কাজ করতে করতে হয়ে উঠলেন একজন দক্ষ সম্পাদক। তাঁর স্বাধীনভাবে সম্পাদিত ছবিও মুক্তি পেতে লাগল। তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় প্রযোজক বি আর চোপরা তাঁকে একজন সেরা সম্পাদক রূপে বর্ণনা করেন। আলোকশিল্পী তাপস সেন তাঁর আত্মজীবনী ‘আলোছায়ার পথে’তে তাঁদের আড্ডার বন্ধু হৃষীকেশকে মনে করেছেন। চল্লিশের দশকের অশান্ত সময়ে প্যারাডাইস কাফের চায়ের আড্ডায় মৃণাল সেন, তাপস সেনদের সঙ্গে তিনিও ছিলেন। এসবের সঙ্গেই চলছিল সঙ্গীতচর্চা। আকাশবাণীতে সেতারবাদক হৃষীকেশ মুখার্জির বাজনা শোনা যেত হামেশাই। বিমল রায় যখন কলকাতার পাট চুকিয়ে বম্বে গেলেন অন্য কয়েকজনের মতো হৃষীকেশও তাঁর সঙ্গী হলেন। বিমল রায় তাঁর কাজের ক্ষেত্রে হৃষীকেশের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিলেন। দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ তাঁর মননেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৫৩ সনে বিমল রায় ‘দো বিঘা জমিন’ পরিচালনা করলেন, যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি মাইলফলক। এই ছবির প্রধান সহকারী পরিচালক, সম্পাদক ও চিত্রনাট্যকার হৃষীকেশ মুখার্জি। এর চারবছরের মধ্যেই তিনি স্বাধীনভাবে পরিচালনায় এলেন। ১৯৫৭ সনে দিলীপকুমার অভিনীত ‘মুসাফির’ রাষ্ট্রীয়স্তরে পুরস্কৃত হলেও জনপ্রিয় হয়নি। সেই স্বীকৃতি এল রাজ কাপুর, নূতন অভিনীত ‘আনাড়ি’ (১৯৫৯) ছবিতে। ১৯৬০ সনে নির্মিত ‘অনুরাধা’ পরিচালক রূপে হৃষীকেশ মুখার্জির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিল। গ্রামের মানুষের সেবায় নিবেদিত এক বিজ্ঞানতাপস চিকিৎসকের ব্যক্তিগত দাম্পত্যের সংকট কেবল এদেশে নয় বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবেও তুমুল সমাদৃত হয়। ৪২টি চলচ্চিত্রের সফল রূপকার ১৯৯৯ সালে এ দেশের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন। ২০০১-এ পেলেন পদ্মবিভূষণ। ন্যাশ্যন্যাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (NFDC) ও সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC)-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন। পেয়েছেন অজস্র পুরস্কার। নিউ থিয়েটার্স-এর পর্দায় গল্পবলার সাহিত্য ঘেঁষা ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বম্বে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে বিমল রায়ের সূত্রে পেয়েছিলেন ছবিতে সমাজবাস্তবতা প্রকাশের তাগিদ। বম্বের চরম বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার জগতে ছবির বাণিজ্যিক সাফল্যের দিকটি অবহেলার কোনো সুযোগ ছিল না। প্রচলিত পরিবেশন ও আখ্যানরীতির চাহিদাকে পূরণ করেই তিনি একধরনের ছবি উপহার দিতে চাইতেন যা সুস্থ মনোরঞ্জনের উপকরণ হয়ে ওঠে। সমকালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের অতি সাধারণ চাওয়া-পাওয়া, আবেগ অনুভূতি ও মূল্যবোধ ঘিরেই তাঁর ছবির বিস্তার। বাণিজ্যিক চাহিদা ও শিল্পের দাবি, ইচ্ছাপূরণের আশা ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে এক নিপুণ ভারসাম্য রক্ষার মধ্যে দিয়ে হৃষীকেশ মুখার্জি তাঁর ছবিতে নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর ছবির এক অতি আকর্ষণীয় দিক সিনেমা নামক মাধ্যমটি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা। ‘গুড্ডি’তে পুরো ছবি আবর্তিত হয় সিনেমার বাস্তবতা আর বাস্তব জীবনের ফারাক অনুভবে, তবে এই প্রসঙ্গে তাঁর বিক্ষিপ্ত মন্তব্য আমরা দেখি ‘গোলমাল’ (১৯৭৯) বা ‘ঝুট বলে কাউয়া কাটে’ (১৯৯৮)-এর মতো ছবিতেও।

‘গুড্ডি’ ছবির পরিচয় দিতে গিয়ে আশিস রাজাধ্যক্ষ ও পল উইলিম্যান তাঁদের Encyclopaedia of Indian Cinema-তে বলছেন ‘Guddi appears to want to deconstruct the myth of the star and to show not only how films are made but the poverty, the exploitation and the transitory nature of stardom. What it does do, however, is produce a small parade of stars playing ‘themselves’. The films tentative critique of stardom involves drawing a comparison between contemporary screen idols and gods.’ হৃষীকেশ মুখার্জির ছবিতে রাজেশ খান্না, ধর্মেন্দ্রর মতো মহাতারকারা অভিনয় করেছেন আবার তাঁর ছবিতে অভিনয় করতে এসে তারকায় পরিণত হন অমিতাভ বচ্চন, জয়া ভাদুড়ীর মতন নটনটীরা। তারকা

প্রথা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলা তাঁর পক্ষে খুব সহজ কাজ ছিল না। ছবির কুসুম বা গুড্ডি হাইস্কুলের ছাত্রী, মা নেই। স্নেহশীলা বৌদির অবিভাবকত্বে সে বড়ো হচ্ছে। সে সবসময় সচেতন থাকে যাতে কেউ তার নিন্দা না করতে পারে, কারণ তাহলে তার বৌদির কর্তব্যপরায়ণতা মূল্য পাবে না। সে রীতিমতো বুদ্ধিমতী ও সপ্রতিভ। স্কুলের দুষ্টুমিতে, ঘর ও বাইরে তার আচরণের মাধ্যমে সেই প্রমাণ পরিচালক ছবির শুরুতেই দর্শককে জানান। এ হেন সংবেদনশীল মানবিক গুণসম্পন্ন, বুদ্ধিমতি কুসুম চলচ্চিত্রের জগতকে বাস্তবসত্য বলেই মনে করে। পর্দার নায়ক ধর্মেন্দ্র তার কাছে ঈশ্বরতুল্য, যে স্বর্গের দেবতাকে সে প্রণয়ের কথা বলে উঠতে পারবে না। তার প্রণয় অভিলাষী নবীনের মামার সৌজন্যে কুসুমকে হাজির করানো হয় স্বপ্ন তৈরির সেই কারখানায়। অবশ্যই স্বয়ং ধর্মেন্দ্রের ঐকান্তিক সহায়তায়। সেই সূত্রে এই ছবিতে ক্যামিও রূপে হাজির হয়ে যান ধর্মেন্দ্র ছাড়াও অশোক কুমার, দিলীপ কুমার, রাজেশ খান্না, শত্রুঘ্ন সিনহা, শশিকলা, দেবেন ভার্মা, বিনোদ খান্না, অমিতাভ বচ্চন, বিশ্বজিৎ, মালা সিনহা,প্রাণ, নবীন নিশ্চল, ওমপ্রকাশ, এবং স্বয়ং পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি। তিনি নিজেও এই ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্দ্য অঙ্গ, তাই পর্দার পিছনের জগতের ব্যবচ্ছেদ করার সময় নিজের ভূমিকাকেও তিনি রেয়াত করেননি।

এ কথা সবার জানা হলিউডেই স্টার সিস্টেমের সূচনা। যদিও প্রায় সমসময়ে ফ্রান্সেও কমেডিয়ানরা তারকার মর্যাদা পেতে থাকেন। যে সময়ে তারকাপ্রথার উত্থান ঘটছে খুব স্বাভাবিকভাবে তখনই তারকারা অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। অভিনেতারা যখন তাদের গুরুত্ব বুঝতে পারল তখনি তারা বিন্দুমাত্র দেরি না করে নিজেদের উচ্চমূল্য নির্ধারণ করে ফেলল। আর এই দাম চলচ্চিত্র নির্মাণকে একটা ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য থেকে এক বিশাল উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পে (Industry) পরিণত করল। কাজেই চিত্রতারকা নিছক একজন অভিনেতা নয়। অনেক তারকাই বেশ খারাপ অভিনেতা। ফিল্ম স্টার হলেন সেই মানুষ যার অভিনীত চরিত্র সমস্ত ভূমিকাতেই আলাদা করে চেনা যায়, যে ছবির আখ্যানের বাইরেও দর্শককে আবেগাপ্লুত করে। সত্যজিৎ রায় তাঁর বিখ্যাত An Indian New Wave? প্রবন্ধে উল্লেখ করেন ‘a star is a person on the screen who continues to be expressive and interesting even after he or she has stopped doing anything’ কার্যত ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তারকার জন্ম দেয়, অবশ্য তারকারা নিজেরাও তাদের এই ভাবমূর্তি নির্মাণে ও রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। এই ভাবমূর্তি নির্মাণ প্রায় সবটাই মায়াবাদের (Illusionism) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই মায়া নির্মাণের ক্ষেত্রে সিনেমার সহায়ক গণমাধ্যম। কোনো তারকার যে ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয় তিনি নিজেও সেই ভাবমূর্তি ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারেন না। বিখ্যাত চলচ্চিত্র আলোচক গাস্ত রোবের্জ তাঁর ‘সিনেমার কথা’ বইতে উল্লেখ করেছেন চলচ্চিত্রের আসল ক্ষেত্র হচ্ছে শিল্প, রাজনীতি ও অতিকথা [illegible] এবং তারকাদের বুঝতে গেলে তাদের অতিকথার অঙ্গ হিসাবেই দেখতে হবে। এইখান থেকে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে। আবার একটি অতিকথার অঙ্গ হিসেবে তারকাদের একটি সজীব শিল্পের অঙ্গ বলে চেনা যায়। ...এটা অন্তত বলা যায় যে শিল্পসমালোচক ও সমাজসমালোচকরা যদি চিত্রতারকাদের একটি অতিকথা হিসেবে বিচার করতে শুরু করেন, তবে তাঁরা যে ব্যাপারটিকে আক্রমণ করতে চান, তার চরিত্র আরো গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারবেন। ...অভিনেতা ও তাঁর অভিনীত ভূমিকা, এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ায় চিত্রতারকার সৃষ্টি। আবার সঙ্গে সঙ্গেই উদীয়মান তারকা ও তার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেও এক মিথস্ক্রিয়া ঘটতে থাকে। এই ভক্তমণ্ডলীই অভিনেতা-তারকাকে এক অতি মানবিক মাত্রা দান করে, এবং তখন তারকা ভক্তমণ্ডলীর সৃষ্ট সেই ভাবমূর্তিকে বাস্তব করে তুলতে সচেষ্ট হন। চলচ্চিত্র অভিনেতা তারকায় রূপান্তরিত হয়ে তাঁর ভক্তমণ্ডলীর কাছে এক প্রায় ঐশ্বরিক দ্বৈতসত্ত্বায় প্রতিভাত হন, ভক্তেরা সেই সত্ত্বার সঙ্গে একাত্ম হতে, তার অনুকরণ করতে এবং তার প্রতি আসক্ত হতে প্রণোদিত হন। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এই তারকা পূজা আমাদের অতি পরিচিত। এম জি রামচন্দ্রনের মৃত্যুর পর বহু ফ্যানের আত্মহত্যা বা কুলি (১৯৮৩) ছবির স্যুটিং-এ আহত নায়ক অমিতাভ বচ্চনকে ঘিরে আসুমদ্রহিমাচল জুড়ে গণউদ্বেগ এর জ্বলন্ত প্রমাণ। যদিও তারকারা একটি পণ্য এবং দর্শর্করা সেই পণ্য তাদের অর্জিত অর্থ দিয়ে কেনে; তা সত্বেও ভারতে পুরুষ তারকারা প্রায় দেবতার পংক্তিভুক্ত হয়ে যান। এক্ষেত্রে আমরা এন টি রামা রাও বা দূরদর্শনে প্রচারিত মহাকাব্য ভিত্তিক ধারাবাহিকগুলির কথা ভাবতে পারি। ‘গুড্ডি’তে এই সমসাময়িক কালের তারকাদের প্রায় ঈশ্বরপ্রতিম করে তোলার প্রসঙ্গটি আলোচিত ও সমালোচিত।

‘গুড্ডি’তে পরিচালক বারবার প্রফেসর গুপ্তকে দিয়ে বলিয়েছেন কুসুমের আচরণ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। স্কুলে কুসুমের বন্ধুদের সংলাপে সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত। সিনেমা তার সাবালকত্ব প্রাপ্তির শুরু থেকে সচেষ্ট আছে দর্শককে তার মায়ার জগতের মধ্যে টেনে নিতে, এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে যাতে দর্শকের এই ভ্রম হয় যে সে সিনেমার ওই কল্পিত জগতের অঙ্গীভূত। আখ্যানের চরিত্রদের সুখ, দুঃখ, উদ্বেগের সে অংশীদার। ছবি দেখার সময় দর্শকের মনে চলচ্চিত্র এক স্বপ্নের জন্ম দেয়। অনেক দর্শকের মনে সেই স্বপ্ন ছবির প্রদর্শন শেষ হওয়ার পরেও থেকে যায়। দর্শক সেই স্বপ্নেই বিভোর থাকেন। এই স্বপ্ন সেই দর্শককে ক্রমশ বাস্তব থেকে দূরে নিয়ে যায়, নিজের বাস্তব জীবনের বিকাশের পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। হৃষীকেশ মুখার্জি তাঁর ছবিতে কুসুম ও তার সহপাঠীদের মধ্যে দিয়ে সেই সত্যই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। হিরো নামক মিথটি তিনি নির্মম ভাবে ভাঙার চেষ্টা করছেন। পর্দার হিরো বা ভিলেন একজন রক্তমাংসের সাধারণ পরিশ্রমী কর্মী, যাদের শারীরিক দক্ষতার জন্য স্টান্টম্যানের সাহায্য নিতে হয়। হাততালি পাওয়া সংলাপের জন্য চিত্রনাট্যকার সংলাপ লেখকের ওপর নির্ভর করতে হয়, গান গাওয়ার জন্য গায়কের কন্ঠের সঙ্গে লিপ মেলাতে হয়। সর্বোপরি একজন নায়কের পেশাগত ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা তাকে কীভাবে অনবরত দুশ্চিন্তায় রাখে তাও অনালোচিত থাকে না। যখন কুসুম প্রথমবার বম্বেতে আসে তখন বম্বে শহরকে তার গুরুত্বপূর্ণ

সৌধ বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে পরিচয় করানো হয় না। কুসুমের চোখে এই নতুন শহর আসে সিনেমার বিজ্ঞাপন, হাতে আঁকা বিশাল আকারের সিনেমার স্থির ছবি ও কাটআউটে। সেইসব হাতে আঁকা ছবি, আবহ, সংলাপ মিলে গড়েওঠা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দর্শক কুসুমের বম্বেকে প্রথমবার দেখে। কুসুম পর্দার নায়ককে বাস্তব জীবনের নায়ক ও পর্দার খলনায়ককে বাস্তবজীবনের খলনায়ক বলে মনে করে। সে ব্যক্তিজীবনের নানা প্রশ্নে যুক্তি হাজির করে সিনেমার জগৎ থেকে। বৌদির সঙ্গে তর্ক করার সময় যুক্তি দেয় মালা সিনহা তার বৌদির থেকে বয়সে বড়ো হওয়া সত্বেও যদি 'মিনি স্কার্ট' পরতে পারে তবে কুসুমের পরতে বাধা কোথায়? কুসুম জীবনকে সিনেমার মায়াজগৎ থেকে আলাদা করতে পারে না। পর্দার ধর্মেন্দ্র তার আবেগকে এমনভাবে উদ্দীপিত করে যে বাস্তব জীবনে সে পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশা করতে উৎসাহিত বোধ করে না। তার চেয়ে স্বপ্নের জগতে বিচরণ করা তার কাছে অনেক বেশি রোম্যান্টিক। মজার বিষয় হল যে ছবির প্রসঙ্গে কুসুমের ধর্মেন্দ্রের প্রতি অনুরাগ দৃঢ় হয় সেটি হৃষীকেশ মুখার্জির ছবি 'অনুপমা' (১৯৬৬)। সেই ছবির প্রচার পুস্তিকায় ফ্যানের আবদার মেটাতে বা তারকার ইমেজ রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ পন্থা স্বরুপ ধর্মেন্দ্র লেখেন 'To Kusum with love–Dharmendra'––যা কুসুমের কল্পনার আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। পুনা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সিটিউটের ছাত্রী জয়া ভাদুড়ীকে কুসুম চরিত্রে নির্বাচন দর্শকের কাছে একটি সাধারণ মেয়েকে (যে অভিনেত্রী নয়) হাজির করা। অবশ্য জয়া ভাদুড়ী নিতান্ত বালিকা বয়েসে সত্যজিত রায়ের 'মহানগর' (১৯৬৩) ছবিতে অভিনয় করলেও সেই স্মৃতি সর্বভারতীয় দর্শকের কাছে রস্বাসাদনের অন্তরায় হয়নি। ছবিতে প্রফেসর গুপ্ত কুসুমকে সিনেমা নির্মাণের কঠিন পেশার বাস্তব রূপের সঙ্গে পরিচয় করান। যে কাজে তাকে সাহায্য করেন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সর্বস্তরের মানুষ। এই সমাধান কারো কাছে সরলীকরণ বলে মনে হতে পারে কিন্তু হৃষীকেশ মুখার্জির তাঁর ছবিতে এই সমস্যার উত্থাপন ভারতীয় ছবির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অর্ধশতাধীর বেশি আগে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবির অক্ষুণ্ণ জনপ্রিয়তা পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতার প্রমাণ। হৃষীকেশ মুখার্জি তাঁর ছবিতে কেবল এক তরুণীর সিনেমার নায়কের প্রতি মোহাবিষ্ট থাকার ওপর দৃষ্টিপাত করে ক্ষান্ত থাকেননি বরং ভারতীয় সিনেমা নিয়ে বা সামগ্রিকভাবে সিনেমা নিয়ে কথা বলেছেন। মোহাবিষ্ট কেবল কুসুম আর তার বন্ধুরা নয়,অন্যরাও। কুসুমের বন্ধু তারার ভাই কুন্দন সিনেমার হিরো হওয়ার স্বপ্নে টাকা চুরি করে বাড়ি থেকে পালিয়ে বম্বেতে আসে। হিন্দি ছবির পেশাদার জগতে ধাক্কা খেয়ে হিরোর স্বপ্ন দেখা কুন্দন জুনিয়র আর্টিস্টে পরিণত হয়। তার ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সে উপলব্ধি করে যেকোনো পেশার মতো চলচ্চিত্রেও পেশাদারী দক্ষতা, প্রশিক্ষণ,অনুশীলন জরুরি। ছবিতে নায়ক ধর্মেন্দ্র, অশোককুমারের মতো শিল্পীদের বক্তব্যে ও নবীন বা প্রফেসর গুপ্তের উপলব্ধিতে বারংবার মনে করানো হয় যে, সিনেমার প্রকৃত নায়ক হলেন পর্দার পিছনে থাকা কর্মীরা। ধর্মেন্দ্র ও প্রেস ফটোগ্রাফারের বিতর্কের সূত্রে চলচ্চিত্র বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা দর্শকের কাছে তুলে ধরা হয়, স্বয়ং পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি যে ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'গুড্ডি'তে পরিচালক কেবল ভারতীয় সিনেমার পলায়নপর প্রবৃত্তি তুলে ধরেন তা নয়, তিনি সচেতনভাবেই বারংবার বিমল রায় পরিচালিত 'দো বিঘা জমিন', 'বন্দিনী' (১৯৬৪), 'মধুমতি' (১৯৫৮)-র প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। হৃষীকেশ মুখার্জি তাঁর শিক্ষকপ্রতিম বিমল রায়, যিনি এদেশের চলচ্চিত্রে সমাজবাস্তবতা উপস্থাপনের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ, তাঁর ছবির উদ্ধৃতি দিয়ে আমদের সিনেমায় ভিন্ন স্বরের, ভিন্ন ধারার উজ্জ্বল উপস্থিতিকেও স্মরণ করিয়ে দেন।

এরপরেও বিভিন্ন সময়ে হৃষীকেশ মুখার্জি তাঁর ছবিতে সিনেমা নিয়ে নানা রকম মন্তব্য করেছেন। সম্পূর্ণ একই রকম দেখতে জমজ ভাই বা বোনেদের নিয়ে ছবি করা জনপ্রিয় সিনেমার এক অতি পরিচিত ফর্মুলা। 'গোলমাল' (১৯৭৯) ছবিতে নায়ক রামকুমার তার নিয়োগকর্তার প্রিয়ভাজন হতে গিয়ে নিজের কাল্পনিক যমজভাই লদকুমারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে থাকে। ঠিক সিনেমায় যেমন হয় তার বিপরীত এখানে ঘটে। এমনকি রামকুমারের আত্মীয়া সেজে যিনি অভিনয় করে নিয়োগকর্তাকে ধোঁকা দেন তিনিও ধরা পরে তার যমজ বোনের গল্প ফাঁদেন। জনপ্রিয় সিনেমায় যমজ ভাই বা বোনেদের থিম তাঁরা ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ করেন। এই একই কৌশল সত্যজিৎ রায়ের 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডু তে' (১৯৮০) উপন্যাসের ভিলেন নিয়েছিল। 'গোলমাল'-এ নায়ক রামকুমার যখন বন্ধুদের স্বপ্নের কথা বলে তখনও স্বপ্নে সিনেমার নায়ক ও প্লেব্যাক সিঙ্গাররাই আসেন। জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমার সাধারণের ওপর এই প্রভাবের কথা শৈলেশ দে'র কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত 'গোলমাল'-এ পরিচালক সরস ঢং-এ হাজির করেছেন। হৃষীকেশ মুখার্জির শেষ ছবি, বিমল করের কাহিনি ভিত্তিক 'ঝুট বোলে কাউয়া কাটে' (১৯৯৮) তে নায়ক প্রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ'-এর দেবেন্দ্রর মতো মেয়ে সেজে নায়িকার ঘরে পৌঁছে যায়, যাকে শনাক্ত করতে পেরে নায়িকার প্রাক্তন পুলিশকর্তা বাবা বিদ্রুপ করে বলে 'গোলমাল'। এই ছবির এক চরিত্র যখন বলে জীবন নিয়েই সিনেমা তৈরি হয় তখন অপর চরিত্র তাকে থামিয়ে বলে ওসব আগে হত এখন মানুষ সিনেমা থেকে নিয়েই তাকে জীবনে মিশিয়ে ফেলে। এই ছবির এক গানের বাণী বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে বলা হয় 'হিরো হ্যায়, হিরোইন হ্যায়, ভিলেন হ্যায়, স্যুটিং হ্যায়, ক্যামেরা নেহি বড়ি মুশকিল হ্যায়' (কথা আনন্দ বক্সি)। সিনেমা বাণিজ্য এমনই মহিমাময়, ফর্মূলা সিনেমাকে ব্যঙ্গ করলেও 'গোলমাল' এক সফল ফর্মূলায় পরিণত হল। এই ছবির তামিল ভাষায় দুবার রিমেক হল, এছাড়া কন্নড়, তেলেগু, সিঙ্ঘলি, মালায়লাম ভাষাতেও এই ছবির সফল রিমেক হল। শেষ করার আগে বলে রাখি শুরুতে উল্লেখিত সেই বাস্তবের বালিকারও মোহমুক্তি ঘটে আর এ ক্ষেত্রেও সেই নায়কের সহৃদয় সহায়তা কাজে লেগেছিল।

P shee
mPletes you

Wedding
Festival

পোশাক গুডি ব্রো এবং পউসি'জ
হাউজ- ২/এ, রোড- ২/১
জুই গার্ডেন, প্রথম তল
বনানী, ঢাকা, বাংলাদেশ
ইমেল **ahnaf@goodybro.com**

মডেল
আহনাফ, সাফিন, পউসি ,
মাইশা, অহনা, ধ্রুবা,
আতিকা, নৈঋতী

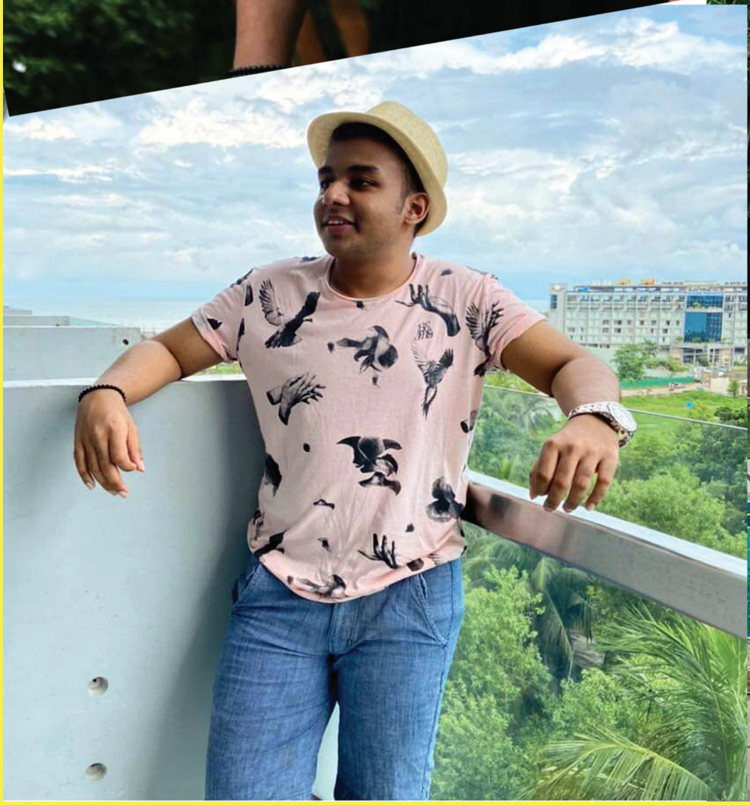

Overseas Consultants

CELEBRATING 25th years

PUJA WISHES FROM

- OVERSEAS CONSULTANTS
- OC CONSULTANTS PVT LTD
- OVERSEAS EDUCATION TRUST
- BANGLARSTREET
- ONE STOP SKILL
- LOOK EAST MEDIA PVT LTD
- PROVIVA CONSULTANTS (INDIA) LLP
- MEERA INTERNATIONS FILMS
- KROMOSOM DIAGNOSIS LLP
- PSC MEDIA SERVIES PVT LTD
- DIAHOME
- CANADIAN PRE-UNI BANGLADESH
- NATIONAL INSTITUTE OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT

CE -17, SECTOR - 1, SALTLAKE
KOLKATA - 700064

Best Wishes from

Medha Chowdhury

Naktala, kolkata

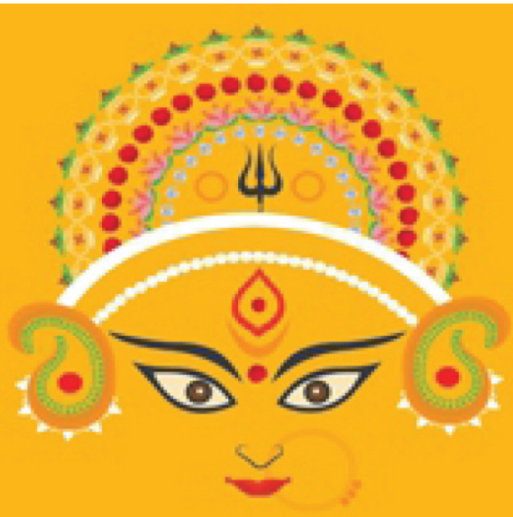

Best Wishes from

Ritu Enterprises

Jadavpur

Nightingale
CLINIC IVF LAB

Dhaleswar, Road No 13, Near UBI, Blue Lotus Club Chowmuhani, Agartala - 799007
Email : nightingaleclinicivf@gmail.com , Web : www.nightingaleivf.com

Ultra Modern Clinic
Reputed Foreign Doctor
Imported Machinery
Affordable Cost

Ph : 0381 2320045
8259910536

Only IVF Clinic
in Agartala Now Open

Reg. Off. **KROMOSOM DIAGNOSTICS LLP,**
CE - 17 , Sec - 1, Salt Lake, Kolkata - 700064, Ph : 033 2321 3919 / 29

Wishing you
a Happy
Durga Puja

Best wishes
from

Devangsh Agarwal

Alipore, Kolkata

সমস্ত লেখক , পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতা
বন্ধুদের
জানাই আসন্ন উৎসবের শুভেচ্ছা

CE-17,Saltlake,
kolkata 700064

Heartiest Bijoya Greetings from :

FIVE STAR GROUP

MAIDEN CONTAINERISED CARGO MOVEMENT ON INDO BANGLADESH PROTOCOL ROUTE FROM HALDIA TO PANGAON

- Five Star Logistics is proud to announce the first voyage of containerized cargo movement through the Indo Bangladesh Protocol Route to further strengthen the ties between India and Bangladesh. This is the first movement of EXIM containers to Bangladesh through the protocol route.
- 45 containers carrying Sponge Iron on account of Rashmi Cements Limited and Orissa Metaliks Pvt. Ltd. will be loaded from Haldia Port for Pangaon Terminal in Bangladesh.
- The voyage will take about 8 days via Hemnagar and Mongla.
- Five Star Group would like to thank Rashmi Cement Limited, Orissa Metaliks Pvt Ltd., Haldia Port Authorities, Kolkata Customs and Adani Logistics for their guidance and support in making this vision a reality.
- This will be a regular service with a voyage every 15-20 days.

FIVE STAR LOGISTICS PVT. LTD.

OUR SERVICES :

◗ Stevedoring ◗ Logistics Storage ◗ Man Power handling ◗ Documentation

◗ Shipping Agency and Chartering ◗ Exporting & Importing (Iron Ore Fines, Coal, Clinker)

KOLKATA OFFICE : 19A, J. N. Road, Lesley House, 2nd Floor, Kolkata-700087, West Bengal India. Ph : 91-33-22171040 / 40014608, Fax : 91-33-22171041

HALDIA OFFICE : Ranichak, Haldia, Dist: Purba Medinipur, West Bengal, India. Ph: +91-3224 252415, +91-324093, Fax: +91-3224-251740

PIC : Yogesh Agarwalla, Mob. : 98300 84611, E-mail : yogesh@haldiafivestar.com

www.haldiafivestar.com

Banglastreet, UTSAV, Registered : kOL RMS/2012-2014 RNI NO : WBBEN/ 200935299 INR: 50.00 Printed at calcutta Graphic Pvt. Ltd.,3B Maniktala Industrial Estate, Ultadanaga, Kolkata - 700054 & Pullished By Ashis Pandit at CE 17, Saltlake, kolkata - 700064

A Satyam Roychowdhury initiative

SNU
SISTER NIVEDITA UNIVERSITY

অবিদ্যানাশিনী

TOP RECRUITERS

L&T Infotech | tcs TATA CONSULTANCY SERVICES | /thoughtworks | amazon | BOSCH | Council of Architecture |

Capgemini | Deloitte. | Infosys | Cognizant | CISCO | SAP | intel

HIGHEST PACKAGE 32 LPA

RECOGNITIONS & APPROVALS

BANGLAR UCHCHASHIKSHA
Department of Higher Education
Govt. of West Bengal

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये | AICTE | NATIONAL ACADEMIC DEPOSITORY | INDIAN NURSING COUNCIL | Council of Architecture

DG 1/2, New Town, Action Area - I, Kolkata - 700 156 | 18002588155 (toll-free)

☎ 75950 44470 | 75950 44471 | 75950 44472 | 75950 44473 ☎ 77970 03333